সামাজিক প্রবন্ধ।

সর্ব্বত্র সমবেক্ষ্যেদং নিখিলং জ্ঞান চক্ষুষা।
শ্রুতিপ্রামাণ্যতো বিদ্বান্ স্বধর্ম্মে নিবিশেত বৈ॥

মনুসংহিতা।

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রণীত।

হুগলী
বুধোদয় যন্ত্রে
শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৯ সাল।

মূল্য ৷৷০ আট আনা।

প্রাণাধিক—

শ্রীমান্ গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায়

তথা

শ্রীমান্ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়—

চিরজীবিষু।

প্রিয়তমেরা!

তোমরা দুই ভ্রাতা ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াও যে প্রকার গুরুজনের প্রতি ভক্তিমান ও পরিজনের প্রতি প্রীতিমান, সেইরূপ আর্য্য-শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন এবং স্বদেশীয় জনগণের প্রতি অনুরাগ-বিশিষ্ট। তোমাদের ন্যায় ইংরাজী শিক্ষিত এতদ্দেশীয় প্রৌঢ় এবং যুবকদিগকে মানস-চক্ষে রাখিয়া সামাজ-তত্ত্ব বিষয়ে স্বচিন্তার উদ্রেক করিবার অভিলাষে এই প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছি। এই জন্য পুস্তক খানি আশীর্ব্বাদ-স্বরূপে তোমাদের নাম সম্বলিত করিয়াই প্রচারিত করিলাম।

লেখক।

চতুর্থ অধ্যায়—ইংরাজাধিকার।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
ইংরাজের বণিকভাব	১৫৩
" রাজভাব	১৫৯
" বৈদেশিকভাব	১৬৯

পঞ্চম অধ্যায়—ভবিষ্যবিচার।

সাধারণ কথা	১৮০
ইউরোপের কথা	১৯১
ভারতবর্ষের কথা (উপনিবেশ যোগ্যতা)	২০২
" (ধর্ম্ম-প্রণালী বিষয়ক)	২১০
" (ভাষা বিষয়ক)	২২০
" (সামাজিক রীতি বিষয়ক)	২২৯
" (আর্থিক অবস্থা বিষয়ক)	২৪১
" (জৈবনিক অবস্থা বিষয়ক)	২৫৩
ভবিষ্য-বিচারের উপসংহার	২৬৩

ষষ্ঠ অধ্যায়—কর্ত্তব্যনির্ণয়।

নেতৃপ্রতীক্ষা	২৭০
অতথ্য পরিহার	২৭৭
সূত্রনির্দ্ধারণ	২৮৪
সূত্রের ব্যাখ্যা	২৯১
সূত্রের প্রয়োগ	২৯৮
উপসংহার	৩১১

গ্রন্থের আভাস।

এই সামাজিক প্রবন্ধগুলি ছয়টী অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে স্বদেশীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয়ভাব সংস্থাপিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে কি না, তাহার বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, জাতীয়ভাব পরিগ্রহের পথ আমাদিগের পক্ষে একান্ত সংরুদ্ধ নহে। এই কথার বিশেষ সমর্থনের জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইউরোপে প্রচলিত সমাজ-তত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটী মতবাদের উল্লেখ এবং ভ্রমপ্রদর্শন করিতে হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইংরাজের আগমন হওয়াতে যে যে ফল জন্মিয়াছে বলিয়া সাধারণতঃ উক্ত হইয়া থাকে, তৃতীয় অধ্যায়ে সেগুলির প্রকৃতি বিচারিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের সংস্রব যে যে ভাবে হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহার সমালোচনা করা হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে, ইংরাজ আগমের পরবর্ত্তী ফল কি হইতে পারে, তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে। আমাদের সমাজের গতি জাতীয় প্রকৃত্যনুযায়ী পথে রাখিবার নিমিত্ত যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত কথাগুলি হইতে অবশ্যই বোধ হইবে যে, একখানি সর্ব্বদেশ সাধারণ সমাজ-তত্ত্ব গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশে, অথবা রাজনৈতিক কোন প্রকার আন্দোলনের সহকারিতা করিবার নিমিত্তে, এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হয় নাই। এখানকার ইংরাজী শিক্ষিত অনেকের মধ্যে কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কি সমাজ সম্বন্ধে, কি পারিবারিক ব্যবস্থায়, কি আচার ব্যবহারে, সর্ব্ববিষয়েই তথ্যজ্ঞান অস্ফুট, কর্ত্তব্য সূত্র অনির্দ্দিষ্ট, এবং কার্য্য-কলাপ অব্যবস্থিত, হইয়া পড়িতেছে।

এই জন্য, ইংরাজ-রাজ প্রদত্ত ডাক, রেলওয়ে, মুদ্রাযন্ত্র, সম্বাদপত্র, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বিদ্যাবিস্তারের উপাদান এবং এই অভূতপূর্ব্ব শান্তি-সুখের অবসর প্রাপ্ত হইয়া এখন আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি, তাহা বুঝিয়া আমাদের নিজের কর্ত্তব্য অবধারণ করা একান্ত আবশ্যক। এই পুস্তকের দ্বারা সেই কর্ত্তব্য অবধারণ কার্য্যের কোনরূপ সাহায্য হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি জ্ঞান করিব।

লেখক।

সামাজিক প্রবন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

জাতীয় ভাব—উপক্রমণিকা।।

কয়েক বৎসর হইল, বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন একটী ইউরোপীয়ের সহিত আমার নিম্নলিখিতরূপ কথোপকথন হইয়াছিল।

তিনি বলিলেন, স্বাধীনতা হারাইয়া জাতীয় ভাব পরিবর্দ্ধনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

আমি বলিলাম, কোন জিনিস হারাইলে তাহা ত পাইবার জন্য খুঁজিতে হয়—জাতীয় ভাব পরিবর্দ্ধনের যে চেষ্টা, তাহাই কি ঐ হারান জিনিসটীর অনুসন্ধান নয়?

তিনি। কথাটী বেশ সূক্ষ্ম করিয়াই বলিলে বটে। ও কথার কোন সাক্ষাৎ উত্তর নাই—কিন্তু যাহা অতল জলে পড়িয়া গিয়াছে, অথবা যাহা কখনই হাতে ছিল না, তাহা খুঁজিতে যাওয়া কি বৃথা পরিশ্রম এবং সময় নষ্ট করা নয়? ওরূপে আয়াস করা অপেক্ষা অন্যরূপ চেষ্টা করা ভাল বলিয়াই বোধ হয়।

আমি। অন্য কোন্ দ্রব্যের জন্য অথবা অন্য কোন্ প্রকার চেষ্টা করিতে বলেন, তাহা বলুন, শ্রদ্ধান্বিত হইয়াই শুনিব। কিন্তু আমরা যাহা খুঁজিতেছি, তাহা যে অতল জলে পড়িয়াছে, তাহা ত জলে নামিয়া না দেখিলে নিশ্চয় হইতে পারে না। আর যে জিনিসটা হারাইয়া গিয়াছে মনে করিতেছি, তাহা যে পূর্ব্বে হাতে ছিল না, তাহাই বা কেমন করিয়া মনে করিব। ও জিনিসটা এমন যে, উহা হারাইয়াছে, মনে করিলেই, উহা যে হাতে ছিল, তাহার প্রমাণ হয়।

তিনি। তোমায় আমায় আর ওরূপ ছেঁদো কথায় কাজ নাই। আমি নিজ জীবনবৃত্তের কিঞ্চিৎ বলিতেছি, তাহা শুনিলেই আমার মনের সকল ভাব বুঝিতে পারিবে। আমার জন্মস্থান আয়র্লণ্ড দ্বীপ—আমার পিতা রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন—আমি ডব্লিন নগরে একটী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম—১৮৪৮ অব্দে সমুদায় ইউরোপ-ব্যাপক যে রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছিল, সেই বিপ্লবের একটা ঢেউ আয়র্লণ্ডে আসিয়া লাগে, এবং তথায় উপদ্রব জন্মায়। আমি কয়েক জন সমাধ্যায়ীর সহিত ঐ উপদ্রবে যোগ দিয়াছিলাম। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের অত্যধিক উদ্রেক হইয়াছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঐ উপদ্রব শান্ত করিলেন। আমি জেলে গেলাম। পরে জেল হইতে পলাইয়া ফরাসিদিগের দেশে আশ্রয় লাভ করিয়া বহু বৎসর ঐ দেশে বাস করিয়াছিলাম। অনন্তর ইংলণ্ডে আসিয়া কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হই, এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমার এই প্রতীতি জন্মে যে, আমার হৃদয়স্থিত সংকীর্ণ আইরিস জাতীয় ভাবটী, সুবিস্তীর্ণ ব্রিটিস জাতীয় ভাবে পর্য্যবসিত হওয়াই উচিত। এখন তাহাই হইয়াছে, এবং তাহা হইয়াছে বলিয়াই বলিতেছি যে, তোমাদিগেরও এই উত্থানোন্মুখ ভারতবর্ষীয় ভাব ব্রিটিশ জাতীয়ভাবে পর্য্যবসিত হওয়া বিধেয়।

আমি। তোমার জীবনবৃত্তের যে ব্যাপারগুলি শুনিলাম, তাহাতে দুইটী তথ্য উপলব্ধ হইল। এক তথ্য এই যে, তুমি আমাদিগের মনের

ভাব অনেকটা বুঝিতে পারিবে। দ্বিতীয় তথ্য এই যে, অনেকটাই বুঝিতে পারিবে না। বুঝিতে পারিবে যে, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই, একবারে ইংরাজের জিনিষ হইয়া যাইতে চাহি না। বুঝিতে পারিবে না যে, আমরা ইংলণ্ড হইতে স্বাতন্ত্রিকতা চাহি না, অন্ততঃ বহু কালের জন্য তাহা চাহি না। তোমাদের মনে যেমন জাতীয় ভাবের উদ্রেক হয়, অমনি তোমরা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বৈস। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের উদ্রেকে আমরা রাজবিদ্রোহ করিতে চাই না।—আমরা বেশী করিয়া ইংরাজী শিখি, বেশী করিয়া সংস্কৃতের সমাদর করি, কাজ কর্ম্ম এমন যত্ন এবং শ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করি, যাহাতে ইংরাজ রাজপুরুষেরাও আমাদিগের দ্বারা পরাস্ত হয়েন। মুসলমানকে নেড়ে বলিয়া, পশ্চিমে লোককে মেড়ুয়া বলিয়া, দক্ষিণাঞ্চল-বাসীদিগকে কদাকার বলিয়া, অশ্রদ্ধা করা অতিশয় দূষ্য মনে করি—আর সন্তান সন্ততিকে দৃঢ়কায়, পরিশ্রমী, বিদ্বান, এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ এবং স্বজাতির মুখাপেক্ষী করিবার নিমিত্ত নিরন্তর প্রাণপণে যত্ন করি।

তিনি। ঐ গুলি ত অতি সাধারণ কাজ বলিয়াই বোধ হয়। ঐ সকল কাজে জাতীয় ভাব বর্দ্ধনের উপায় হয় বটে, কিন্তু জাতীয় ভাব উৎপাদনে উহাদিগের তেমন বিশেষ উপযোগিতা নাই। রাজনৈতিক বিষয়ে বিচার করিবার জন্য সভা স্থাপন করা—প্রকাশ্যে বক্তৃতা করা—পুস্তিকা বিরচন করা, এই সকল কার্য্যের প্রতি তুমি কি আস্থা শূন্য ?

আমি। ও সকল কাজে আমার আস্থা নাই, এমত নহে, তবে ও গুলির প্রতি আপনাদিগের যতটা আস্থা আছে বলিয়া মনে করি, আমার আস্থা, বোধহয়, তত অধিক নয়। ও গুলি ইংরাজা-ধিকারে ইংরাজী শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং নিরবচ্ছিন্ন অনুচিকীর্ষা প্রসূত, এই জন্য কিয়ৎ পরিমাণে অবশ্যই অন্তঃসারশূন্য। আমি দুইটী দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইতেছি, বক্তৃতাদি দ্বারা আন্দোলনের ফল কিরূপ হয়। প্রথমটি সফল আন্দোলনের দৃষ্টান্ত। কোন সময়ে ইংরাজ-ভূম্যধিকারিগণের

পক্ষপাতী ব্যবস্থার বলে ইংলণ্ডে বৈদেশিক শস্যের আমদানী বন্ধ ছিল। সেই ব্যবস্থা রহিত করিলে ইংলণ্ডের প্রজাসাধারণের উপকার হইবে, এই কথা প্রতিপন্ন করিবার জন্য কব্‌ডেন সাহেব সভা সংস্থাপন, প্রকাশ্যে বক্তৃতা প্রদান, এবং পুস্তিকা রচনাদি করাইয়া যৎপরোনাস্তি প্রয়াস পাইয়া ছিলেন। পরিশেষে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে মন্ত্রিদল অগত্যা তাঁহার মতানুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ স্থলে ইংরাজে ইংরাজে কথা; অর্থাৎ লাভের ভাগীও ইংরাজ, আর লোকসানের ভাগীও ইংরাজ; আবার তাহাতে একটী দুর্ভিক্ষের সমাগম। যদি এরূপ মণিকাঞ্চনযোগ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে কি কব্‌ডেন সাহেবের কৃত আন্দোলনে কোন ফল দর্শিত? দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটী, একটী বিফল আন্দোলনের। এই আন্দোলনের ক্ষেত্র আপনারই জন্মভূমি আয়র্লণ্ড। এই আন্দোলনের কর্ত্তা কব্‌ডেনের অপেক্ষাও শত গুণে শ্রেষ্ঠ,—বাগ্মিবর ওকোনেল সাহেব। আয়র্লণ্ডের কাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা যাবতীয় ব্যক্তি ওকোনেলকে দেবতুল্য ভক্তি করিত—দুই দিন, চারি দিন, দশ দিনের পথ হইতে তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে আসিত, তিনি হুকুম করিয়া পাঠাইলেই কাথলিক যাজকদল চতুর্দ্দিক হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া সমভিব্যাহারে আনিত, ও লইয়া যাইত। তাঁহার অনুচরের এবং পারিষদের কোন অভাব ছিল না।—তিনি সমস্ত আয়র্লণ্ডের একাধিপতির স্বরূপ হইয়াছিলেন। কিন্তু তৎকৃত রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল কি হইল? পুলিশ হইতে যেমন পরওয়ানা বাহির হইল, অমনি লোকসমাগম থামিল—রাজ্যের উপদ্রাবক বলিয়া মহাত্মা ওকোনেল আদালতে অভিযুক্ত হইলেন—তিনি জেলে গেলেন—কয়েক বর্ষ সেই খানে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার বল, বুদ্ধি স্থৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, বাগ্মিতা সকলই বিলুপ্ত হইয়া গেল—তিনি পরে দেশত্যাগী হইয়া বন্ধুবান্ধববিহীন পররাজ্যে দেহত্যাগ করিলেন।

তিনি। ওকোনেল নিজের দোষেই সকল হারাইয়াছিলেন। তিনি যেমন বাগ্মিপ্রধান যদি তেমনি কার্য্যকুশল হইতেন, তবে আর দেশের

লোকেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিত না। আয়র্লণ্ড অবশ্য স্বাধীনতা লাভ করিত।

এই কথা গুলি বন্ধুবর কিছু ব্যগ্রতা সহকারে এবং একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া ফেলিলেন। কিন্তু কথাগুলি তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইবামাত্রই বুঝিতে পারিলেন যে, এখনও তাঁহার নিজের মন হইতে জাতীয় ভাবটী অপনীত হয় নাই। সেই যৌবনাবস্থার—সেই ৪৮-অব্দের অগ্নি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই—উহা এত দিনের পর ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

জাতীয় ভাব—ইহার উপাদান।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে সরল-চেতা, সাধুশীল, সত্যবাদী ইউরোপীয় মহাশয়ের উল্লেখ করিয়াছি, তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জাতীয় আইরিস্ ভাবটী, তাঁহার জাতীয় ব্রিটিস্ভাবে, মগ্ন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি সরল মনে কথা কহিতে কহিতে স্বয়ংই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রকৃত জাতীয় ভাবের মূলটী অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে—উপরে যতই চাপা পড়ুক, ভিতরে স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কিছু মাত্র ন্যূন হয় নাই।

বস্তুতঃ স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কাহারই কখন একেবারে যাইতে পারে না। অন্তঃকরণ বৃত্তির সংগঠন ইন্দ্রিয় দ্বারা সংগৃহীত বাহ্যবস্তুনিচয়ের বিভূতি-সমবায়েই জন্মে। সকল দেশেরই বাহ্য বস্তু সমূহের প্রকৃতিতে এক একটী বিশেষ লক্ষণ আছে। একদেশজাত এবং একদেশপালিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, বাহ্য প্রকৃতি একরূপ হওয়াতে এবং একদেশজাত জনগণ পরস্পর সংসৃষ্ট থাকাতে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ-বৃত্তিও একরূপ হইয়া যায়। এই একরূপতাই স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি ভালবাসার গূঢ় কারণ, এবং সেই কারণ, পুরুষ পরম্পরাক্রমে

কার্য্যকারী হওয়াতে, জাতীয় ভাবটী মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে অতি গূঢ়তর রূপেই অধিকার করিয়া থাকে।

উল্লিখিত কারণ-সম্ভূত মৌলিক জাতীয় ভাবটী জনগণের অন্তঃকরণ গঠনের বিশিষ্টতায় এবং নানা বাহ্য সাদৃশ্যে, প্রকট হয়। তাহার মধ্যে (১) আকার এবং রূপ-সাদৃশ্য, (২) ধর্ম্ম এবং আচার-সাদৃশ্য, (৩) ভাষা এবং উচ্চারণ-সাদৃশ্য, (৪) রাজ্য-শাসন এবং সামাজিক প্রণালীর সাদৃশ্য—এই কয়েকটী অতি প্রধান। তদ্ভিন্ন, পরিচ্ছদে, গৃহ-নির্ম্মাণে গৃহোপকরণে, ভোজনাদি সুবহু অনুষ্ঠানে এক জাতীয় লোকের মধ্যে অনেক প্রকার সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। এই সকল প্রধান এবং অপ্রধান উভয় প্রকার সাদৃশ্যের উপলব্ধি এবং তজ্জনিত একটী বিশেষ সহানুভূতি, যে সকল লোকের মধ্যে দৃষ্ট হয়, সেই সকল লোকের হৃদয়ে জাতীয় ভাব বিশিষ্টরূপেই প্রকটিত হইয়া আছে, বলা গিয়া থাকে।

এস্থলে আর একটী কথা আছে। সাদৃশ্যের উপলব্ধি দুই প্রকারে হয়। উহা বিধিমুখেও হয় আর নিষেধ মুখেও হয়। অমুক অমুকের সদৃশ, এরূপে সাদৃশ্য জ্ঞান হইতে পারে, আর অমুক অমুক হইতে যত বিষদৃশ, অমুক তত বিষদৃশ নয়, এরূপেও সাদৃশ্যের উপলব্ধি হইতে পারে।

এখন এই ভারতভূমির প্রতি উল্লিখিত সূত্রগুলির প্রয়োগ করিয়া দেখা যাউক, এতদ্দেশবাসীদিগের জাতীয় ভাবে, ঐ সূত্রগুলি খাটে কি খাটে না এবং কতদূর খাটে।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষ একটী মহাদেশ। ইহাতে সমুদ্র এবং পর্ব্বত, উষরভূমি এবং উর্ব্বরভূমি, উপত্যকা এবং অধিত্যকা. জলময় প্রদেশ এবং জলহীন প্রদেশ, সর্ব্ব প্রকার প্রাকৃতিক ভেদ লক্ষণে লক্ষিত স্থান সকল আছে—ভারতবর্ষ সমস্ত পৃথিবীর প্রতিকৃতি স্বরূপ। ফলতঃ এইটীই ভারতবর্ষ দেশের বিশিষ্টতা এবং এই জন্যই এতদ্দেশবাসী দিগের হৃদয়ে অনন্যদেশসাধারণ একটী বিশিষ্টভাবের অধিষ্ঠান হইয়া

আছে। ইহারা সংকীর্ণমনা হয় না, ইহাদের প্রকৃতি সহজেই অতি উদারভাবসম্পন্ন হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশবাসী জনগণের মধ্যে অপর যতই পার্থক্য থাকুক, ইহার সকল ভাগেরই লোকদিগের চিত্তে একটী চমৎকার উদারতা আছে। ইহারা পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা, পরকে আপনার করিয়া লইতে পারে। ইহাদিগের সর্ব্ব প্রদেশেরই সুপ্রসিদ্ধ কবিগণ ভেদ-বুদ্ধির দোষ এবং উদারতার গুণ কীর্ত্তন করেন। এই জন্যই ভারতবর্ষীয়েরা সর্ব্ব প্রদেশেই এমনি আতিথেয় যে, এক কপর্দ্দকও পাথেয় সম্বল না লইয়া, বিদেশীয়েরাও এই মহাদেশের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতে পারেন।

ভারতবর্ষীয়দিগের এই মৌলিক বিশিষ্টতার বিকাশ, তাঁহাদিগের অত্যুদার ধর্ম্মপ্রণালীতে অতি সুস্পষ্টরূপেই দৃষ্ট হয় ও ভারতবর্ষীয়দিগের শাস্ত্রে পরধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়া আছে, এবং অধিকারিভেদের ব্যবস্থার দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সর্ব্ব প্রকার গোলযোগের মূল পর্য্যন্ত একেবারে নিরাকৃত হইয়া আছে। অপর কোন দেশের ধর্ম্ম প্রণালীতে অধিকারিভেদের উল্লেখ নাই। ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিশিষ্টতার এই চরম দৃষ্টান্ত।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলে, আচার লইয়া ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বড়ই আঁটা আঁটি এবং ঝকড়া ঝাঁটি দেখা যায় বটে। কিন্তু দুই একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ ভিন্ন, ইহার কোন বিস্তৃত ভাগের প্রচলিত আচারের সহিত অন্য বিস্তৃত ভাগের প্রচলিত আচারের তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে। ইহাদিগের পরস্পরে যতই আচারভেদ থাকুক অপর জাতীয়দিগের সহিত যত, আপনাদিগের মধ্যে কুত্রাপি তত নয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে সত্য; কিন্তু যখন সংস্কৃত-ভাষী আর্য্যেরা সমস্ত দেশ ব্যাপক হয়েন নাই তখন ভারতবর্ষে যত ভাষাভেদ ছিল, এখন আর তত নাই। এখনও যাহা আছে, তাহার প্রতি এক সংস্কৃত ভাষার শক্তি অনুক্ষণ প্রযুক্ত হইতেছে,

এবং তদ্দ্বারা প্রদেশীয় বিভিন্ন ভাষাগুলিকে ক্রমশঃ পরস্পরের সহিত সন্নিহিত করিতেছে। কোন এক খানি নব্য মহারাষ্ট্রীয়, কি তেলেগু, কি হিন্দি, কি বাঙ্গালা কি উড়িয়া পুস্তক লইয়া দেখ, সকল ভাষাই এক সংস্কৃত হইতে আপনাপন উপজীব্য শব্দ সকল গ্রহণ করিতেছে, এবং সকলগুলিই ভারতবর্ষীয় মাত্রের আশু বোধগম্য হইয়া আসিতেছে। উচ্চারণ প্রণালী সকল ভারতবর্ষীয় লোকেরই যে একবিধ, তাহার অপর প্রমাণের প্রয়োজন নাই—এই বলিলেই হইবে যে সংস্কৃত বর্ণমালাতে ভারতবর্ষের সকল ভাষাই লিখিত হয়; তামিল ভাষাতে সকল বর্ণের ব্যবহার হয় না বটে, প্রতি বর্গের আদ্যক্ষর দ্বারা তদ্বর্গীয় সকল বর্ণের কার্য্য সিদ্ধি হয়—কিন্তু তাহাতে উচ্চারণের যে পার্থক্য বুঝায় তাহা তেমন মৌলিক পার্থক্য নহে সুতরাং কালক্রমে সে পার্থক্যও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। মুসলমানদিগের কতক শব্দের উচ্চারণ এরূপ যে, সংস্কৃত বর্ণমালায় সেগুলি অবিকল লিখিত হয় না। কিন্তু খ় এবং জ় এই দুইটী মাত্র বর্ণ সৃষ্ট হওয়াতে সে ক্রটি আর লক্ষিত হয় না। আর বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের কাব্য গ্রন্থাদিতে ঐ ক্রটি তাঁহাদিগের নিকটেও ধর্ত্তব্য হইত না।

সমস্ত ভারতবর্ষের রাজ-শাসন এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে এক হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের ঈশ্বরী এখন ভারতেশ্বরী হওয়াতে, আমরা সকল ভারতবর্ষীয় এক সম্রাটের অধীনে এক মহাসাম্রাজ্যবাসী বলিয়া আপনাদিগকে সুস্পষ্টরূপেই জানিতেছি। এক্ষণে আমাদের সাধারণ সুখ, দুঃখ আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা এবং নিরাশা, এক সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এত দূর না হউক, কখন কখন ভারতবর্ষের অতি সুবিস্তৃত ভূমিভাগ সকল একচ্ছত্রের অধীন হইত—মান্ধাতা, শ্রীরামচন্দ্র, যযাতি, যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, অশোক প্রভৃতি আর্য্য নরপালগণ সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন—আর আকবর সাহ প্রভৃতি কয়েকজন মুসলমান সম্রাটও ভারতভূমির অনেকানেক প্রদেশ আপনাদিগের করতলস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সেই সকল সাম্রাজ্য স্থাপনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন

ভাগের পরস্পর সম্মিলনোপায় অনেক দূর সুসিদ্ধ হইয়াছিল। তাহার উপর এক্ষণে যে অচ্ছেদ্য অভেদ্য আয়সশৃঙ্খলে ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ দৃঢ় সম্বদ্ধ হইল—ইহার ফল আরও অনেক অধিক হইবে এবং সত্বরেই ফলিবে।

সামাজিক রীতি নীতি, আচার প্রণালীর ন্যায়, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই যে সমপ্রকৃতিক তাহা অপর জাতীয়দিগের রীতি পদ্ধতির সহিত তুলনা করিলেই স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। অপর জাতীয়দিগের সহিত আমাদের সকলেরই পার্থক্য যত অধিক—নিজেদের মধ্যে পৃথক্‌ভাব তত নয়। ভারত-বর্ষের যেখানেই যাইবে, সর্ব্বত্রই ঘর দ্বারের শ্রী ছাঁদ, খাওয়া দাওয়ার পারিপাটা, ক্রিয়া কলাপের রীতি পদ্ধতি মোটামুটি একই প্রকার দেখিতে পাইবে।

অতি সুবোধ এবং বহুদর্শী কোন ইউরোপীয়ের সহিত ১৮৬৩ অব্দে, এই সকল বিষয়ে, আমার কথা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন—ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে পরস্পর যেরূপ পৃথকভাব আছে, তাহা কোন্ বৃহৎ সাম্রাজ্যে নাই?—রুসিয়ার ভিতরে, অষ্ট্রীয়ার ভিতরে ইহা অপেক্ষা অধিক না হউক, ন্যূন নয়। এখন মৌলিক বর্ণভেদের পার্থক্য ধরিয়া ইউরোপে জাতি সংঘটনের কতক চেষ্টা হইতেছে। ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন্ লাটিন বংশীয় স্পেনীয় এবং ইটালীয়দিগকে ফরাসীদিগের সহিত ঐক-মত্য অবলম্বন করাইতে চাহেন—রুস সম্রাট শ্লাভ্ বংশীয় সকল লোককে রুসের সহিত সম্মিলিত হইতে বলেন—টিউটন্ বংশীয় জর্ম্মনেরা প্রুসিয়ার অধিনায়কতা স্বীকার করিয়া ডেন্‌মার্ক এবং হলণ্ডের প্রতি অতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। বিভিন্ন জাতীয়দিগের স্ব স্ব বর্ণাত্মকতা লইয়া অনেকটা লড়াই ঝক্‌ড়া, মারামারি, কাটাকাটি হইবে এবং ইউরোপীয়-দিগের জাতি সংঘটনে কতকটা বর্ণাত্মকতা সংসাধিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জাতীয় ভাব বর্ণাত্মকতাতেই নিবদ্ধ নয়। দেথ মান্দ্রাজ প্রদেশীয় লোকেরা তোমার বর্ণের লোক নহে, সে বিষয়ে তাহাদের অপেক্ষা

' আমার সহিত তোমার মিল অধিক। কিন্তু মান্দ্রাজীদের সহিত তোমার ধর্ম্মে মিল, সামাজিক রীতিতে মিল, আর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, আর একটি বিষয়ে মিল।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, সে সর্ব্বপ্রধান বিষয়টি কি? তিনি বলিলেন—"লোক সকলের মধ্যে সকল প্রকার বিভেদকে নষ্ট করিয়া সম্মিলন এবং একতা জন্মাইবার অমোঘ উপায় একরাজার শাসন, এবং এক শাসনপদ্ধতি—এই উপায়ের দ্বারা বিভিন্নপ্রকৃতিক, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন বর্ণসম্ভূত জনগণের মধ্যেও জাতীয় ভাব জন্মে। কারণ, এক শাসনপদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ফল, জনগণের সমসুখদুঃখতা বা সহানুভূতি; এবং তাহাই জাতীয় ভাব জন্মিবার সর্ব্বপ্রধান কারণ, এবং ঐ ভাবের সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ।'

তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কতকটা অবিকল ফলিয়াছে। তাঁহার কথা যে ইউরোপ সম্বন্ধে আরও ফলিবে, তাহার অনেক চিহ্ন স্পষ্টরূপে দেখাযাইতেছে। তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও কি সুসিদ্ধ হইবে না? তাহারও কি অস্ফুট লক্ষণ দেখা যাই-তেছে না? আমার বোধ হয় ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে জাতীয় ভাব গ্রহণের প্রকৃত অধিকারীর সংখ্যা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে, ইহাদিগের পরস্পর সহানুভূতি দিন দিন বাড়িতে থাকিবে, এবং তাঁহার অনুমান ঠিক হইয়া দাঁড়াইবে।

জাতীয় ভাব—ভারতবর্ষে মুসলমান।

আদমসুমারীতে বলে ভারতবর্ষের এক-পঞ্চমাংশ লোক মুসলমান, অর্থাৎ করদ এবং মিত্র এবং স্বাধীন সকল রাজ্যগুলির লোক সংখ্যার সমান। ইহাঁদিগের শাস্ত্র, বেদ পুরাণ অথবা বেদপুরাণাদি প্রসূত কোন ধর্ম্মগ্রন্থ নয়—ইহাঁদিগের সংস্কার-প্রণালী ভারতবাসী অপর সকল লোকের সংস্কারের রীতি হইতে বিশিষ্টরূপে পৃথক্‌ভূত। ইহাঁদিগের সামাজিক

ব্যবস্থাও ভারতবাসী অপর সকল লোকের সহিত যতদূর মিলে, তাহা অপেক্ষা ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত অপরাপর জাতীয়দিগের সহিত যেন কিছু অধিকতর মিলে। ইহাঁরা কোন সময়ে ভারতবর্ষ জয় করিয়া এখানে সর্ব্বস্ব কর্ত্তৃত্ব করিয়াছিলেন, এবং আপনাদিগের সেই উন্নত অবস্থার স্মৃতি, এখন পর্য্যন্তও কতকটা জাগরূক রাখিয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ নিবাসী অপর সকল লোকের পরস্পর সহানুভূতি অপেক্ষা, কিছু অধিক বলিয়াই বোধ হয়। সে দিন লর্ড রিপনের আমলে ইংরাজেরা যেমন সকলে একমনা হইয়া আপনাদিগের রক্ষণী সভা সংস্থাপিত করিয়া ফেলিলেন, মুসলমানেরাও তত শীঘ্র এবং তত সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে না হউক, কিয়ৎপরিমাণে সেইরূপ সভা সংস্থাপন করিলেও করিতে পারেন। কয়েক বৎসর মাত্র গত হইল, ভারতবর্ষের যাবতীয় মুসলমান, এমন কি তাঁহাদিগের মধ্যে মুষ্টিভিক্ষোপজীবীরাও রুস-তুরস্কের যুদ্ধের সময়ে, তুরস্কের অর্থসাহায্য করিবার নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিলেন। ভদ্রাভদ্র অনেক মুসলমান লাল টুপি পরিয়া আপনারা যে তুরস্কের পক্ষপাতী, তাহাও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাহারও পূর্ব্বে যখন ইংরাজদিগের সহিত পঞ্জাবের পশ্চিম দিগ্‌বর্ত্তী সিতানা প্রদেশে আফ্রেদি প্রভৃতি দুর্বৃত্ত জাতিদিগের সংগ্রাম হয়, তখনও ভারতবাসী অনেক মুসলমান স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের অর্থসাহায্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলকথা ভারতবাসী মুসলমানেরা অনেকেই ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত অপরাপর জাতীয়ের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন এবং সকলেই হয় তুরস্ক সম্রাট, নয় পারস্য অধিপতিকে আপনাদিগের ধর্ম্ম-শাস্তা বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।

ভারতবাসী মুসলমানদিগের এই ভাবের অনুরূপ বস্তু ইতিবৃত্তে নূতন নহে; প্রত্যুত, ইহার দৃষ্টান্ত অনেকানেক স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংলণ্ডের ইতিহাস লইয়াই দেখ, ওখানকার অধিকাংশ প্রজা বিবিধ সম্প্রদায় সম্ভুক্ত প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী, কিন্তু অনেকগুলি কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী আছে। কাথলিকেরা খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের অনেকটা ভিন্নরূপ অনুবাদ করে,

এবং উহাদের সংস্কারপ্রণালীও কিছু ভিন্নরূপ। তাহারাও ইংলণ্ডের বহিঃস্থিত পোপ উপাধিবিশিষ্ট জনৈক যাজকপতিকে আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্তা বলিয়া স্বীকার করে। তজ্জন্য প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বী ইংরাজেরা তাহাদিগকে বহু কালাবধি এক প্রকার রাজদ্রোহী মনে করিত, এবং বহু দিন গত হয় নাই, কোনরূপ রাজকার্য্যে তাহাদিগের নিয়োগ হইতে দিত না। কিন্তু আজি কালি আর সেরূপ নাই। ইংরাজদিগের মন হইতে ধর্ম্মবিদ্বেষরূপ মোহের অনেকটা লোপ হইয়া গিয়াছে, এবং এখন যদিও প্রটেষ্টাণ্ট এবং কাথলিক উভয় সম্প্রদায়ের ছোটলোকদিগের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষভাব আছে, এবং মধ্যে মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া থাকে, কিন্তু সুভদ্র কাথলিক এবং প্রটেষ্টাণ্টের মধ্যে বিলক্ষণ সম্মিলন এবং সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডেও যেমন, ধর্ম্মভেদ জাতীয়ভাবের ব্যাঘাত করিতেছে না, ভারতবর্ষেও সেইরূপ হইয়া আসিতেছে। এখানকারও হিন্দু এবং মুসলমান ক্রমে ক্রমে রাজনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে একমত হইয়া মিলিবে।

হিন্দু এবং মুসলমান যে মিলিবে, তাহার সূত্রপাত অনেক দিন হইতেই হইয়া আসিতেছে। রাজ্যাধিকার সম্বন্ধে মুসলমানদিগের চিরাভ্যস্ত নিয়ম এই যে, উহারা যে রাজ্য জয় করে, সেই রাজ্যের স্ত্রীলোকদিগকে অধিক পরিমাণে বিবাহ করে। ভারতবর্ষেও তাহাই করিয়াছিল। তবে এখানে জাতিভেদ প্রথার প্রাবল্য নিবন্ধন অন্যান্য দেশে যে পরিমাণে ভদ্র ঘরের কন্যাগণকে বিবাহ করিতে পারিয়াছিল, এখানে তাহা পারে নাই; এখানে অধিক পরিমাণেই নিম্নবর্ত্তী জাতীয়দিগের কন্যা সকল গ্রহণ করিয়াছিল। এখানকার যোল আনা মুসলমানের মধ্যে বার আনা মুসলমান ঐরূপে উৎপন্ন। অপর চারি আনা মুসলমানও যে একেবারে দেশীয়-সংস্রব-শূন্য, তাহা নহে। কতক মুসলমান মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত আর্য্যগণের সন্তান, আর কতক আর্য্যজাতীয়া গর্ভসম্ভূত মুসলমান ঔরস। এই ব্যাপার বহুশতাব্দী হইতে পুরুষপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিয়া, এক্ষণে ভারতবাসী মুসলমানমাত্রকে, আফগান, পারস্য, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি সকল দেশের

মুসলমান হইতে একটী বৈচিত্র্য প্রদান করিয়াছে—ইঁহারা আকার প্রকারে ভারতবাসী হিন্দুর যত সদৃশ হইয়াছেন, বহিঃস্থ কোন জাতীয় মুসলমানের আর তত সদৃশ নাই।

আকার ইঙ্গিতেও যেমন, আচার ব্যবহারেও সেইরূপ। ভারতবাসী মুসলমানেরা অনেকানেক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার গ্রহণ করিয়াছেন। এমন প্রদেশ নাই যেখানকার অধিকাংশমুসলমান, জ্যোতির্বিদ এবং অপরাপর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কিছু সম্মান এবং সমাদর না করেন—যেখানে গোবধ করিতে এবং গোমাংস ভক্ষণ করিতে কিছু না কিছু সঙ্কুচিত না হন—যেখানে হিন্দুদিগের পর্ব্বোৎসবে আমোদ প্রমোদ না করেন—যেখানে আপনাদিগের বিবাহাদি কার্য্যে প্রতিবেশী হিন্দুদিগকে নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ না করেন। বাঙ্গালার এবং দাক্ষিণাত্যের ত কথাই নাই। কারণ ঐ ঐ প্রদেশবাসী অতি উচ্চবংশীয় মুসলমানের মধ্যেও কেহ কেহ গোপনে প্রতিনিধি ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা আপনাদিগের নামে সঙ্কল্প করাইয়া দুর্গোৎসব এবং রথযাত্রার মহোৎসব করাইয়া থাকেন। অপর অনেকে অনুগত ব্রাহ্মণ-দিগের দ্বারা আপনাদিগের অর্থব্যয়ে ব্রাহ্মণ-সজ্জনের অতিথিসৎকার করেন।

আরও দেখা যায় সামান্য মুসলমানদিগের মধ্যে পৈতৃক অধিকার সম্বন্ধে সুবহুস্থলে হিন্দুদিগের প্রথাই প্রচলিত হইয়াছে। ঐ সকল মুসলমান-দিগের কন্যাগণ মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে যে স্ব স্ব পিতৃধনভাগিনী সে কথা আর মনেও করে না। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে ধর্ম্ম বিভিন্নতা জন্য তীব্র বিদ্বেষ বেশী দিন থাকে না। বর্ণভেদ প্রণালী গ্রাহ্য থাকায় এখানে বৈবাহিক বিষয়ে ও আহারাদিতে মিলন না থাকিয়াও লোকের সহানুভূতি রক্ষিত হওয়া চিরাভ্যস্ত। জৈন এবং শিখদিগকে যেমন সাধারণ হিন্দু সমাজের সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, কালে এখনকার মুসলমানেরাও যে ভারত সমাজের মধ্যে একটী বর্ণবিশেষ রূপেই লক্ষিত হইবেন তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

পরন্তু, এইরূপ সম্মিলন ব্যাপার যে সর্ব্বদা নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পায়, তাহা নহে। যদি আরবাদি মুসলমান রাজ্য হইতে কোন মৌলবী এদেশে আসিয়া অথবা এখানকারই তেমন ধর্ম্মোন্মাদগ্রস্ত এবং বিদ্যাসম্পন্ন কোন বড়মৌলবী মুসলসমানদিগের উত্তেজনা করেন, তবে অনেকেই তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া কিছু কালের জন্য, যতদূর পারেন, হিন্দুর অনুকরণ ছাড়িয়া দেন। ১৮৪৮ অব্দের পর একবার ঐরূপ দেখা গিয়াছিল। সৈয়দ আহম্মদ নামক একজন মৌলবী আসিয়া বঙ্গদেশের মুসলমানদিগকে গোমাংস খাইতে, বিধবার বিবাহ দিতে, দেব পূজার দ্রব্য গ্রহণ না করিতে, এবং হিন্দুর নিমন্ত্রণে না যাইতে, শিখাইয়া ছিলেন। কিন্তু ঐরূপ উত্তেজনার ফল অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। এবং দেখা যাইতেছে যে, ওরূপ উত্তেজনাও ক্রমে ক্রমে কালে দূরবর্ত্তী, এবং প্রসরতায় স্বল্পস্থলব্যাপী, হইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদ রক্ষা করিবার এবং তাহা বর্দ্ধিত করিবার অপর একটী প্রবলতর কারণ উপস্থিত হইয়া আছে। অনেক ইংরাজ গ্রন্থকার কথন স্পষ্টাক্ষরে, কথন ইঙ্গিতক্রমে অনুক্ষণই বলিয়া থাকেন যে মুসলমানেরা যখন দেশের রাজা ছিল, তখন হিন্দুদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার সমস্ত করিয়াছিল। ইংরাজ গ্রন্থকারেরা এইরূপে হিন্দুদিগের মনোমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটী গূঢ় বিদ্বেষ-বীজ বপন করিয়া দিতেছেন। আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত যুবকদিগের হৃদয়ে মুসলমানজাতি এবং মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি যতটা বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে, পূর্ব্বকালের পারস্যভাষায় সুশিক্ষিত সদাচারসম্পন্ন, সদ্‌ব্রাহ্মণদিগেরও মনে তাহার অর্দ্ধাংশ দেখা যাইত না। ছাপরা নগর-বাসী কয়েকটী ব্রাহ্মণ তত্রত্য একটী সুপ্রসিদ্ধ মৌলবীর সম্বন্ধে আমাকে বলিয়াছিলেন—"মহাশয়! মৌলবী সাহেব মুসলমান হইলে-কি হয়, উনি এমনি পবিত্রাচার ও পবিত্রমনা ব্যক্তি যে আমরা ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি উহাঁর উচ্ছিষ্ট ভোজন করি, তাহাতে আমরা অপবিত্র হইলাম এমন মনে করিতে পারি না।" বাস্তবিক, মুসল

দিগের মধ্যে এমনি উদার-চেতা, পবিত্রকর্ম্মা মহাশয় সকল আছেন বটে। আমি অনেকানেক প্রধান প্রধান মৌলবীর সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি যে প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন মুসলমানেরা অত্যুন্নত আর্য্যামতবাদই গ্রহণ করিয়া আছেন। তাঁহাদিগেরই মধ্যে একজনের সহিত কথোপকথনকালে যখন শুনিলাম "উও ইয়েঃ হ্যায়" আমার বোধ হইল, যেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বৈদিক মহাবাক্যটী কোন প্রাচীন ঋষির মুখ হইতে বিনির্গত হইল।

যে জাতির মধ্যে আজিও এমন সকল লোক বিদ্যমান আছেন, সেই জাতি যে আপনার অভ্যুদয় কালে নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারকারীদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তাহা কদাপি বিশ্বসনীয় নহে। মুসলমানদিগের ভারত-রাজ্য শাসনে আমাদিগের অনেক উপকার দর্শিয়াছে। তাঁহাদিগের রাজত্ব হইয়াছিল বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষ একটী সর্ব্ব প্রদেশ সাধারণ প্রায় হিন্দিভাষাপ্রাপ্ত হইয়াছে—হর্ম্ম্য শিল্পের একটী উৎকৃষ্ট প্রণালী সুসংযুক্ত হইয়াছে—সৌজন্যরীতির আদর্শ প্রাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদিগের নিকট ভারতবর্ষ যথার্থতঃই মহা ঋণগ্রস্ত। কোন কোন মুসলমান নবাব, সুবা এবং বাদসাহ প্রজাপ্রপীড়ন করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু অনেকেই ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন; আর যাঁহারা অন্যায়াচারী ছিলেন তাঁহাদিগেরও অত্যাচার প্রায়ই দেশব্যাপী হয় নাই, দুই চারিটী ধনশালী এবং পদস্থ লোকের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছিল।

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া বাধাইয়া রাখিবার জন্য কোন কোন ইংরাজ আর একটী উপায় অবলম্বন করেন। ইংরাজ গবর্ণ-মেণ্টের যে ঐরূপ কোন অভিসন্ধি আছে, তাহা বলিতে পারা যায় না। কারণ প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ মাত্রেই জানেন যে দুরভিসন্ধিতে রাজ্য পালনের উপায় নাই—তাঁহারা জানেন যে রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি এতদু-ভয়ের পার্থক্য বাহ্য মাত্র, আভ্যন্তরিক নহে। এই প্রকৃত তথ্য বুঝিয়াই মহারাজ্ঞীর নীতি বিশারদ মন্ত্রিবর্গ এবং পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা পুনঃ পুনঃ স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে কাহার কি ধর্ম্ম এবং কাহার কি

জাতি তাহা বিচার না করিয়া সমস্ত প্রজাকে সমভাবে পালন করা হইবে। কিন্তু স্বল্পদর্শী অনেকানেক ইংরাজ উল্লিখিত উচ্চতম রাজনীতিসূত্রটী বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা স্বদেশীয় বিদ্যালয়ে অতি যত্নপূর্ব্বক প্রাচীন রোমীয়-দিগের ভাষা, সাহিত্য, ব্যবস্থাশাস্ত্র এবং রাজনীতি শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে যত বিজিগীষু জাতি প্রাদুর্ভূত হইয়া গিয়াছে, তাহা-দিগের মধ্যে রোমীয় জাতির রাজনীতিই বিশিষ্টরূপে দৃঢ়-সম্বদ্ধ বলিয়া ঐ সকল ইংরাজ দিগের সংস্কার হইয়া থাকে। সেই বাল্যসংস্কার বশতঃ তাঁহারা মনে করেন যে, রোমীয়েরা যেমন শক্রুরাজ্যের মধ্যে পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া দিয়া তাহাদিগের সকলগুলিকেই জয় করিয়াছিল, সেইরূপ প্রজায় প্রজায় মনের মিল না হইতে দেওয়াই বিজয়লব্ধ রাজ্য-পালনের বিধি। এই ভাবিয়া উহাঁরা সর্ব্বদাই হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে যাহাতে সম্মিলন না হইতে পায়, তাহার জন্য যত্ন করেন। কৌশল করিয়া কখন মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর একটু অধিক আদর করেন, এবং যখন হিন্দু সেই আদরে ভুলিয়া যায়, তখনই আবার মুসলমানের দিকে বিলক্ষণ ঝোঁক দেন। এই রূপে ঐ সকল ইংরাজদিগের কখন এ দিকে কখন ও দিকে ঝোঁক দেওয়াতে হিন্দু এবং মুসলমান পরস্পর পৃথক হইয়া পড়িতে পারে। ঐ সকল ইংরাজের এই কৌশলটী যে অপরিণামদর্শিতার ফল তাহা নিঃসন্দেহ; কারণ যদিও রোমীয়দিগের ঐরূপ রাজনীতি থাকা সত্য হয়, তথাপি সে রাজনীতির বলে রোমসাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হয় নাই। অতএব ঐ রাজনীতি সর্ব্বতো-ভাবে দূষ্য। কিন্তু উহা যতই দূষ্য হউক, ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষ সতর্ক হওয়াই উচিত। ঐ সকল ইংরাজ, মুসলমানের আদর যতই করুন, মুসলমানের পক্ষপাতী হইয়া যতই কথা কহুন, আর পুস্তিকাদি প্রণয়ন করিয়া যতই মুসলমানভক্তি প্রদর্শন করুন—তাহাতে হিন্দুদিগের কোন মতেই ঈর্ষ্যা করা বৈধ নহে। ঈর্ষ্যা করিলেই উহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। আজি কালি মুসলমানের দিকে ঝোঁক পড়িতেছে। দুই চারিটি মুসলমানের ভাল চাকরী পাইবার পক্ষে কিছু সুবিধা হইবে।

আরও একটা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইংরাজ বিবিরা একটী সভা করিয়া স্থির করিয়াছেন মুসলমানেরা তাঁহাদিগের উদ্বাহ যোগ্য। উহারা যদিও পেগম্বর মহম্মদকেই বিশিষ্টরূপে মান্য করে তথাপি ঈশাবেন মেরিয়ামকে একেবারে ফেলনা করে না। অতএব মুসলমানদিগের ভাগ্যে দুই চারিটী বিবি বিবাহও ঘটিতে পারে!

আর একটী কথা বলা আবশ্যক। ইংরাজ, ভারতবাসীর মধ্যে যদি কাহাকেও অধিক অবিশ্বাস করেন, তাহা মুসলমানকে। মুসলমানের হাত হইতেই ইংরাজ সাম্রাজ্য লইয়াছেন এবং মুসলমানের মধ্যেই সম্মিলন-প্রবণতা অপেক্ষাকৃত অধিক আছে। বৈদেশিক রাজবলও মুসলমানদিগেরই পৃষ্ঠপূরক হইতে পারে। আর ভূতপূর্ব্ব সিপাহিবিদ্রোহের সময়ে যদিও হিন্দু সৈনিকেরাই বিদ্রোহ ঘটনার সূত্রপাত করে, তথাপি মুসলমানই সাম্রাজ্যাসনে বসিয়াছিলেন।

——o(o)o——

জাতীয় ভাব—ভারতবর্ষে খৃষ্টানাদি।

সমুদায় ভারতবাসীর সংখ্যা পঞ্চবিংশতি কোটী; খৃষ্টানের সংখ্যা আদমসুমারীতে ১৮ লক্ষ অর্থাৎ দেড় শতে একজন মাত্র হইল; সুতরাং জাতীয়ভাবের বিচারে উহারা নগণ্য।

কিন্তু সংখ্যাতে কম বলিয়াই যে উহারা নগণ্য তাহা নহে। উহাদিগের ধর্ম্মপরিবর্ত্তনের সহিত জাতীয়ভাব পরিবর্ত্তিত হয় না। ইউরোপীয় জাতিদিগের সাম্যবাদ, যদি মুসলমানদিগের সাম্যবাদের ন্যায় কথায় এবং কাজে অভিন্ন হইত, তাহা হইলে দেশীয় কৃত-খৃষ্টানদিগের মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থায় একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু ইউরোপীয় পাদ্রিরা শুদ্ধ খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াই ছাড়িয়া দেন; মুসলমান বাদসাহ, নবাব, প্রভৃতির ন্যায় হিন্দুর জাতি মারিয়া তাহাকে

সমাদরপূর্ব্বক আপনাদের ভাল ঘরে বিবাহ দেওয়া এবং কোন জায়গীর কি চাকরি, কি তাহার অন্ন সংস্থানের কোন একটা উপায় করিয়া দেওয়া, কি তাহাকে লইয়া এক সঙ্গে খাওয়া বসা করা, ইহার কিছুই করেন না। তবে আজি কালি হিন্দু এবং মুসলমানকে না দিয়া কৃত-খৃষ্টানদিগকে সকের ফৌজ বা ভলন্টিয়র্ হইতে দিবেন বলিয়াছেন। তাহাতে ফল কি হয়, পরে বুঝা যাইবে। এ পর্য্যন্ত কৃত-খৃষ্টানেরা প্রায়ই জাতীয়ভাব পরিচ্যুত হইতে পারেন নাই। উঁহারা আর সামান্য ফিরিঙ্গিরা প্রায় একই ভাবাপন্ন হইয়া আছেন। উভয়েরই ইচ্ছা, ইউরোপীয়দিগের নিকট ঘেঁসিয়া বসেন, কিন্তু ইউরোপীয়েরা উহাঁদিগের ঘেঁস কিছু মাত্র সহিতে পারেন না। কখন পারিবেন বলিয়াও বোধ হয় না—বিশেষতঃ ভারতবর্ষে, যে ইউরোপীয় জাতির বিশেষ প্রাদুর্ভাব, তাঁহাদিগের হৃদয়ে অপর জাতির প্রতি ঘৃণা একটী মৌলিক ধর্ম্ম। এমন ইংরাজ জাতির ভাষা শিখিলেই বা কি, আর তাহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই বা কি, আর তাহার পরিচ্ছদাদি ধারণ করিলেই বা কি— ইংরাজ কিছুতেই পরকে আপনার করিতে পারেন না। যদি ভারতবর্ষের রাজশক্তি ইংরাজের হস্তগত না হইয়া পোর্ত্তুগীজের কিম্বা ফরাসীর হস্তগত হইত, (কোন সময়ে তাহার উপক্রমও দেখা দিয়াছিল) তাহা হইলে ভারতবর্ষের সমূহ দুর্ভাগ্য হইত সন্দেহ নাই। উহাদিগের অধীন থাকিলে ভারত বর্ষের কৃত-খৃষ্টানের সংখ্যা বাড়িয়া যাইত, সেই সকল স্বধর্ম্মত্যাগী লোকের কতকটা গৌরব হইত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজকার্য্য সকল তাহাদিগেরই হস্তগত হইত, এবং উহারা একেবারেই ভারতবর্ষীয় ভাব পরিহারপূর্ব্বক জন্মভূমির বক্ষঃস্থলে শেলস্বরূপ বিদ্ধ হইয়া থাকিত। কিন্তু ইংরাজ এখানকার রাজা হওয়ায়, কৃত-খৃষ্টানেরা কোন বিশেষ অধিকার পায় নাই, অপর সকল ভারতবাসী যে পরিমাণে ঘৃণিত এবং অবজ্ঞাত হইয়া আছে, উহারাও সেইরূপ আছে;—সুতরাং জাতীয়ভাব পরিচ্যুত হইতে পারে নাই।

আমি দেখিয়াছি, যাঁহারা স্বয়ং খৃষ্টান হইয়াছেন, তাঁহারা প্রথমাবস্থায় ধর্ম্মধ্বজী হইয়া দেশীয় ধর্ম্মপ্রণালীর নিন্দা করত যেমন সকলকে ভজাইবার চেষ্টায় মত্ত হইয়া বেড়ান, কিছু দিন অতীত হইলে, তাঁহাদের আর ততটা তেজঃ থাকে না, স্বজাতীয় লোকের মত নম্রস্বরে বিনা নিন্দাবাদে, খৃষ্টীয় গৌরব অন্তর্হৃদয়ের অন্তর মধ্যে নিহিত করিয়া দেশীয় লোকের সহিত এক-পরামর্শী হইয়া বেশ চলিতে পারেন; এমন কি, গুরু-স্থানীয় পাদ্রি সাহেবদিগেরও স্বার্থ-চিন্তা এবং দাম্ভিকতার উল্লেখ করিতে পারেন। আর যাঁহারা কৃত-খৃষ্টানদিগের সন্তান, তাঁহাদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম ভজাইবার চেষ্টা ত কখনই দেখিতে পাই নাই। উহাঁদিগের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্মানুরাগটা একেবারেই জন্মে না, বলিলেও চলে। উহাঁরাও অপরাপর ভারতবাসীর ন্যায় আপনাপন পিতৃমাতৃ ধর্ম্মই প্রাপ্ত হইয়াছেন—উহাঁদের সহিত অপর সকলের ইতর বিশেষ থাকিবে কেন?

কৃত-খৃষ্টানদিগের সন্তান সন্ততি, বঙ্গদেশ বা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বা মধ্যপ্রদেশ, এই সকল আর্য্যবহুল স্থানে যত দেখা যায়, তাহা অপেক্ষা অনার্য্যবহুল মান্দ্রাজ প্রদেশে এবং গোয়ানগরের সন্নিহিত পশ্চিমোপকূলে অনেক অধিক। ঐ সকল প্রদেশে খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রচার, কাথলিক যাজক বর্গের দ্বারা বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়াছিল। ঐ যাজকদিগের মধ্যে অনেক সাধুশীল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহারা ভারতবর্ষীয় আর্য্য ঋষি মুনি অথবা মহম্মদীয় ফকীর দরবেশদিগের ন্যায়, অতি বিনম্রভাবে পার্থিব বিভবশালিতা এবং ভোগ সুখে জলাঞ্জলি দিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করিতেন—যাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিতেন, সেই হিন্দু মুসলমানের প্রদত্ত রাজস্ব হইতে বেতন গ্রহণ পূর্ব্বক গাড়িঘোড়া চড়িয়া বাবুয়ানা করিতেন না, গেরুয়া বস্ত্র পরিতেন, কুটীরে থাকিতেন, শাকান্ন খাইতেন। তদ্ভিন্ন তাঁহারা যে সকল লোকের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তাহারাও সমধিক পরিমাণে অনার্য্যকুলসম্ভূত, ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব বিচারে অপেক্ষাকৃত

অসমর্থ। এই সকল কারণের সমবায়ে ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলেই কৃত খৃষ্টানের সংখ্যা অধিক হইয়া আছে।

এক দিন পণ্ডিচেরি হইতে তাঞ্জোর নগরে যাইবার পথে একটী তদ্দেশীয় খৃষ্টানের সহিত রেলের গাড়িতে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি প্রথমতঃ তাঁহাকে খৃষ্টান বলিয়া চিনিতেই পারি নাই, তাঁহার পরিচ্ছদ তদ্দেশ প্রচলিত পরিচ্ছদ হইতে অভিন্ন, মাথায় উষ্ণীষ—উষ্ণীষ খুলিলে, মাথার কিয়দ্ভাগ ক্ষৌরকর্ম্ম দ্বারা পরিষ্কৃত এবং মধ্যস্থলে সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছ। নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, "সুব্রহ্মণ্য" তাহার অগ্র পশ্চাৎ 'জন' কি 'মাইকেল' কিছুই শুনিলাম না। এ সকল লক্ষণে খৃষ্টান বুঝায় না। অতএব জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি কি ব্রাহ্মণ?" উত্তর করিলেন "তা বই কি!" আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "তা বই কি বলিলেন কেন?" তিনি বলিলেন আমি "ব্রাহ্মণ বংশজাত কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী; আমার প্রপিতামহ খৃষ্টান হইয়াছিলেন, সেই অবধি আমার কোন পূর্ব্বপুরুষ ব্রাহ্মণকন্যা ভিন্ন অপর জাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেন নাই, আমরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মে খৃষ্টান"। "আপনি এখন কোথায় যাইবেন?" "তাঞ্জোরের মহাদেবের মন্দিরে যে মেলা হইবে তাহাই দেখিতে যাইব। আমার মাতা, ভগিনী, পিতৃষ্বসা প্রভৃতি পরিবারবর্গ অপর গাড়িতে আছেন।" "স্ত্রীলোকেরা কি দেবতার নিকট পূজাদি মানসিক করিয়া থাকেন?" "কথন কথন করেন—আমরা ধর্ম্মই বদলাইয়াছি, জাতি বদলাই নাই।"

ভারতবর্ষে কৃত-খৃষ্টান ভিন্ন অপর যত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী আছেন তাহার মধ্যে ইউরেশীয় বা ফিরিঙ্গিরাই প্রকৃত প্রস্তাবে এতদ্দেশবাসী। উহারা ৬০ সহস্র পরিমিত। উহাদের এক দল সম্প্রতি আহার, বিহার, গৃহ এবং পরিচ্ছদাদি দেশীয় মুসলমানদিগের অনুরূপ করিবার কথা তুলিয়াছেন। পাদ্রি টেলর সাহেবের ন্যায় কোন কোন ইউরোপীয়ের প্ররোচনায় যদি অতদূর করিয়া উঠিতে না পারেন,

তথাপি উহাদিগের মধ্যেও যে জাতীয় ভাবের কথঞ্চিৎ প্রবেশ হইয়া আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

খৃষ্টান ভিন্ন বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী যে সকল লোক ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বাস করেন তাঁহাদিগের মধ্যে একমাত্র পার্সি ভিন্ন অপর সকলেই আপনাদিগকে হিন্দুসমাজের শাখাবিশেষ বলিয়াই জানেন এবং সম্পূর্ণরূপে জাতীয় সহানুভূতি সম্পন্ন।

এতদ্ভিন্ন এই মহাদেশ মধ্যে অপর কতকগুলি লোক আছে তাহাদিগকে আদিমনিবাসী বলা যায়; তাহাদের সমষ্টি সংখ্যা ৬৪ লক্ষ। ইহারা ভারতবর্ষের কোন এক প্রদেশে নাই। বন পর্ব্বতময় যে ভূমিতে এই সকল লোকদিগের বিভিন্ন গোষ্ঠীয়েরা বাস করে, শুনা যায়, তাহাদের ভাষাসংখ্যা ১৫০এর অনূ্যন। ঐ বিভিন্ন জাতীয় লোকদিগের আকার, ভাষা ও আবাস সাদৃশ্যে প্রধানতঃ তিন দল ধরা যায়। এক দলকে হিন্দু-তাতার জাতীয় বলা যায়। ইহারা হিমালয় পর্ব্বতাঞ্চল বাসী এবং খস, গারো, ডফ্‌লা, লুসাই, নাগা কুকি, মেক, লেপ্‌চা প্রভৃতি বিবিধ নামে পরিচিত। দ্বিতীয় দল কোলেরীয়। ইহারা বিন্ধ্যপর্ব্বতাঞ্চলবাসী এবং সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডার, জুয়াং নামে অভিহিত। তৃতীয়, দ্রাবিড়ীয় দল দাক্ষিণাত্য পর্ব্বতবাসী ও গোন্দ, তোড়া, ধাঙ্গড় প্রভৃতি নাম বিশিষ্ট।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা এই তিন দলের ভাষা ভেদ নিরূপণ পূর্ব্বক উত্তরাঞ্চলবাসীদিগকে পৈশাচ-ভাষী, মধ্য-পর্ব্বতবাসীদিগকে প্রাকৃত ভাষী, এবং দক্ষিণাঞ্চলবাসী আদিমদিগকে রাক্ষস-ভাষাভাষী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এই সকল লোকের মধ্যে জাতীয় ভাব এখনও সম্পূর্ণরূপে গোষ্ঠীয় ভাবের অন্তর্নিহিত আছে। কিন্তু সর্ব্বস্থানেই আদিমেরা ক্রমশঃ হিন্দুসমাজের ক্রোড়ে গৃহীত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। অনুষ্ঠান বাহুল্য এবং অধিকারী ও জাতি ভেদ স্বীকার নিবন্ধন সুবিস্তৃত ভিত্তি সম্পন্ন হিন্দুসমাজই আদিমদিগকে সভ্যাবস্থ ও উন্নত করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। হিন্দুসমাজ সেই উপযোগিতা এমন সম্যকরূপে প্রদর্শন করি-

য়াছে যে ঐ ৬৮ লক্ষমাত্র, এক্ষণে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভূত হইয়া যাইতে অবশিষ্ট আছে। মুসলমানেরা প্রকৃত আদিমদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। আর এখন খৃষ্টান পাদ্রিরাও যে আপনাদের মতবাদ অক্ষুণ্ণ রাখিলে অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন তাহা বোধ হয় না। আদিমদিগের মধ্যে জাতীয়ভাবের উদয় হিন্দুসমাজের ভিতর আসিয়াই হইতে পারে এবং তাহাই হইবে।

জাতীয়ভাব—ঐতিহাসিক প্রকৃতি ভেদ।

জাতিভেদে সর্ব্বপ্রকার সাহিত্য রচনার রীতি ভিন্ন হয়; ইতিবৃত্ত প্রণয়নের প্রণালীও স্বতন্ত্র হয়। নিরক্ষর বর্ব্বর জাতীয়েরা আর কিছু না পারুক, কয়েকটী কবিতা বিরচন করিয়া, আপনাদিগের জাতিসম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ঘটনা গুলি স্মরণ করিয়া রাখে। বস্তুতঃ ঐরূপ কবিতাই সকল দেশের ঐতিহাসিক শাস্ত্রের মূল। ঐ গুলির দ্বারা পূর্ব্বগত ঘটনার স্মৃতি জাগরূক থাকে, সেই ঘটনাবলীর বিচার দ্বারা রাজনিয়মের এবং বীরতা, ধীরতা, চতুরতা প্রভৃতি গুণের আদর্শ প্রদত্ত হইয়া লোক-শিক্ষার বিশিষ্টরূপ সহায়তা হয়। ঐ গীতীতিহাস গুলি জাতীয় উন্নতি সহকারে পরিস্ফুট হইয়া জাতীয় প্রকৃতির অতি সুস্পষ্টরূপ অভিব্যক্তি করিতে থাকে। দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথা স্পষ্ট করিতেছি।

তাতার বা তুরাণীয় জাতিদিগের মধ্যে প্রায় সকলেরই ইতিহাস গ্রন্থ আছে। সেই গ্রন্থগুলিতে কোন্ সময়ে কোন্ ঘটনার সংঘটন হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে—কিন্তু ঘটনা পরম্পরার মধ্যে সময়ের পূর্ব্বাপর-ক্রম ভিন্ন যে অন্য একটা গূঢ় বন্ধন আছে, তাহা ঐ সকল ইতিহাসে ঘুণাক্ষরেও লক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ সময়ের পর-পূর্ব্বতা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের অতি স্থূল চিহ্নমাত্র। তাতারজাতীয় লোকেরা যেমন অনুকরণ-প্রবণ এবং শিল্প নিপুণ, কার্য্যকারণ সম্বন্ধের বিচারে তেমন সূক্ষ্মদর্শীও নয় এবং তদনুযায়ী কল্পনা

কুশলও নয়। তুরাণীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিনীয় জাতির ইতিহাস গ্রন্থগুলি এইরূপে লিখিত—অমুক সম্রাটের রাজ্যকালে অমুক বর্ষের অমুক মাসের অমুক দিবসে অমুক প্রদেশে বিদ্রোহ হইয়াছিল, বা অমুক নদীর জলোচ্ছ্বাস হইয়াছিল, বা সূর্য্যের অথবা চন্দ্রের গ্রহণ হইয়াছিল। এরূপ ইতিবৃত্ত এক প্রকার পঞ্জিকা; এ গুলিকে পঞ্জিকেতিহাস বলা যায়। ভারতবর্ষের যে যে প্রত্যন্ত ভাগে, তাতার জাতীয় লোকের বসতি বা প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, সে সকল ভাগেও ঐরূপ পঞ্জিকেতিহাস বিরচিত হয়। যথা আসামে, নেপালে, কাশ্মীরে। কাশ্মীর দেশাগত রাজতরঙ্গিণী নামক সংস্কৃত গ্রন্থখানিও ঐরূপ কোন পঞ্জিকেতিহাসেরই সংগ্রহ গ্রন্থ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

আরবীভাষায় লিখিত মুসলমান-গ্রন্থকর্ত্তাদিগের ইতিহাস গুলিতেও কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বোধের উপায়, পরপূর্ব্বসময়ের নির্দ্দেশমাত্র, আর কিছুই নহে। প্রত্যুত ঘটনাবলীর বিবরণে, ঐ সম্বন্ধের কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। মুসলমান গ্রন্থকর্তৃগণ সর্ব্বস্থলেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ ইচ্ছা ভিন্ন অপর কোন কারণের নির্দ্দেশ করা যেন অবৈধ জ্ঞান করিতেন। অমুক সেনাপতি এমত বীরপুরুষ হইয়াও অমুক নগরটী জয় করিতে পারিলেন না, আর অমুক তাহা অপেক্ষা অল্পজ্ঞান এবং শান্ত-স্বভাব হইয়াও সেই কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ করিতে পারিলেন কেন? আরবীয় গ্রন্থকারের মনে, যদি কখন ওরূপ প্রশ্ন উদয় হইত, তিনি এক কথায় তাহার মীমাংসা করিতেন, বলিতেন—আল্লার কোদরৎ। আরবেরা যে একান্ত স্বধর্ম্ম নিরত এক-মনা জাতি তাঁহাদিগের ইতিহাস গ্রন্থও সেই ভাব সুব্যক্ত করে।

য়িহুদীতে এবং আরবে অনেকটা মিল আছে। উভয়েই সেমেটিক বংশীয়, উভয়েই ঘোর একেশ্বরবাদী, উভয়েই স্ব স্ব ধর্ম্ম নিরত, উভয়েই জাগতিক কার্য্যে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠান স্বীকার করেন। উহাঁদিগের মধ্যে প্রভেদ এই, যে মহম্মদীয় ধর্ম্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক আরব শিখিয়াছেন

যে, মৃত্যুর পর স্বর্গ নরক ভোগ আছে। য়িহুদী সে কথা জানে না। সুতরাং কোন ধর্ম্মশীল ব্যক্তি যদি দুঃখ, কষ্ট, পরাভব প্রাপ্ত হয়, আরব বলিতে পারেন যে, উহা সয়তানের কারসাজি; মৃত্যুর পর, ঈশ্বরের কৃপায়, তাহার সমস্ত মঙ্গল হইবে। য়িহুদীর পক্ষে ঐ পথ নাই। পুণ্যবান ব্যক্তি যদি দুঃখে পতিত এবং দুষ্ট লোক কর্ত্তৃক নিপীড়িত হয়, ইতিহাসে তাদৃশ ঘটনা নিবদ্ধ করিতে হইলে য়িহুদী গ্রন্থকারকে একটী কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। তাঁহাকে বলিতে হয় যে, ঐ দৃশ্যতঃ পুণ্যবান ব্যক্তি অন্তরে পাপী ছিল। য়িহুদী অন্য কোন পাপের বড় একটা উল্লেখও করেন না—তাঁহার আপনার অভীষ্ট যাভেঃ দেবের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং ভয় যাহার কম বা নাই, সেই পাপাত্মা। ধর্ম্মের এই লক্ষণ করিয়া, য়িহুদী আপনার ইতিহাস গ্রন্থকে "যতোধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ" এই একটী সূত্রে সম্বদ্ধ করিতে পারিয়াছেন; য়িহুদীর ইতিহাস তাঁহার জাতীয় প্রকৃতির দর্পণস্বরূপ হইয়া আছে।

ভারতবর্ষীয়দিগেরও ইতিহাসের মূল সূত্র "যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ"—কিন্তু ভারতবর্ষে ঐ সূত্রের গ্রন্থন-প্রণালী স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষীয় গ্রন্থকর্ত্তৃগণ কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ বোধে, পৃথিবীর অপর সকল জাতীয় লোক অপেক্ষা, অধিকতর নিপুণ। তাঁহারা ঐ সম্বন্ধের স্থূল লক্ষণ যে, কারণের "পূর্ব্ববর্ত্তিতা" তাহার অপেক্ষা ঐ সম্বন্ধের যে গূঢ়তর লক্ষণ "অনন্যথা সিদ্ধি" তাহা বিশিষ্টরূপেই উপলব্ধ করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা ঐ সম্বন্ধের আরও অন্তর্ভেদ করিয়া দেখেন, এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধেরও কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক ঐশী শক্তির সর্ব্বব্যাপিতা এবং সর্ব্বময়তা উপলব্ধ করেন। সুতরাং ইহাঁদের হস্তে যতোধর্ম্ম স্ততোজয়ঃ সূত্রটী ভিন্ন ভিন্ন দুইটী থাই সংযুক্ত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ দুইটী থাইয়ের একটীর নাম 'প্রাক্তন' অর্থাৎ পূর্ব্বকালবর্ত্তী দৃষ্টাদৃষ্ট কারণ কূট, দ্বিতীয়টীর নাম 'পুরুষকার' অর্থাৎ ধর্ম্ম সহকৃত বর্ত্তমান-কালবর্ত্তী বুদ্ধি বলাদি করণের প্রয়োগ। ঐ দুইটীর অপর নাম "পূর্ব্ব তপস্যা" এবং "বর্ত্তমান উদ্যোগ" সুতরাং পূর্ব্ব তপস্যা এবং বর্ত্তমান উদ্যোগ উভয়ের সমবায় না হইলে ভারতবর্ষীয়দিগের লক্ষণে লক্ষিত 'ধর্ম্ম'

হয় না এবং 'ধর্ম্ম' না হইলে জয় নাই। ভারতবর্ষীয় ইতিহাস ঐ ধর্ম্মসূত্রে সম্বদ্ধ এবং 'পুরাণ' নামে বিখ্যাত।

কোন কোন স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় নব্য পণ্ডিতের মতে, আমাদিগের পুরাণোক্ত ব্যাপার সমুদায় পার্থিব ভূত সমূহের অথবা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির, কিম্বা আধ্যাত্মিক ভাব সমুদায়ের, কবিব্যঞ্জনা মাত্র—প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনা নয়। কিন্তু ঐ সকল পণ্ডিতের ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। প্রাকৃতিক বস্তুতে এবং প্রাকৃতিক শক্তি সকলে বিশিষ্ট সজীবতার এবং মানব ভাবের আরোপ হইবারও মূল, ঐতিবৃত্তিক ঘটনাবলী ভিন্ন আর কিছুই নহে। কবিদিগের হস্তে প্রকৃত নর, নারী, বস্তু, ঘটনাদি আসিয়া উপস্থিত হইবার পর, সেই গুলি উপমা, অত্যুক্তি. রূপকাদি অলঙ্কারে ভূষিত এবং সরস হইয়া কাব্যেতিহাসরূপে প্রণীত হয়।

তবে কি, যাঁহারা সৌরাদি ভাবের ব্যঞ্জনামাত্র বলিয়া পুরাণবর্ণিত ব্যাপার সকলের ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদিগের সকল কথাই অযৌক্তিক? তাহাও নয়। মূলে প্রকৃত ঘটনা থাকে, কালক্রমে লোকে সেই ঘটনার আনুষঙ্গিক অনেকানেক কথা বিস্মৃত হয়, তৎপরে কবিগণ, উহাদিগকে স্ব স্ব হৃদয়-ভাবে রঞ্জিত করিয়া লিপিবদ্ধ করেন। কবি-হৃদয়ে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় কবির হৃদয়ে, প্রাকৃতিক ভাব সবিশেষ প্রবল। এই জন্য ভারতবর্ষীয় কবির প্রণীত কাব্যেতিহাস গুলিতে প্রাকৃতিক ব্যাপারের বিশেষ সংস্রব হইয়াই আছে। এস্থলে একটী তথ্যের স্মরণ করা আবশ্যক - জাগতিক বস্তু এবং কার্য্য মাত্রেই এবম্ভূত, যে তাহার প্রত্যেকটীতেই সকলটী থাকে। এই জন্য যে কোন ঘটনাই উপস্থিত হউক, কবির হৃদয়ে যে ভাব তৎকালে জাগরূক তাহাই ঐ প্রকৃত ঘটনায় সংশ্লিষ্ট হইয়া যাইতে পারে। পুরাণগুলিকে অলীক কাব্য রচনা মাত্র মনে করা ভুল। উহারা কাব্য বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক কাব্য। একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিব। পুরাণে কথিত আছে, ভগবান, বামনাবতারে বলি নামক অসুর রাজাকে পাতালতলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ নগরের নিকট সাদ্রাস নামক

স্থানে গিয়া দেখিয়া আইস, বলি রাজার পুরী সমুদ্র গর্ভস্থ হইয়া আছে। বামন=ত্রিবিক্রম= সূর্য্য; বলি=পূজার উপহার। ইহা প্রাকৃতিক তথ্য; পূজোপহারের সন্নিধানে ভগবান বামন অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকার; নচেৎ পূজার সম্ভাবনা হয় না। ইহা আধ্যাত্মিক তথ্য। এই উভয় তথ্যের প্রকাশেই কবি ব্যঞ্জনা লক্ষিত হয়। কিন্তু সুসমৃদ্ধ মহাবলিপুর যে সমুদ্র তলস্থ বা পাতাল প্রবিষ্ট এটী ঐতিহাসিক ঘটনা।

ইউরোপীয়েরা ইতিহাস বলিতে গ্রীকদিগের, এবং তদনুকারী রোমীয়দিগের, ইতিহাসই বুঝেন; আর আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে স্থান পাইয়াছে বলিয়া, য়িহুদীদিগের গ্রন্থকেও ইতিহাসের বহির্ভূত করেন না। কিন্তু য়িহুদীদিগের গ্রন্থেও সন তারিখের কোন উল্লেখই থাকে না। গ্রীক এবং রোমীয়েরা বিশিষ্টরূপেই স্বদেশবৎসল ছিল। স্বদেশবাৎসল্যই তাহাদিগের মুখ্য ধর্ম্ম। তাহারা ঐ সূত্রে আপনাদিগের ইতিহাস মালিকা সমস্ত অতি সুন্দররূপেই গ্রথিত করিয়া গিয়াছে। কিন্তু উহাদিগের এক মাত্র উদ্দেশ্য, স্বদেশের এবং স্বজাতির গৌরব ঘোষণা। দুইটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। (১) গ্রীক গ্রন্থকার লিখিলেন, মারাথনের যুদ্ধক্ষেত্রে দশ সহস্র পরিমিত গ্রীক সৈন্য, তিন লক্ষাধিক পারসীক সৈন্যের পরাভব করিয়াছিল। আমরা বাল্যকালে উহা পাঠ করিলাম, গ্রীক গৌরবে মুগ্ধ হইলাম, এবং ওরূপ ঘটনার কারণও শুনিলাম যে, গ্রীকেরা প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর অধীন থাকাতেই ওরূপ অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত করিতে পারিয়াছিল। বয়স হইলে, পারসীকদিগের বিরচিত ইতিহাসে ঐ ব্যাপারের কিরূপ বর্ণনা আছে, দেখিবার যত্ন করিলাম। কিন্তু "মারাথনের" এবং ঐরূপ অত্যাদ্ভুত যুদ্ধ ব্যাপার সমস্তের, কোন উল্লেখই পাইলাম না। (২) গ্রীক গ্রন্থকার স্পার্টা নগরের ব্যবস্থাপক লাইকর্গসের চরিত্র বর্ণন করিলেন। কি অত্যদ্ভুত চরিত্র! মানুষ কি অমন সাধুশীল এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারে? মানিলাম, গ্রীকেরা সত্য সত্যই দেবপ্রকৃতিক ছিল। পরে জানিলাম, জর্ম্মন ঐতিহাসিকেরা বিচার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, যে লাইকর্গস নামা কোন

ব্যক্তি কখন স্পার্টা নগরে জন্মিয়াছিল কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই! এই রূপে গ্রীক এবং রোমীয় ইতিহাসে বিবৃত ঘটনা সমস্তের সত্যাসত্য বিচার অতি কঠিন ব্যাপার, এবং সর্ব্বতোভাবে সন্দেহসঙ্কুল। তবে একটী কথা মনে রাখিতে হয় যে, যেমন গ্রীকদিগের শিল্পকার্য্য সমূহে মানুষ ভাবের প্রাধান্য, প্রাকৃতিকভাবের অপ্রাধান্য, ইতিহাসেও তদ্রূপ। অসত্য ঘটনা গুলিও ঠিক সত্যের অনুরূপ করিয়া বর্ণিত। সে গুলি প্রাকৃতিক ভাবে রঞ্জিত হইয়া অমানুষরূপ গ্রহণ করে নাই।

নব্য ইউরোপীয় জাতীয়দিগের ইতিহাস গ্রন্থ সকল গ্রীক এবং রোমীয়-দিগের হইতেই অনুকরণ দ্বারা প্রাপ্ত। এই জন্যই উহাদিগের মধ্যে পরস্পর প্রভেদ অল্প। নব্য ইউরোপীয়দিগের ইতিহাস প্রায় সকল গুলিই একই ধরণের। আর উহাঁরা পরস্পরের প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক, এই জন্য উহাঁদিগের ইতিবৃত্তে অসত্য বর্ণনাও কিছু কম হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও ফরাসী, জর্ম্মণ, ইংরাজ প্রভৃতির ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলি ঠিক একই ভাবে লিখিত নহে। চিনীয়দিগের কাল-নিষ্ঠতা, আরবদিগের ঈশ্বর-পরায়ণতা, ইহুদীদিগের ঐহিক-নিষ্ঠতা, ভারতবর্ষীয়দিগের কার্য্যকারণ-প্রবণতা এবং গ্রীকদিগের স্বদেশ-বাৎসল্য, যেমন ঐ ঐ জাতির বিশিষ্ট-ভাব ব্যক্ত করে, কতক পরিমাণে জর্ম্মণদিগের অনুসন্ধিৎসা, ফরাসি-দিগের নিপুণতা এবং ইংরাজদিগের কার্য্যপরতা তত্তজ্জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থ গুলিতেও বিশিষ্টরূপেই প্রকট হয়।

ফলতঃ সকল জাতির কাব্য, ইতিহাস, দর্শন শাস্ত্রাদি তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ জাতীয় লক্ষণ প্রদর্শন করে। অধিকারি-ভেদ ও বর্ণভেদ অপর কোন ধর্ম্মে বা সমাজে স্বীকৃত হয় না, সে জন্য কি আমাদের ধর্ম্ম বা সমাজ নাই বলিবে? সেইরূপ ভারতবাসীদিগের ঐতিহাসিক গ্রন্থ নিচয় গ্রীক বা ইউরোপীয়দিগের ইতিহাসের অনুরূপে রচিত নয় বলিয়া ভারতবাসীর ইতিহাস নাই, একথাও অসঙ্গত। সুতরাং ঐতিহাসিক গ্রন্থ না থাকিলে যে জাতীয় ভাবের অসদ্ভাব বুঝায় সে কথা ভারতবর্ষের পক্ষে খাটে না।

আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুরূপ ইতিহাস আছে। কোন সুবোধ ইউরোপীয় আমাকে বলিয়াছিলেন—"তোমাদিগের গ্রন্থগুলি পৃথিবীর অপর সকল জাতির গ্রন্থ হইতে বিচিত্র—ইহাই তোমাদিগের জাতিত্বের অনপনেয় চিহ্ন—যত দিন রামায়ণ থাকিবে, তত দিন হিন্দুজাতিও থাকিবে।"

জাতীয়ভাব—উহা সম্বর্দ্ধনের পথ।

কর্ম্মে নিষ্কামতাই আমাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ। যাহা কর্ত্তব্য, তাহা কায়মনোবাক্যে করিবে, করায় ফলাফল কি হইবে তাহার প্রতি কোন লক্ষ্য রাখিবে না। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে যে স্বভাব সিদ্ধ জাতীয়ভাব আছে, তাহার অনুশীলন এবং সম্বর্দ্ধন চেষ্টা ভারতবর্ষীয় মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব তাহা করাই বৈধ, না করায় প্রত্যবায় আছে।

কিন্তু নিষ্কামতা যদিও মনুষ্যের অবস্থার উপযোগী এবং শিক্ষণীয় এবং শাস্ত্র-সম্মত, তথাপি সকামতাই মনুষ্যের মনে অত্যন্ত প্রবল। সদুপদেশ এবং সুশিক্ষার বিশেষ বল না পাইলে, আমরা কেহই বিনা উদ্দেশ্যে কোন কাজ করিতে চাই না। যে কাজটী করিব, তাহা সফল হইবে কি না হইবে, তাহা বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখি, এবং ভাবিয়া যদি মনে মনে বুঝিতে পারি যে, কার্য্যটী সফল হইবে, তাহা হইলেই তাহাতে হাত দিয়া থাকি। জাতীয়ভাব সম্বর্দ্ধনের চেষ্টায় আমরা সফল হইতে পারিব কি না, উহার যে সকল ব্যাঘাত এবং অন্তরায় উপস্থিত হইয়া আছে বা হইতে পারিবে, তজ্জন্য বিফল প্রয়াস হইব কি না—এই প্রশ্ন সহজেই উঠে, এবং উহার সদুত্তরপ্রাপ্তি হওয়া আবশ্যক। চেষ্টা বিফল হইবার সম্ভাবনা বোধ হইলেও, আপনাদিগের কর্ত্তব্য অবশ্য নির্ব্বাহ করিয়া যাইতে হইবে বটে—কিন্তু যদি উহা সফল হইবার সম্ভা-

বনা থাকে, তবে ঐ কর্ত্তব্য সম্পাদনে অধিকতর আনন্দ এবং উৎসাহ জন্মিবে, সন্দেহ নাই। অতএব একবার ভাবিয়া দেখা যাউক যে, কাল-ক্রমে ভারতবর্ষে জাতীয়ভাব বিশিষ্টরূপে সম্বদ্ধ এবং দৃঢ়তর ও গাঢ়তর হইতে পারিবে; না উহা এখন যত দূর আছে তাহাই থাকিবে; না আরও শিথিল, দ্রবীভূত এবং উদ্বায়ী হইয়া যাইবে।

ভবিষ্যৎকালে কোন বস্তুর অবস্থা কি হইবে, তাহার অনুমান করিতে হইলে, দেখিতে হয় যে, যাহা আছে, প্রাকৃতিক শক্তিগুলি সেইটীর অনুকূল কি প্রতিকূল। প্রকৃতিই চিরস্থায়ী; সুতরাং উনি যাহার অনুকূলে তাহার স্থায়িত্ব এবং বৃদ্ধি, এবং উনি যাহার প্রতিকূলে তাহারই ক্ষয় এবং বিনাশ। প্রকৃতি-শক্তি ভারতবর্ষীয়দিগের জাতীয়-ভাবের অনুকূলে না প্রতিকূলে? কোন জাতি সম্বন্ধে প্রকৃতির ভাব কিরূপ, তাহা জানিবার উপায় সেই জাতির ইতিবৃত্ত। বিভিন্ন জাতির ঐতিবৃত্তিক ঘটনাবলী, তত্তজ্জাতীয় লোকের প্রতি প্রযুক্ত যাবতীয় প্রকৃতি শক্তিরই ফল। অতএব ভারতবর্ষের অতীত ইতিবৃত্ত হইতেই, ভবিষ্যতে আমা-দিগের জাতীয়ভাবের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা সুব্যক্ত হইতে পারে।

ইতিবৃত্ত বলেন—এই মহাদেশে, বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে, কোলেরীয়, দ্রাবিড়ীয়, তাতারীয় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণসম্ভূক্ত বিভিন্নাকার লোক সকল বাস করিত, উহাদিগের মধ্যে ভাষার ভেদ বহু শতাধিক ছিল, এবং উহাদিগের ধর্ম্মভেদেরও পরিসীমা ছিল না—গোষ্ঠী ভেদে উপাস্যদেবতার ভেদ ছিল।

ইতিবৃত্ত বলেন যে, উল্লিখিত বিভেদ সমুদায়, আর্য্য জাতীয়দিগের সংসর্গ প্রভাবে অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। অনুলোম বিবাহ প্রণালীর বলে উৎকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর সকল জন্মিয়া আর্য্যাবর্ত্তবাসি জনগণের মধ্যে পরস্পর আকার বৈলক্ষণ্য ন্যূন করিয়া দিয়াছে; দাক্ষিণাত্য প্রদেশে যদিও ততটা হয় নাই, কিন্তু সেখানেও অনেক দূর হইয়াছে। পূর্ব্বে যে অসংখ্য ভাষা ভেদ ছিল, তাহাও পরস্পর সম্মিলিত হইয়া এক্ষণে যে

দশটী বা দ্বাদশটী প্রদেশীয় ভাষায় পরিণত হইয়াছে, সেগুলিও সর্ব্বক্ষণ সংস্কৃতের প্রভুত্বে পরস্পর সমীপবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। আর পূর্ব্ব পূজিত বিভিন্ন প্রকৃতিক দেবদেবী সমূহ, আর্য্য শাস্ত্রকৃদ্‌গণ কর্ত্তৃক আধ্যাত্মিক রূপ গুণে সংঘটিত হইয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপে পরিণত হইয়াছে। মৌলিক বর্ণভেদ, এক্ষণে জাতীয় সম্প্রদায়-ভেদ রূপে পরিণত হইয়াছে।

ইতিবৃত্ত বলেন—উপরি উক্তরূপে অযোধ্যা প্রভৃতি প্রাচীন জনপদগুলিতে কতকটাআকারাদির বৈলক্ষণ্য ন্যূন হইয়া গেলে বৌদ্ধেরা অভ্যুত্থিত হইয়া হঠাৎকারে বর্ণভেদের বিলোপ চেষ্টা, কর্ম্মকাণ্ডের দোষোদ্ঘোষণ, এবং জ্ঞান ও উপাসনার গুণ কীর্ত্তন, করেন। ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-সম্রাটদিগের অধীনে একচ্ছত্রপ্রায় হইয়া একবার দেখিয়াছিল, আপনার বীর্য্য এবং প্রভাবশালিতা এবং মহিমা কেমন অপরিমেয়। কিন্তু বৌদ্ধেরা হিন্দুদিগের এবং হিন্দুরা বৌদ্ধদিগের পীড়ন করিতে লাগিল। স্বজাতিবিদ্বেষ যৎপরোনাস্তি প্রবল হইয়া উঠিল। যেটুকু সম্মিলন জন্মিয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইল না।

ইতিবৃত্ত বলেন—শ্রীমৎ শঙ্কর স্বামী কর্ত্তৃক বৌদ্ধনিরসন দ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে, তখনও ভারতবর্ষের তাদৃশ একতা সাধন হইবার কাল উপস্থিত হয় নাই। প্রমাণিত হইল যে, বৌদ্ধেরা এমন কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিল, যাহা মনে উঠিবার বিষয় মাত্র হইয়াছিল, কার্য্যে সম্পাদিত হইবার বিষয় হয় নাই। এই জন্য বৌদ্ধ স্বয়ং হীনতেজ হইয়া বিনষ্ট হইল। কিন্তু শঙ্কর স্বামী বৌদ্ধবাদের মূল কথা যে, কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান এবং তপস্যা প্রধান, তাহার অন্যথা করেন নাই, স্বয়ংই তাহা গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণেতর লোকদিগেরও জ্ঞানমার্গে অধিকার স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ইতিবৃত্ত বলেন—মুসলমানেরা ভারতবর্ষে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া ইহারই কেন্দ্রীভূত ভাষাটিকে সর্ব্বপ্রদেশে প্রচলিত প্রায় করিয়া দিয়া এই মহাদেশের

একতা সাধনের উপায় করিয়াছেন, আর সাম্যধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অন্ত্যজ জাতীয়দিগেরও অপর সকলের সহিত সাদৃশ্য লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা এখনও স্বজাতি-বিদ্বেষ দোষে দূষিত হয়েন নাই, এবং হিন্দুদিগের মধ্যে যে পানদোষ ছিল না, মুসলমানেরা সে দোষ বিন্দু মাত্রও বৰ্দ্ধিত করেন নাই। ঐ সকল বিষয়ে এবং স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি একান্ত সহানুভূতি সম্বন্ধে উঁহারা হিন্দুদিগের আদর্শ হইয়া আছেন।

ইতিবৃত্ত বলেন—বিশেষ অনুধাবন পূর্ব্বক দৃষ্টি করিলে, ইহাও একটী সুলক্ষণ যে, ইউরোপীয় অপর কোন জাতীয় লোকের হস্তগত না হইয়া ভারতবর্ষ ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের একতা প্রাপ্তির পূর্ব্ব পূর্ব্ব বেগ বর্দ্ধিত হইয়াছে বই ন্যূন হয় নাই। শুদ্ধ রাজা এক হইয়াছে বলিয়া নয়—দেশময় শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া নয়—সর্ব্বস্থান আয়সশৃঙ্খল স্বরূপ লৌহবর্ত্ম যোগে পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও নয়—ইংরাজ ভারতবাসী সকলকেই নির্ব্বিশেষে সমান পরিমাণে দূরস্থ করিয়া রাখেন, সুতরাং সকলেই আপনা আপনি সংযত হইবে, তাহা বলিয়াও নয়,—ইংরাজ রাজনীতি বিষয়ে, পৃথিবীর অপর সকল জাতির আদর্শস্থলীয়, ইংরাজ শুদ্ধ বিচারমার্গ অবলম্বন করিয়া যাহা ভাল বা উচিত, তাহা করেন না, প্রকৃত যোগ্যতার প্রমাণ না পাইলে কাহার বন্ধন অল্প পরিমাণেও শিথিল করিয়া দেন না, আবার যোগ্যতার প্রমাণ পাইলেই দেন—সুতরাং ইংরাজের সংসর্গে রাজনীতি শিক্ষার উপায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সমাজের বল পোষিত এবং সুসম্বর্দ্ধিত না হইতে হইতে ইংরাজাধিকারে কোন অসামরিক চেষ্টারও সাফল্য সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের এই অতি প্রধান প্রধান ঘটনাগুলির সমালোচনায় দেখা গেল যে, প্রাকৃতিক শক্তির সমবায়েই এই মহাদেশটী যেন একটী স্থির লক্ষ্যের প্রতি অল্পে অল্পে সরিয়া আসিতেছে, মধ্যে মধ্যে একটু আধটু বাঁকিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু নদীও সাগর-সঙ্গমে যাইতে, বাঁকিয়া

ঘুরিয়া যায়--গাছও আকাশ-মুখে উঠিতে, মোড় খাইয়া খাইয়া উঠে—ছেলেরাও বাড়িবার সময়, একবার মোটায় একবার রোগায়—সমস্ত প্রাকৃতিক কার্য্যের গতিই ঐরূপ।

বস্তুতঃ ভারতবর্ষে সম্মিলন-প্রবণতা এবং বিচ্ছেদ-প্রবণতা উভয় শক্তিরই কার্য্য হইয়া আসিতেছে—এবং তন্মধ্যে সম্মিলন প্রবণতাই ক্রমশঃ বর্দ্ধিত বল হইতেছে। ইতিহাস হইতে ইহাও দেখা যায় যে হিন্দুদিগের মধ্যে স্বজাতি-বিদ্বেষ-দোষটী অতি প্রবল, এবং ঐ দোষেই ইহাদিগের বিচ্ছেদ-প্রবণতা এবং পরাধীনতা জন্মিয়াছে। ইংরাজের দৃঢ়-মুষ্টির ভিতরে পড়িয়া অবধি আর বিচ্ছেদ-প্রবণতা তাদৃশ প্রকট হইতে পারে নাই বটে, কিন্তু স্বজাতিবিদ্বেষের ভূরি ভূরি লক্ষণ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ সমুদায় ভারতবর্ষকে এক শাসনাধীনে রাখিয়াছেন, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে যে সকল ভেদের কারণ আছে, তাহা মিটাইয়া দিবার জন্য তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেছেন না। প্রদেশীয় ভাষাগুলির অবান্তর ভেদ রাখিবার জন্য, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ঈর্ষ্যা প্রজ্বালিত করিবার জন্য, হিন্দু সমাজের অন্তর মধ্যে বিদ্বেষ প্রবিষ্ট করিবার জন্য, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরুদ্ধ স্বার্থ জন্মাইবার জন্য, দলাদলির রাজনৈতিক সূত্রে পরিসিক্ত হৃদয় কোন কোন ইংরাজকে মধ্যে মধ্যে বিলক্ষণ যত্নশীল বলিয়াই বোধ হয়। অতএব যেমন ইংরাজ থাকাতেই এক পক্ষে সম্মিলন প্রবণতার বৃদ্ধি হইতেছে, আবার পক্ষান্তরে, তাঁহার কোন কোন কার্য্যের ফলে ঐ বিচ্ছেদ-প্রবণতার বীজ গুলিতে কিছু কিছু বারি সিঞ্চন হইতেছে। অতএব প্রাচীন ইতিবৃত্ত এবং বর্ত্তমান ইংরাজের কার্য্য উভয়ই আমাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে—যথা,

(১) জাতীয়ভাব সংসাধনার্থ হিন্দু-সমাজকে আত্ম-প্রকৃতি বুঝিয়া চলিতে হইবে।

(২) ভারতবর্ষের একতাসাধন ইংরাজের অধীনতাতেই সম্ভব; অতএব ইংরাজের প্রতি সম্যক বন্ধুবুদ্ধি এবং রাজভক্তি করিতে হইবে।

(৩) ইংরাজের স্থানে আত্মসমাজের প্রতি উপচিকীর্ষা তাঁহাদের বাহ্য দলাদলির ভাব পরিবর্জ্জিত করিয়া শিখিতে হইবে। আপনাদিগকে ইংরাজ সমাজের অন্তর্ভুক্ত মনে করিয়া তাঁহাদের দলাদলিতে মিলিতে হইবে না এবং তাঁহাদের মুখাপেক্ষিতা যতদূর সম্ভব পরিহার পূর্ব্বক কর্ত্তব্যের অবধারণ করিতে হইবে।

(৪) হিন্দুকে সর্ব্বতোভাবে স্বজাতিবিদ্বেষরূপ মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। স্বজাতীয় সহানুভূতিকেই পরম ধন জ্ঞান করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সামাজিক প্রকৃতি—হিন্দু সমাজ।

ভারতবর্ষ মহাদেশে যে জাতীয় ভাবটী আর্য্য সমাগম কাল হইতে প্রতিষ্ঠিত এবং অঙ্কুরিত হইয়া মুসলমান প্রবেশে অসঙ্কুচিত, প্রত্যুত প্রবলীকৃত হইয়াছে এবং ইতিহাসাদিতে যাহার মহীয়সী ছায়া দৃষ্ট হইয়াছে, সেই কল্পবৃক্ষের সুমহৎ কাণ্ড হিন্দু সমাজ।

এই সমাজ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে অতি প্রধান বলিয়াই গণ্য। ভূমণ্ডলস্থ সমগ্র মনুষ্য সংখ্যা যত, এক হিন্দু সমাজেই তাহার অষ্টমাংশ; আর যদি ধর্ম্ম প্রণালীর এবং নীতি শাস্ত্রের সাদৃশ্য লইয়া গণনা করা যায়, তবে স্থূলতঃ হিন্দুপ্রকৃতির এবং মূলতঃ হিন্দুধর্ম্মের লোক, পৃথিবীর সমস্ত জনসংখ্যার দশ আনারও অধিক হইয়া উঠে; সমস্ত ইউরোপীয় জনগণের সমষ্টি চারি আনার বেশী হইবে না। কিন্তু বাহিরের কথা ছাড়িয়া দিয়া, এই ভারতভূমির অন্তর্নিবিষ্ট হিন্দু সমাজ কিরূপ বস্তু, তাহাই একটু অভিনিবেশ-পূর্ব্বক বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

সমাজমাত্রেই অতি গুরুতর বস্তু। বৌদ্ধেরা সমাজকেই 'সংঘ' বলিয়া এবং কোমটিষ্টরা 'হিউমানিটী' বলিয়া অতি পূজনীয় পদার্থই বিবেচনা করেন। যুক্তি এবং শাস্ত্রমতেও সমাজ, শাসনে পিতা, পোষণে মাতা, শিক্ষায় গুরু, দুঃখে সহোদর, সুখে মিত্র। সমাজ, প্রীতি, ভক্তি, সম্মান ও গৌরবের আস্পদ। বিশেষতঃ হিন্দু সমাজটী অতি গৌরবেরই বস্তু। ইহার প্রাচীনত্ব অসীম, ইহার বন্ধনপ্রণালী অনন্যসাধারণ, ইহার আদর্শ অতি পবিত্র, এবং ইহার আভ্যন্তরিক বল এত অধিক যে, পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত কোন সমাজ জন্মে নাই, যাহা ইহার সহিত তুলিত হইতে পারে। সেই প্রাচীন মিশরীয়, আসিরীয়, পারসীক, গ্রীক এবং রোমীয় সমাজ সকল কোথায় চলিয়া গিয়াছে? কিন্তু হিন্দু সমাজ এখনও অটুট এবং অটল। ইহার অন্তরে কোন অতি উচ্চতম সনাতন তথ্য না থাকিলে ইহা কি এত দিন স্থায়ী হইত?

কিন্তু সমাজ যেমনই হউক, মানুষ, সমাজ গঠন করিতে পারিয়াই মানুষ হইয়াছে; সমাজ-সম্ভূক্ত না থাকিলে, বন্য পশু হইত। যিনি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া তথায় পালিত হইয়াছেন, তাহার শরীর যেমন সে দেশের জল বায়ুর গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি যে ব্যক্তি যে সমাজে জন্মিয়া তন্মধ্যে পালিত হয়েন, তাঁহার মনের গঠনও সেই সমাজের প্রকৃতি গ্রহণ করে। সকল সমাজের প্রকৃতি একরূপ হয় না। যেমন প্রতি ব্যক্তির একটী বিলক্ষণতা আছে, তেমনি প্রতি সমাজেরও এক একটি বিশেষ লক্ষণ আছে, এবং তদন্তর্গত লোক সকল বিশিষ্ট রূপেই তল্লক্ষণাক্রান্ত হয়। কোন সমাজের লোক শ্রমশীল এবং কার্য্য-নিপুণ। কোন সমাজের লোক দানশীল এবং আড়ম্বর-পরায়ণ। সকল প্রকার লোকই সকল সমাজে থাকে, কিন্তু সমান পরিমাণে থাকে না; আর যে সমাজের যেটী মূল-প্রকৃতি তাহা প্রায়ই সমাজান্তর্গত সকল লোককে কিছু না কিছু রঞ্জিত করিয়া রাখে। এই জন্য সমাজতত্ত্বা-নুসন্ধায়ীদিগের কর্ত্তব্য কোন্ সমাজের মূল-প্রকৃতি কি, তাহা নিরূপণ

করিবার যত্ন করেন। কোন সমাজের মূল-প্রকৃতি অবধারিত হইলে, ঐ সমাজস্থ জনগণের বুদ্ধিবৃত্তি কোন্ মুখে যায়, এবং উহাদিগের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি কি প্রকার জীবনযাত্রার আদর্শ গ্রহণ করে, তাহা বিশিষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যায়, এবং তাহা বুঝিতে পারিলেই কোন্ সমাজ কোন্ মুখে চলিলেই ভাল চলিতে পারিবে, তাহা নির্ণীত হইতে পারে।

হিন্দু সমাজের মূল-প্রকৃতি কি? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানের চেষ্টা বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক করাই আবশ্যক। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, হিন্দু সমাজ বহুকালাবধি পরজাতীয় লোকের অধীন হইয়া রহিয়াছে; এক্ষণে ইংরাজের, তাহার পূর্ব্বে মুসলমানের অধীন ছিল। ইংরাজের অধীন কিরূপে হইয়াছে, তাহার বিশেষজ্ঞ একজন সূক্ষ্মদর্শী ইতিহাস-বেত্তা বলেন যে, ইংরাজেরা অস্ত্রবলে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, এটী মিথ্যা কথা; ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগকে আপনারাই জয় করিয়া ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, ইহাই সত্য কথা। মুসলমানদিগের বিজয় ঠিক ওরূপ ব্যাপার নহে। উহারা আপনারাই অস্ত্রবলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাগ সকল ক্রমে ক্রমে জয় করিয়াছিল। কিন্তু তাহাও যে পারিয়াছিল, তাহার মুখ্য কারণ এই যে, ভারতবর্ষীয়রা অন্তর্ব্বিবাদে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল, এবং যুদ্ধ কার্য্যটীকে আপনাদিগের সম্প্রদায় বিশেষের কার্য্য বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। যখন ওরূপ করে নাই, অর্থাৎ যখন যুদ্ধ করা প্রজা সাধারণের কার্য্য বলিয়া মনে করিয়াছিল, তখনই মুসলমানেরা পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছিল। শিবজীই মহারাষ্ট্র দেশে ঐ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার অতি বিশ্বস্ত পারিষদ, যিনি সিংহগড় বিজেতা বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, সেই টানাজী মালশ্রীকে বিজয়পুর রাজ সেনাপতি একদা জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদিগের সৈন্য কোথায়? মালশ্রী, লাঙ্গলবাহী কৃষকদিগকে দেখাইয়া বলেন, ইহারাই আমাদিগের সৈন্য। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের কৃষিজীবী এবং কারুকার্য্য ব্যবসায়ী সাধারণ প্রজাব্যূহ কখনই সংগ্রাম কার্য্যে ব্যাপৃত হইত না

এবং সেই জন্যই ভারতবর্ষে রাজ্য জয় করা অপরের পক্ষে অনায়াস সাধ্য হইত। প্রসিদ্ধ আছে যে, স্বজাতীয়ের মধ্যেই হউক, আর বিদেশীয়দিগের সহিতই হউক, যখন ভারতবর্ষের মধ্যে ঘোর সমরানল প্রজ্জ্বলিত, তখনও কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্য অবাধে সম্পাদিত হইতে থাকিত। যে সমাজ অন্তঃশাসনে শাসিত, সুতরাং ভাবিতে পারে যে, রাজ-শক্তি এক হাত হইতে অন্য হাতে গেলেই সমাজের ব্যাঘাত হয় না, সেই সমাজেই সংগ্রামকার্য্যটী সম্প্রদায় বিশেষের কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। আর ইহাও বলা যায় যে, যথায় সংগ্রামকার্য্যটী সম্প্রদায় বিশেষের হস্তে ন্যস্ত হইয়া থাকে, তথায় জনসাধারণের মধ্যে শান্তিপ্রবণতা জন্মে। ইউরোপীয় ইতিহাসেও দেখা যায় যে, যখন ঐ খণ্ডের বিভিন্ন দেশীয় সমাজ সকল দৃঢ় সম্বদ্ধ হইয়া উঠিল, তখনই যুদ্ধকার্য্যটী একটী ব্যবসায় বিশেষের ন্যায় হইল; তবে ইউরোপে ভৃতিভুক সেনাদল জন্মিয়াছিল, ভারতবর্ষে সেরূপ অস্ত্রপিশাচিকা কখন জন্মে নাই, সমাজ-বন্ধনের গুণে পূর্ব্বাবধিই এখানে বীরধর্ম্মা ক্ষত্রিয় জাতীয়েরা যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ফলতঃ হিন্দু সমাজের এই লক্ষণ প্রতিপন্ন হয় যে, ইহা অন্তঃশাসনে শাসিত এবং শান্তি-প্রবণ। সমাজের এই অন্তঃশাসন এবং শান্তি-প্রবণতা গুণেই অত্যল্প সংখ্যক ইংরাজ ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপন করিয়াছেন এবং এই রাজ্য আপনাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষীয়েরা সিপাহি হইয়াছিল বলিয়াই ইংরাজের জয় হয় নাই—হিন্দু-সমাজ-বন্ধনের অবশ্যম্ভাবী ফল যে, অন্তঃশাসনশীলতা এবং শান্তপ্রকৃতিকতা, তজ্জন্যই ওরূপ হইয়াছিল। সে দিন গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব জাঁক করিয়া বলিলেন, ভারতবর্ষের মধ্যে এক একটী ইংরাজ এক একটী বৃহৎ রাজ্য শাসন করিতেছেন, অতএব ইংরাজ রাজপুরুষদিগের বেতন অধিক এ কথা মনে করিতে নাই। ইংরাজ নিজের গুণ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পান না—হিন্দুসমাজ-বন্ধনের গুণেই যে দেশে শান্তি রহিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইলেন না,

আপনার মহিমাই দেখিলেন। এই স্থলে যদি কেহ এমন কথা বলেন যে, যে সমাজবন্ধনে এমন সর্ব্বদেশে শান্তপ্রকৃতিকতা জন্মে, সে সমাজবন্ধন ভালনয়। তাঁহাকে দুইটী কথা বলিব। এখানে কোন্ সমাজ ভাল কে মন্দ, তাঁহার বিচার হইতেছেনা। আর কোন সমাজ অন্যকর্ত্তৃক বিজিত হইলেই যে, তাহাকে অপকৃষ্ট বলিতে হয়, তাহাও নয়। মূর্খ স্পার্টিয়েরা পণ্ডিত এথিনীয়দিগকে জয় করিয়াছিল—অসভ্য মাকিডোনিয়েরা গ্রীকদিগকে অধীন করিয়াছিল—বন্য তাতারীয়েরাও সুসভ্য চীনীয়দিগকে পরাজয় করিয়াছিল—অসভ্য বর্ব্বর জাতীয়েরা রোম সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়াছিল—পাণ্ডপাল্যোপজীবী আহমেরা সুসমৃদ্ধ আসামদেশ অধিকার করিয়াছিল। যে যুদ্ধে হারে, সেই হীন, এটা গোঁয়ারের কথা—বিচক্ষণ লোকের কথা নয়। হিন্দুরা তাঁহাদের ভালর জন্যই হউক আর মন্দের জন্যই হউক, গুণের জন্যই হউক, আর দোষের জন্যই হউক, অতিশয় শান্তপ্রকৃতিক। দেখ, দুর্ভিক্ষ পীড়ায় পীড়িত হইয়াও ইহাঁরা কখন রাজদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়েন না। অন্য দেশে ইহার শতাংশ হইলেও চুরি ডাকাইতি এখানে যত বাড়ে তাহার শতগুণ বাড়িয়া যায়, বড় মানুষের গৃহাদি ভগ্ন করা হয় এবং অতি ভয়ানক রাজদ্রোহ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। এখানে কোন উচ্চবাচ্য হয় না বলিলেই চলে। লোক সকল না খাইতে পাইয়া মরিয়া যায়—রাজার দোষ দেয় না—কাহারও দোষ দেয় না, আপনাদের কর্ম্মফল বলিয়া সকল দুঃখই সহ্য করে।

অন্য সমাজের লোকের কাছে তাহাদিগের ধর্ম্মের বা ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের নিন্দা করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ মারিতে উদ্যত হয়। এই সে দিন, একটী গ্রন্থকার, পয়গম্বর মহম্মদের তাদৃশ গুণানুকীর্ত্তন করেন নাই বলিয়া বোম্বাই নগরের মুসলমানেরা একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া ফেলিল, আর বাঙ্গালী মুসলমানেরা ঐ প্রকার একটা কথা লইয়া কতই বকাবকি করিলেন। মিসরে, অষ্ট্রীয়াতে, ইটালীতে, আয়র্লণ্ডে ঐরূপ ধর্ম্মবিদ্বেষজনিত কতই ঝকড়া ঝাঁটির কথা সর্ব্বদাই শুনা যায়।

কিন্তু হিন্দু সমাজের বুকে বসিয়া কত লোকে কত দেবতার নিন্দা, শাস্ত্রের নিন্দা এবং কত প্রকারে হিন্দু সমাজের প্রতি ঘৃণা এবং বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছে এবং করিতেছে—হিন্দুরা কিছুই বলেন না। পরকালের উপর নির্ভর করিয়া দুর্ব্বৃত্তদিগের কথায় এবং আচারে দৃক্‌পাতও করেন না। ইউরোপীয় সমাজের লোকেরা সহিষ্ণুপ্রকৃতিক নয়, এই জন্য ইংরাজেরা হিন্দুদিগের সহনশীলতার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারেন না; আর দেশীয় ইংরাজি শিক্ষিত লোকেরাও কতকটা ইংরাজদিগের অবস্থাপন্ন, তাঁহারা ইউরোপীয় সমাজগুলিরই কিছু কিছু বিবরণ জানেন, আর কিছুই জানেন না; সুতরাং স্বদেশীয়দিগের সহনশীলতা কেমন ধর্ম্মনিষ্ঠতার চিহ্ন, তাহা বুঝিতেই পারেন না। উহা বলহীনতার লক্ষণ মনে করেন।

ভারতবাসী অতি দরিদ্র। ইহাদিগের মধ্যে চারি পাঁচ কোটী লোক একাশনে দিন যাপন করিতেছে। কিন্তু তাহা কেহ জানিতেও পারে না—দৌরাত্ম্য নাই—কাতরোক্তি নাই—আপনাপন কর্ত্তব্য পালনে যথাশক্তি ত্রুটিও নাই। অন্য কোন সমাজে এত দুঃখ যন্ত্রণা এমন নিঃশব্দে সহ্য হইতে পারে না। অন্য কোন সমাজে, এতটা দুঃখসত্বে, এত দানশীলতাও থাকিতে পারে না। ইংরাজ রাজপুরুষেরা দেশের এই দুরবস্থা কিছুই না বুঝিয়া এবং নিতান্ত মমতা শূন্য হইয়া আতসবাজী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রভৃতি তামসিক ব্যাপারে এতদ্দেশীয় ধনবান লোকদিগের দান কার্য্যের মুখ ফিরাইয়া দিতেছেন। কিন্তু আজি কালি যেন ঐ বিষয়ে লোকের দৃষ্টি একটু খুলিতেছে। এখন অবধি প্রকাশ্য সভায় চাঁদা তুলিয়া যে সকল দান কার্য্য চলিবে, তাহার সমস্তই ইংরাজ রাজপুরুষের সন্তোষ সাধনার্থেই ব্যয় হইবে না—যেন কতকটা দেশের লোকের উপকারেও লাগিবে। "জুবিলী" উপলক্ষে যে দান হইল, তাহার অনেকটা শিল্পশিক্ষালয়ের নিমিত্তও হইয়াছে। কলিকাতায় রাজপৌত্রের শুভাগমন উপলক্ষে যে চাঁদা উঠিয়াছে তাহার কতক টাকা কোন স্থায়ী হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবার কথা উঠিয়াছিল।

হিন্দুশাস্ত্রে, ব্রাহ্মণের আচার বিশিষ্টরূপে নিবদ্ধ আছে। সেই আচারে পবিত্রতা, ধর্ম্মভীরুতা, আত্মসংযম, ক্ষমা, দয়া, ধৈর্য্য প্রভৃতি শান্তিময় ঋষিচর্য্যা শিক্ষিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ জাতিই হিন্দু সমাজের আদর্শ। ব্রাহ্মণেরা এই সমাজে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং চিরকাল ইহার অনুঃশাসন করিয়া আসিতেছেন। হিন্দু-সমাজের প্রকৃতি শান্তি। ব্রাহ্মণেরা হিন্দু সমাজকে শান্তির দিকে লওয়াইয়া ইহাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মভীরু এবং শান্তিশীল সমাজ করিয়া তুলিয়াছেন। এক জন বহুদর্শী ইংরাজের সহিত এই বিষয়ে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন "যদি ছোট লোক হইয়া জন্মিতে হয় তবে ভারতবর্ষের ছোট লোক হওয়াই ভাল; অপর সকল সমাজের ছোট লোকেরা পশুভাবাপন্ন, তাহাদিগের সহিত তুলনায় ইহারা দিব্য ভাবাপন্ন।" * * "কিন্তু ভারতবাসীর সুখ কৈ?" * * * "সত্য সত্যই জগতে সুখের পরিমাণ অধিক নয়—আর মানুষের সুখ, বাহ্য বিষয় লইয়া অধিক, না আন্তরিক ভাবের অবস্থা লইয়া অধিক? ঐ তাড়িখানায় তাড়ি খাইয়া যাহারা গোলমাল করিতেছে, তুমি কি তাহাদিগকে বিশেষ সুখভাগী মনে কর? কিন্তু উহারাও ইউরোপীয় ছোট লোকদিগের অপেক্ষা অল্প দুর্ব্বৃত্ত—সুতরাং অল্প দুঃখভাগী।"

সামাজিক প্রকৃতি—হিন্দু এবং অপরাপর সমাজ।

কোন্ সমাজের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা সেই সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট কতকগুলি লোককে ভাল করিয়া দেখিলেই এক প্রকার মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়। সমাজের মূল-প্রকৃতি এমনই প্রবল বস্তু যে, উহা বহির্ভাগেও উঠে। কিন্তু উহা ভিতরেই গাঢ়তর রূপে দৃষ্ট হয়। হিন্দু সমাজের মূল-প্রকৃতি যে অন্তঃশাসন এবং শান্তি, তাহা হিন্দুদিগের ভূতপূর্ব্ব এবং বর্ত্তমান অবস্থাতে যেমন দেখা যায়, ঐ সমাজের নিয়ামক শাস্ত্র সমূহের মূল বিচার প্রণালীতে তাহা স্পষ্টতর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মানুষ এই বাহ্য জগতের এবং তাহার নিজের অন্তর্জগতের সম্বন্ধে মনে মনে যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকিতে পারে না, সেই সকল প্রশ্নের উত্তরসম্বলিত গ্রন্থের নাম ধর্ম্মশাস্ত্র। বিভিন্ন দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র বিভিন্ন। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেশে উল্লিখিত মানস প্রশ্ন সকলের ভিন্ন ভিন্ন রূপে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। একটী মানস প্রশ্ন এই—"জগতে এত বৈষম্য কেন? মানুষে মানুষেই বা এত বৈষম্য কেন?" কার্য্যকারণ সম্বন্ধের অনুশীলনতৎপর আর্য্য ঋষিগণ বলিলেন—কাল ত্রিধা বিভাজিত; অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ; বর্ত্তমানে যাহা দেখা যায়, তাহা অতীতে যাহা হইয়া গিয়াছে তাহারই ফল, আর বর্ত্তমানে যাহা হইতেছে, ভবিষ্যৎ তাহারই ফল প্রসব করিবে। এটী আমগাছ এবং ওটী তেঁতুল গাছ কেন, জিজ্ঞাসা করিতেছ? এটী আমের আঁটি হইতে হইয়াছে, তাই আমগাছ, আর ওটী তেঁতুলের বীজ হইতে হইয়াছে, তাই তেঁতুল গাছ। মানুষের মধ্যে যে বৈষম্য উপলব্ধ হয়, তাহার প্রতিও ঐরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধের নির্দ্দেশ কর, দেখিতে পাইবে যে, পূর্ব্বগত ঔৎপত্তিক কারণ সমূহের ভেদবশতঃই কোন মানুষ এক প্রকার, কেহ অপর প্রকার। এই পূর্ব্বগত কারণ সমূহের নাম "প্রাক্তন।" ভবিষ্যৎ কাল সম্বন্ধেও ঐ বিচার-প্রণালী চলিল, এবং সেটীর নামান্তর হইল "পরকাল।"

এই ভিত্তিমূলের উপর হিন্দুদিগের নীতি শাস্ত্র সংস্থাপিত। সেই শাস্ত্র শিখাইলেন যে, বর্ত্তমানে প্রাক্তনের ফলভোগ এবং পরকালে বর্ত্তমানের ফলভোগ হয়। এই শিক্ষা পল্লবিত হইয়া সমাজস্থিত জনসমূহকে একটী সান্ত্বনার, এবং একটী উত্তেজনার বাক্য বলিল—প্রাক্তনের সুকৃত থাকে, বর্ত্তমানে ভাল থাকিবে, দুষ্কৃত থাকে ভাল থাকিতে পারিবে না; আর বর্ত্তমানে সুকৃত করিতে পার, পরকালে ভাল থাকিবে, সুকৃত না করিতে পার, ভাল থাকিবে না। এখন দেখ, প্রাক্তনবাদী হিন্দুর পক্ষে কোথাও অসন্তোষের কারণ রহিল না। তাঁহার প্রাক্তন বাদ তাঁহাকে শান্ত করিল;

কারণ নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগে অসন্তোষ প্রকাশ করিলে চলিবে কেন? আর পরকাল ইহকালের আয়ত্ত হওয়াতে চেষ্টাশক্তিরও যথোচিত উত্তেজনা হইল। এইরূপে কার্য্যকারণশৃঙ্খলানিবদ্ধ হিন্দুর নীতিশাস্ত্র সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইল। ইহাতে ধৈর্য্য, ক্ষমা, নিরহঙ্কারতা, উদ্যোগ সকলেরই স্থান হওয়াতে এবং কার্য্যকারণ চিন্তার দিকে মনের প্রবণতা হওয়াতে, বিদ্বেষাদিভাব বিনষ্ট হইয়া সন্তোষ ও শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

বৌদ্ধ শাস্ত্র হিন্দু শাস্ত্রেরই সন্তান। ঐ শাস্ত্রেও কার্য্যকারণশৃঙ্খলার বিচার, হিন্দুশাস্ত্রের বিচারের ন্যায়—অতি দৃঢ়-সম্বন্ধ। তবে বৌদ্ধেরা নিকৃষ্টাধিকারীর অর্থাৎ মোগলাদি বর্ণসম্ভূক্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীস্থদিগের উপযোগী করিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্রেরই বিচার প্রণালীকে আধ্যাত্মিক অংশে সংকুচিত করিয়া বলিল, যে কার্য্য দেখিলেই, অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল না পরে হইয়াছে, ইহা দেখিলেই তাহার কারণের অনুমান করা আবশ্যক, নচেৎ যাহা আছে, তাহা পূর্ব্বেও ছিল এবং পরেও থাকিবে, এইরূপ মনে করাই ভাল। বৌদ্ধেরা কারণের কারণ অনুসন্ধান করিতে যান না, আবার জাগতিক কার্য্যে আত্মত্বারোপপূর্ব্বক এক অচিন্ত্যানন্তমহাশক্তির অনুভব করেন না। উহাঁরা যদি কোথাও একত্ব দেখেন, তাহা আকাশে। উহাঁরা জগতে যত কার্য্য দেখেন তাহাতে রূপান্তরতা মাত্র দেখেন, এবং তাহা দ্রব্যশক্তি হইতেই হয়, বলেন; বৌদ্ধেরা জগতের সাদিত্ববাদ পরিহার করেন। ফলতঃ আর্য্যজাতীয় হিন্দুর হৃদয়ে বিচার-শক্তি এবং কল্পনাশক্তি এই উভয়ের যে সামঞ্জস্য আছে, মোগল জাতীয় লোকদিগের হৃদয়ে সেই সামঞ্জস্যের অভাব। উহাদিগের চিন্তাশক্তি যেমন দ্রব্যনিষ্ঠ তেমন ভাবনিষ্ঠ নয়। এই জন্যই হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উহাদিগের পরিগৃহীত ধর্ম্মশাস্ত্র কিছু ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া আছে। উহাঁদিগের নীতিশাস্ত্রও প্রাক্তনবাদ স্বীকারবশতঃ হিন্দু নীতিশাস্ত্রের ন্যায় শান্তিপ্রদ। কিন্তু দ্রব্যশক্তি হইতেই কার্য্য হয়, মানুষও দ্রব্য, অতএব বৌদ্ধশাস্ত্রে মানুষ শক্তির

ইহলৌকিক যাবৎ বৈষম্যের কারণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরেচ্ছা—এরূপ মতবাদের সূক্ষ্ম এবং গূঢ় তাৎপর্য্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিরা যাহাই বুঝুন, কিন্তু সাধারণ অবিদ্য, অবুদ্ধি, অল্পস্বভাব লোকের মনে উহা অবশ্যই স্বৈরাচারের প্রবর্ত্তক এবং পরিবর্দ্ধক হইবে, সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ সাধারণ ইউরোপীয় লোকের মনে স্বৈরাচারপ্রবৃত্তি অত্যন্ত বলীয়সী। উহাদিগের মত অনিষ্টাচার, দুর্দ্দান্ত, অবিমৃশ্যকারী, স্বার্থপরায়ণ লোক পৃথিবীর আর কোন সমাজে নাই। উহারা স্ব স্ব দেশেই ত বিবাদ, বিসম্বাদ, দাঙ্গা হাঙ্গামা, নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা সন্তানহত্যা করিয়া থাকে—ইউরোপীয়েতর জাতির প্রতি উহাদের ব্যবহার নিষ্ঠুরতা এবং শঠতায় পরিপূর্ণ—অন্যের পীড়ন এবং ধর্ষণ করায় উহাদিগের অন্তরাত্মা যেন আনন্দাভিষিক্ত হয়। সাধারণ ইউরোপীয়গণ যে ভাবে চলে, তাহা দেখিলেই উহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যে অনেকেই জলদস্যু ছিল, এবং নির্ভীকহৃদয়ে সমুদ্র ভেদ করিয়া আসিয়া রোমীয় সাম্রাজ্যের প্রদেশ গুলিকে লণ্ডভণ্ড করিত, সেই সকল কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি হয়। কর্ম্মফলের অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকৃত না থাকায় খৃষ্টধর্ম্ম উহাদিগের দস্যুভাব দমনে সমর্থ হইতে পারে নাই। সমর্থ না হইবার অপর কারণ উহাদিগের ঔৎপত্তিক ধৃষ্টতাও বটে আর উহাদিগের পরিগৃহীত রোমীয়দিগের ব্যবস্থা-শাস্ত্রের দোষও বটে। অধস্তন রোমীয়দিগের ব্যবস্থাশাস্ত্রে ধনের গৌরব এবং ব্যক্তিগত স্বত্ব বিশিষ্টরূপেই সমর্থিত। নব্য ইউরোপীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ঐ ব্যবস্থাশাস্ত্র গ্রহণ করে, এবং ধনের অত্যধিক গৌরব করিতে শিখে। যাহারা ধর্ম্মশাসনে অশাসিত অথবা অল্পশাসিত, এবং অর্থলোভে আকৃষ্ট তাহাদিগের যে প্রকৃতি হয়, সাধারণ ইউরোপীয়দিগের সেই প্রকৃতিই হইয়া আছে। তাহারা স্বেচ্ছাচার-পরায়ণ এবং আত্মসুখান্বেষী হইয়াছে। উহারা বলপ্রয়োগে এবং প্রাণিবধে অসঙ্কুচিতচিত্ত এবং সুখলালসা তৃপ্তির জন্য অপরিসীম ধনাকাঙ্ক্ষী। উহাদিগের শাস্ত্রের আদেশ, পৃথিবীর সকল লোককে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত কর—কিন্তু উহারা ধনলাভ করিবে বলিয়াই

পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিচরণ করে। পূর্ব্বপুরুষদিগের জলদস্যুতা এখন বাণিজ্য-পরতা দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়াছে মাত্র। ইউরোপীয়দিগের মূল-প্রকৃতি ধৃষ্টতা এবং সুখলালসা।

খৃষ্টধর্ম্ম যে ইহুদিধর্ম্ম হইতে রোম সাম্রাজ্যের পূর্ণ বিস্তৃতির সময়ে জন্মিয়াছিল, মুসলমান ধর্ম্মও সেই ইহুদিধর্ম্ম হইতে রোম সাম্রাজ্যের ভগ্নদশায় জন্মে।—উভয়েই প্রাক্তন বাদ নাই, এবং জগতের আদিত্ব, একেশ্বর বাদ, এবং ইচ্ছা-শক্তির সর্ব্বময়তা স্বীকার আছে। সুতরাং উভয় সমাজই মূলতঃ শান্তিবিহীন এবং স্বেচ্ছাচারনিরত। প্রভেদ এই, মুসলমানেরা রোম সাম্রাজ্যের ব্যবহার শাস্ত্র গ্রহণ করে নাই—আর রোমের বিশিষ্ট ভগ্নদশায় অভ্যুত্থিত হইয়াছিল বলিয়া রোমের উপধর্ম্মমিশ্রিত ভোগসুখপরতাও প্রাপ্ত হয় নাই। উহারা নষ্ট প্রকৃতিক গ্রীক এবং লাটিন পণ্ডিতদিগের সংশয়বাদও কাণে স্থান দেয় নাই। উহারা স্বধর্ম্ম বিস্তার করিবার জন্য যখন আরবদেশ হইতে বাহির হইল, তখন ঐসুযোগে আপনারা লুট পাঠ করিয়া ধনশালী হইবে বলিয়া মনে করে নাই। আজিও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ অনেকানেক মুসলমান কাহাকেও টাকা ধার দিয়া তাহার সুদ খান না। আরবেরা ধর্ম্মবিস্তার করিতেই বাহির হইয়াছিল। তাহারা স্বধর্ম্মে এতই বিশ্বাসবান এবং ভক্তিমান হইয়াছিল যে, মনে করিত তাহাদের বীজমন্ত্র গ্রহণমাত্রে মানুষের সকল পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। এই জন্য যে ব্যক্তি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিত তাহারা অমনি তাহাকে আপনাদিগের সমতুল্য জ্ঞান করিত, তাহাকে আপনাদের সৈনিক দলভুক্ত করিত অথবা রাজকার্য্য প্রদান করিত—কোনরূপে কিছুমাত্র অবিশ্বাস করিত না। স্বধর্ম্মে সুগভীর ভক্তিমূলক এই যে উদারতা, ইহাই মুসলমানদিগের অভূতপূর্ব্বরূপ বিজয়ের প্রকৃত কারণ। উহারা পররাজ্য বিজয় সম্বন্ধে যে কাজ করিয়াছে, আর কোন বিজিগীষু জাতি তেমন অল্পকাল মধ্যে তেমন কাজ করিতে পারে নাই। উহারাত মূর্খতম তুরস্ক জাতিদিগকে আপনাদিগের ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া একেবারে আত্মসাৎ করিয়াছে, আবার সুসভ্য পারসীক, মিসরীয়,

সিরীয় প্রভৃতি খৃষ্টান এবং অখৃষ্টান অনেকানেক জাতিকে তাহাদিগের স্ব স্ব ধর্ম্ম গ্রন্থ এবং আচার পদ্ধতি ছাড়াইয়া আপনাদিগের কোরাণ এবং হদীস ধরাইয়াছে। সাম্যবাদের একটী অতি মনোহর শক্তি আছে। মুসলমান ধর্ম্ম সেই সাম্যবাদবলে বলীয়ান এবং পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানই প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্যধর্ম্মী। ফলতঃ মুসলমান সমাজের মূল প্রকৃতি সমতা।

অতএব দেখা গেল যে—

(১) প্রাক্তন, পুরুষকার এবং পরকাল এই ত্রিশক্তিবাদী হিন্দু শান্তি-পরায়ন, পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশালী এবং অনাসক্তচিত্ত।

(২) ঐরূপ ত্রিশক্তিবাদী কিন্তু দ্রব্যগুণবাদ তৎপর বৌদ্ধজাতীয়েরা শান্ত, পরিশ্রমী, ধৈর্য্যশালী এবং সাধনশীল।

(৩) ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী খৃষ্টধর্ম্মী ইউরোপীয় অশান্ত, স্বৈরাচার, উদ্যমশীল এবং ভোগসুখলিপ্সু।

(৪) ইচ্ছাশক্তি এবং পরকালবাদী মুসলমান অশান্ত, স্বৈরাচার এবং সাম্যধর্ম্মী।

সামাজিক প্রকৃতি—ঐতিহাসিক বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ।

ইউরোপ খণ্ডে বিজ্ঞান চর্চ্চার বড়ই বাহুল্য, এবং বিজ্ঞানচর্চ্চার ফলও ইউরোপীয়েরা বিশিষ্টরূপেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহাতে ফল লাভ হয়, তাহার সমাদরও বেশী। এই জন্য ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃগণ সামাজিক তত্ত্ব বিচারেও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিতে ভাল বাসেন।

কিন্তু বিজ্ঞান বলিলেই বিজ্ঞান হয় না। পূর্ব্বে যেরূপ হওয়াতে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক সূত্রনির্দ্ধারণ ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক বিচার প্রচলৎ হওয়াতে, ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগকে বেকনের স্থানে সমষ্টীকরণ বা সূত্রনির্দ্ধারণ প্রণালী নূতন করিয়া শিখিতে হইয়াছিল, আবার যেন সেইরূপ নূতন

শিক্ষার প্রয়োজন হইয়া উঠিতেছে। কারণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিচার করিতেছি মনে করিয়া অনেকানেক ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তা আপনাদিগের কল্পনাশক্তিকেই বিশেষ করিয়া খাটাইয়া লইতেছেন। বিশেষতঃ এখনকার ইতিবৃত্ত রচনা প্রণালীতে অনেক পরিমাণে ঐ দোষের আশ্রয় হইয়াছে। এক জন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঐতিহাসিক বিভিন্ন জাতীয় লোকের প্রকৃতি বর্ণন করিতে গিয়া তাহাদিগের মৌলিকবর্ণ, ধর্ম্মগ্রন্থ এবং নীতিশাস্ত্রের কোন উল্লেখ করাই আবশ্যক মনে করেন নাই। তাহাদিগের দেশের ভৌগোলিক প্রকৃতি বিচার করিয়াই সেই সেই জাতির স্বভাব এবং দোষ গুণ সমুদায় স্থির করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অমন সকল স্থলে বাস্তবিক করা হয় কি? দেশের ভৌগোলিক অবস্থা জানা আছে, দেশের লোকের প্রকৃতিও, যাহা হউক, একটা মনে করা আছে; কল্পনার বলে ঐ দুইয়ের মধ্যে একটা কার্য্যকারণ ভাব ঘটাইয়া দেওয়া হয় মাত্র। ওরূপ করায় কোন প্রকৃত তথ্যের আবিষ্কার হয় না, কোন কুসংস্কার দূর করা হয় না, অজ্ঞের অজ্ঞতা বৃদ্ধি করা হয়, মানুষের চেষ্টা-শক্তিকে খর্ব্ব করা হয়, এবং সংস্কারের পথ একেবারে রুদ্ধ করা হয়। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—ঐতিহাসিক বলিলেন, স্পেন দেশবাসীয়েরা অতিশয় ঔপধর্ম্মিক। তাহার কারণ, কাথলিক ধর্ম্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব অথবা পূর্ব্বকাল হইতে মুরজাতীয়দিগের সহযোগে কল্পনা-প্রবণতা, কিম্বা বিগত প্রাধান্যের সহিত বর্ত্তমানের পতিত দশার তুলনায় দৈবোপদ্রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, এ সকল কিছুই বলিলেন না। ও গুলি বলিলে, ঐতিহাসিক কার্য্য কারণের অভিব্যক্তি হইত। তিনি বলিলেন, স্পেনে ভূমিকম্পের আতিশয্য এই জন্যই স্পেনের লোকেরা ঔপধর্ম্মিক। কিন্তু জাপানেও স্পেন অপেক্ষা ভূমিকম্প অনেক অধিক, এমন কি গড়ে প্রতিদিন একটী। কিন্তু জাপানীয়েরা ঔপধর্ম্মিক হওয়া দূরে থাকুক, কিছুমাত্র দৈববল স্বীকার করে, বলিয়া বোধ হয় না। এখানে ঐতিহাসিক গ্রন্থকর্ত্তার মনের প্রকৃতকথা কি এই নয়, যে স্পেনীয়েরা ঔপধর্ম্মিক বলিয়া আমি জানি, আর

তাহাদের দেশে যে ভূকম্প হয়, তাহাও জানি, আমি ঐ দুয়েতে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ স্থির করিয়া দিব।

এ প্রণালীর ইতিবৃত্ত রচনা অতি অকিঞ্চিৎকর। যদি ওরূপে বিচার না করিয়া পৃথিবীর যে যে দেশে অধিক ভূকম্প হয়, তাহা জানিতে পারিতেন, এবং সেই সেই দেশবাসী সকল লোকের স্বভাব জানিতেন, এবং সেই সেই স্বভাবে কোনও একটী বিষয়ে মিল দেখিতেন, এবং তাহা দেখিয়া ভূকম্পনের আধিক্য তাদৃশ স্বভাবের কারণ হইতে পারে কি না চিন্তা করিতেন, তাহা হইলে কতকটা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিচার হইল বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারিত। ফল কথা, এখনও ঐতিহাসিক বস্তুজ্ঞান অনেক বাড়াইবার প্রয়োজন আছে। যখন তাদৃশ বস্তুজ্ঞান জন্মিবে, তখন কোন একটী জিলায় একটী পাহাড় থাকাতে বা একটী বালুকাময় নদী থাকাতে, সেখানকার লোকের মতিগতির কি বিশিষ্টতা জন্মিয়াছে, তাহাও অনুমান করা যাইতে পারিবে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বিজ্ঞান এখন ঐ অবস্থার স্বপ্ন দেখিতেছে মাত্র।

ভারতবর্ষের শিরোদেশে, হিমগৌর উচ্চ উষ্ণীষের ন্যায় হিমালয় শিখর—ইহাঁর বক্ষে ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র সদৃশ শুভ্র সলিলা স্বর্ণদী—ইহাঁর পদতল সমুদ্রের দুইটী বাহু-প্রসৃত বারিধারা দ্বারা প্রক্ষালিত—এই মহাদেশে বাস নিবন্ধন হিন্দু জাতীয়দিগের মহিমা যে উচ্চ এবং উদার হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ বলা যায়। ইহাঁদিগের ধীশক্তি অনন্তচারিণী—ইহাঁদিগের চিত্তভূমি অতীব পবিত্র—ইহাঁদিগের ধর্ম্মভাব সুপ্রশস্ত এবং ইহাঁদিগের নীতি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন—কিন্তু এইরূপ সাধারণ মাহাত্ম্য উপলব্ধি হইলেও এই মহাদেশের এবং এই মহিমশালী সমাজের মধ্যে প্রত্যেক সামাজিক নিয়মাদির সম্বন্ধে ভৌগোলিক কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ নিরতিশয় গবেষণা ব্যতিরেকে করিতে যাওয়া কি বৈজ্ঞানিক যুক্তিসঙ্গত? তাহা নয়।

কিন্তু নব্য ঐতিহাসিক-বিজ্ঞানের যে সকল সূত্র ভারতবর্ষের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহার ভাব অন্যরূপ। ভারতবর্ষীয়দিগের নিন্দা করাই সে

সকল সূত্র প্রয়োগের উদ্দেশ্য। কিন্তু তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার পূর্ব্বে বলা আবশ্যক যে, ঐ সকল সূত্রে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা না করিলেই যে, মানুষের বা মনুষ্যসমষ্টি সমাজের কার্য্যগুলিকে, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার বহির্ভূত মনে করা হয়, এমত নহে। জাগতিক সকল ব্যাপারই কার্য্য কারণ সম্বন্ধের অন্তর্ভূত। তবে মানুষ এবং মনুষ্য সমাজের কার্য্যকলাপ স্থূল, সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মতম অশেষবিধ শক্তির ফল। সুতরাং স্থূল দর্শনে সে সমুদায় শক্তি নির্ব্বাচিত এবং অবধারিত হয় না। ইউরোপীয়দিগের ঐতিহাসিক বিজ্ঞান এখনও অতি শৈশবাবস্থ। উহাতে কয়েকটা স্থূল সূত্রমাত্র আছে, এবং সেই স্থূল সূত্র গুলিও গ্রীকশিষ্য ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃগণের স্ব স্ব জাতি গৌরব সূচকমাত্র। সেই জন্য সূত্র গুলিতে ব্যভিচারের স্থলও অশেষ।

এই নব্য ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ বলেন যে, ভারতবর্ষ বড় গ্রীষ্মপ্রধান দেশ, অতএব এখানকার লোকেরা অলস প্রকৃতিক হইবে। গ্রীষ্মাতিশয্যে শারীরিক শ্রম যে অপেক্ষাকৃত ক্লেশকর হয়, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু আরব দেশও গ্রীষ্মপ্রধান, চীনের দক্ষিণাংশও গ্রীষ্মপ্রধান। ঐ সব দেশের লোকেরা ত অলসস্বভাব নয়। আর শীতপ্রধান ইউরোপের উত্তরাঞ্চলবাসী জর্ম্মণেরাও ত পূর্ব্বকালে অধিক শ্রমশীল বলিয়া বিখ্যাত ছিল না। ইংরাজদিগের আদি পুরুষেরা ত খুব পেট ভরিয়া মদ্য মাংস খাইত, এবং সলোম পশুচর্ম্মাদি আচ্ছাদিত হইয়া খুব ঘুমাইত। অতএব গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোক হইলেই অলস হয়, এবং শীতপ্রধান দেশের লোক হইলেই শ্রমশীল হয়, এই সূত্র ধরিয়া ভারতবাসীকে অলস প্রকৃতিক বলা একটা অপসিদ্ধান্ত। সমাজবন্ধনের গুণে এবং সামাজিক শিক্ষার গুণে গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও আলস্য দোষের পরিহার হইয়া থাকে।

ঐরূপ আর একটা কথা শুনা যায়। ভারতবর্ষের ভূমি অধিক স্থলেই অতিশয় উর্ব্বরা—এখানে অতি অল্প পরিশ্রমেই জীবিকার অর্জ্জন হয়, এই জন্য এখানকার লোকেরা অল্পমাত্র পরিশ্রম করিয়া সন্তুষ্ট থাকে—

অধিক পরিশ্রমে মন দেয় না। এটাও একটা মিছা কথা। ইউরোপীয় ভ্রমণকারী মাত্রেই ভারতবর্ষীয় কৃষিজীবীদিগকে পরিশ্রমশীল বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। চিনীয়দিগের শ্রমশীলতা ইউরোপীয় এবং আমেরিক-দিগের ভীতিজনক হইয়াছে। মিশরের কৃষকেরাও অত্যন্ত পরিশ্রমসহিষ্ণু বলিয়া প্রসিদ্ধ। অতএব উর্ব্বর দেশনিবাসী হইলেই অল্প পরিশ্রমী হয়. এরূপ মনে করা অযৌক্তিক। ফলতঃ উর্ব্বর-দেশবাসীরা দেশের উর্ব্বরতা নিবন্ধন পরিশ্রমে কাতর হয়, ইহা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ অর্জ্জন স্পৃহার বিরুদ্ধ কথা এবং একান্ত অশ্রদ্ধেয়। তবে যদি উর্ব্বর দেশ-বাসীর সামাজিক নিয়ম অথবা রাজনিয়ম এমন হয়, যে তাহার পরিশ্রমা-র্জ্জিত অর্থ নিজ ভোগে না আইসে, তাহা হইলে তাহার শ্রম-বিমুখতা সহজেই জন্মিয়া যায়। ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে সময়ে সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সেই সকল প্রদেশে নূতন বন্দোবস্তের তিন চারি বৎসর পূর্ব্ব হইতে ক্ষেত্র সকল অনাবাদী এবং পতিত করিয়া রাখা লোকের অভ্যাস্ত হইয়া উঠিয়াছে বটে।

প্রকৃত প্রস্তাবে, উর্ব্বরদেশবাসীরা বিলক্ষণ শ্রমশীল হইতে পারে। দেশের উর্ব্বরতা নিবন্ধন অধিক অন্নোৎপত্তি হয়। অন্নোৎপত্তি অধিক হইলেই প্রজার সংখ্যা বাড়ে। প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি হইলেই সুব্যবস্থিত সমাজে আরও অন্নবৃদ্ধির প্রয়োজন উপস্থিত হয়, এবং সেই প্রয়োজন সাধনার্থে অধিকতর শ্রম সহকারে অন্নোৎপাদনের আবশ্যকতা হয়। চীন এবং ভারতবর্ষবাসীরা যে শ্রমশীল তাহার কারণ ঐরূপ।

আরও একটা কথা আছে। সে কথাটাতে বৈজ্ঞানিক বিচারের ভান কিছু গাঢ়তর। ভারতবর্ষবাসীরা ভাত খায়—ভাতের শরীর-পোষণশক্তি কম, এই জন্য ভারতবাসীরা দুর্ব্বল এবং শ্রমবিমুখ। কিন্তু ভারত-বাসীরা সকলে ভাত খায় না—সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী অর্দ্ধেক লোকের কিছু অধিক লোকে ভাত খায়, নচেৎ গোধূম, জনার এবং অপরাপর শস্যই অধিক লোকের খাদ্য। তবে গোধূমের রপ্তানি বাড়িয়া অবধি দিন দিন ভাত খাওয়া

বৃদ্ধি পাইতেছে বটে। ভারতবাসী দুর্ব্বলও নয় আর শ্রমবিমুখও নয়। তবে আজি কালি অনেকে অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করে বলিয়া যাহাই হউক।

ঐরূপ আর একটা কথা এই। ভারতবাসীরা মাংস খায় না বলিয়াই বলহীন এবং সাহসহীন। কিন্তু স্পার্টানেরা মাংস খাইত না—অথচ গ্রীক-দিগের মধ্যে উহারা অপর সকল লোকের অপেক্ষা বলবান ছিল। ভারতবর্ষে নিরামিষভোজী ভোজপুরীয়েরা, অযোধ্যাবাসীরা ও পঞ্জাবী জাঠেরা পৃথিবীর মধ্যে অতি বলশালী লোকের সমকক্ষ। ইউরোপখণ্ডের সকল লোক ত ইংরাজদিগের সমান মাংসাশী নয়—জর্ম্মণ ও ফরাসিরা ইংরাজের অপেক্ষা কম মাংস খায়; কিন্তু জর্ম্মণ এবং ফরাসিরা ইংরাজের অপেক্ষা হীনবল নয়; যদিও ফরাসিরা কিছু কম হয়, জর্ম্মণেরা ত কম নহে। আর যদি মাংস না খাইলেই বল কম হইত, তবে কি একজনও ইংরাজ মাংস-বর্জ্জনের যে নব-বিধান হই-তেছে, তাহাতে যোগ দিত? ফলকথা, যে দেশে শস্যোৎপত্তি অধিক হয়, সেখানকার লোকেরা অধিক শস্যই খায়—মাংস অল্প খায়। হিন্দু সমাজেও তাহাই হয়; শস্য খাওয়া অধিক হয়, মাংস খাওয়া কম হয়। শূকরের বসা খাওয়া হয় না বটে, ঘৃত ভোজন হয়; মাংস খাওয়া হয় না বটে, দুগ্ধ খাওয়া হয়। সকল প্রধান প্রধান ইউরোপীয় ডাক্তরের এক্ষণে মত এই যে, তৈলবৎ স্নেহ দ্রব্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর খাদ্য আর কিছুই নাই। অন্যের কথা কি, আর্য্যশাস্ত্রেই লিখিত হইয়াছে "আয়ুর্বৈ ঘৃতং"।

একজন ইংরাজ এক দিন আমাকে কথায় কথায় বলিলেন, তোমাদিগের দেবদেবীর এত অধিক হাত কেন, তাহা এত দিনে আমি বুঝিয়াছি।" * * "কি বুঝিয়াছেন?" * * "বুঝিয়াছি, যে এক একটী নদীতে অনেকানেক উপনদী আসিয়া পড়ে, তাই দেখিয়াই দেবদেবীর শরীরে বহুহস্ত কল্পিত হইয়াছে" * * আমি বলিলাম, "গ্রীক জাতীয় দেব দেবী গুলির সকলেরই দুইটী করিয়া হাত, গ্রীস দেশের নদীগুলির বুঝি উপনদী নাই!" ভৌগো-লিক তথ্য হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সামাজিক প্রকৃতি নির্ণয়ের পদ্ধতি এইরূপ ভ্রমসঙ্কুল এবং উপহাসাস্পদ।

সমাজিক প্রকৃতি নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আর এক প্রকার বিচার আছে। ইহা মনুষ্যের মৌলিক-বর্ণভেদ অবধারণের দ্বারা হইয়া থাকে। এ বিচারের সারবত্তা আছে। এ বিচারে পূর্ব্বপুরুষের প্রকৃতি হইতে পরবর্ত্তী পুরুষের প্রকৃতি নির্দ্ধারণের চেষ্টা হয়। সুতরাং ইহা প্রকৃতরূপে বিজ্ঞান-মূলক। ভারতবর্ষীয়দিগের প্রতি ঐ বিচার-সূত্র প্রযুক্ত হইয়া জানা গিয়াছে যে, এই জাতির অনেকগুলি লোক ককেশীয় বর্ণ-সম্ভূক্ত আর্য্য, আর কতক লোক অনার্য্য—অর্থাৎ দ্রাবিড়ীয়, কোলেরীয়, তাতারীয় প্রভৃতি অপরাপর বর্ণ সম্ভূক্ত। ঐ আর্য্য এবং অনার্য্যের মিশ্রণে এক্ষণকার হিন্দু জাতি—এবং তাহার মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বলায় এবং উপবীত ধারণ করে বা করিবার যোগ্য, তাহাদিগের শরীরে আর্য্য শোণিত অধিক—এবং ব্রাহ্মণের শরীরে ঐ শোণিত বিশিষ্টরূপেই অধিক। কোন কোন ইংরাজ ঐতিহাসিকের অনুমানে অবিমিশ্র অথবা অবিমিশ্রপ্রায় আর্য্যের সংখ্যা, দেড় কোটির অনধিক, কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, শুদ্ধ ব্রাহ্মণের সংখ্যাই দেড় কোটি এবং প্রাচীন ক্ষত্রিয় স্থানীয় বর্ত্তমান রাজপুত এবং প্রাচীন বৈশ্য স্থানীয় বর্ত্তমান বণিকাদি জাতীয়েরা আর্য্যের মধ্যে গণ্য এবং অনেক সদ্বংশোদ্ভব মুসলমানও আর্য্য জাতীয়, তখন ভারতে আর্য্যের সংখ্যা অত অল্প হইতে পারে না। আর্য্য জাতীয় লোকের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্মজ্ঞান, নীতিজ্ঞান, চাতুর্য্য সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠা সর্ব্ববাদিসম্মত, এবং সেই আর্য্য লোকই হিন্দুজাতির সারভূত, এবং তৎসংশ্লিষ্ট অনার্য্যেরাও সমাজসাশনের গুণে অনেকানেক ম্লেচ্ছদিগের অপেক্ষা আচার-পূত এবং ধর্ম্ম ভীরু হইয়া আছে। অতএব প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিচারে ভারতবাসিগণ যে অতি উচ্চপ্রকৃতিক, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ইউরোপে সামাজিক বিজ্ঞান বা সমাজতত্ব একটী নূতন শাস্ত্র। ইহার অতি স্থূল সূত্রগুলিও এ পর্য্যন্ত সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে অবধারিত হয় নাই। কেহ কেহ সমাজগুলিকে এক একটী সুবৃহৎ পরিবারের স্বরূপ মনে করিয়া সমাজ সম্বন্ধে তদনুযায়ী বিচার করেন, কেহ কেহ বা সমাজান্তর্গত জনগণের মধ্যে পরস্পর ব্যবহার সম্বন্ধে যেন কখন একটা বিশেষ চুক্তি ধার্য্য হইয়া গিয়াছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া বিধি ব্যবস্থা দেন, আর কেহ কেহ বা ধর্ম্মনীতি শাস্ত্রকেই সমাজতত্বের মূল বলিয়া তদনুযায়ী নিয়ম সকল স্থাপন করিতে চান। আবার যাঁহারা বৈজ্ঞানিক বিচার প্রণালীর বিশেষ ভক্ত, তাঁহারা সমাজ পদার্থটীর নিদান কিরূপ তাহা আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৈবাহিক প্রণালীকে সমাজবন্ধনের মূল সূত্র বিবেচনা করিয়া প্রতিপরিবারকেই সমাজের মৌলিক অণুস্বরূপ ভাবেন। যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক সমাজতত্বীরা সমাজ মধ্যে বিশ্বসিত সর্ব্বপ্রকার মতবাদের এবং সমাজ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত সর্ব্বপ্রকার আচারের হেতু প্রদর্শন করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কিন্তু যতই হউক, এখনও পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ অনেক; এখনও সমাজতত্বের বিচারে উপমাত্মক ন্যায়ানুযায়ী বিচার, অতি উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই বিচরণ করিয়া থাকে।

ইউরোপীয় অতি বড় বড় নব্য-পণ্ডিতেরাও অনেকে সমাজ শরীরকে প্রাণিশরীরের সহিত তুলনা করেন। তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, প্রাণিশরীর যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু সকলের সমষ্টি, সমাজশরীরও তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুল পরিবারের সমষ্টি—তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, প্রাণিশরীরাবস্থিত সকল অণুগুলিতেই জীবধর্ম্ম আছে, সমাজ শরীরাবস্থিত প্রতি পরিবারও জীবনী শক্তি সম্পন্ন—তাঁহারা দেখিয়াছেন, যেমন প্রাণি শরীর হইতে অণু সকল নিরন্তর বিচ্ছিন্ন হইয়া বহির্গত হইয়া যাইতেছে, এবং নূতন অণু সকল আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইতেছে, সেইরূপ সমাজ শরীর হইতেও লোক সকল মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতেছে, আবার নূতন

লোক সকল জন্মিয়া সমাজের পোষণ করিতেছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সকল সাদৃশ্য উপলব্ধ হওয়াতে পণ্ডিতেরা উপমাত্মক প্রমাণের বশবর্ত্তী হইয়া নিশ্চয় করিয়াছেন যে, সমাজশরীর অবিকল প্রাণিশরীরের তুল্য, ঐ দুইটীতে কোন ইতর বিশেষই নাই।

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াই সামাজিক নিয়মাদির উল্লেখ হইয়া থাকে। তাঁহাদের মতগুলি এইরূপ—(১) সকল সমাজেরই জন্ম, যৌবন, প্রৌঢ়, জরা, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী; কারণ, প্রাণিশরীরের ঐ সকল দশা-বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী। (২) সমাজ সংস্কারের সাময়িক প্রয়োজন আছে, কারণ বাল্যের পরিধেয়, যৌবন এবং প্রৌঢ়াবস্থায় খাটে না। (৩) সমাজ জীবৎ শরীর; আহারের ন্যায় যাহা উপযোগী উহা তাহাই গ্রহণ করে, যাহা অনুপযোগী তাহা ত্যাগ করে।

এইরূপ অনেকানেক কথা আছে, এবং সে কথাগুলি উপমাত্মকন্যায়মূলক বলিয়া এমনি পিচ্ছিল যে, অনায়াসেই লোকের গলাধঃকৃত হইয়া যায়। কিন্তু প্রাণিশরীরের সহিত সমাজশরীরের অনেকানেক মৌলিক বিষয়ে কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। (১) প্রাণিশরীরের ধ্বংশ অবশ্যম্ভাবী; তাহার কারণ, প্রাণিশরীর যে বলে জীবিত থাকে, তাহার প্রতিকূল বল সর্ব্বদাই ঐ শরীরকে নষ্ট করিতে চায়। চিরস্থায়ী প্রতিকূল শক্তি সকলের কার্য্যকারিতাগুণে প্রাণিশরীরের বিনাশ অবশ্যই হইয়া থাকে। কিন্তু ওরূপ কোন চিরস্থায়ী শক্তি, সমাজশরীরের প্রতিকূলরূপে কার্য্য করিতেছে বলিয়া দৃষ্ট হয় না। মানুষের সাহজিক স্বার্থপরায়ণতা সামাজিক অবস্থার প্রতিকূল বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাহা প্রকৃত কথা নয়। সমাজ-বন্ধনের গুণে স্বার্থপরতাও সুসংস্কৃত হইয়া ঐ বন্ধনের অনুকূল বই প্রতিকূল হয় না। মানুষ সমাজসম্বদ্ধ থাকিয়া যেমন স্বার্থসাধন করিতে পারে, সমাজচ্যুত হইলে তেমন পারে না। তদ্ভিন্ন, সাহজিক সহানুভূতি সমাজ-বন্ধনের অনুকূল শক্তি। এই জন্য সমাজ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার উপযোগী কোন স্থায়ী কারণই নাই।

তবে পৃথিবী যদি কোন কালে মানুষের বাসোপযোগী না থাকে, (যেমন লোমশ হস্তী প্রভৃতি যুগান্তরজাত জীবদিগের সম্বন্ধে হইয়াছে) তাহা হইলে মনুষ্যজাতির বিধ্বংসের সহিত সমাজেরও বিলোপ হইবে।

সময়ে সময়ে সমাজের কোন কোন নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় বটে, কিন্তু সামাজিক নিয়মের সহিত মানুষের পরিধেয় বস্ত্রের কোন সাদৃশ্য নাই। নিয়মগুলি সমাজের অন্তর্ভূত বস্তু, পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় বাহির হইতে আনীত বস্তু নয়। উপমার দ্বারা উহাদিগের প্রকৃতি বুঝিতে হইলেও ঐ গুলিকে সমাজরূপ গৃহের কড়ি, বরগা, ইষ্টকাদির ন্যায় মনে করা যাইতে পারে। কোনটী মচকাইলে বা ক্ষত হইলে বা লোনা ধরিলে বদলাইতে হয়, কিন্তু সেরূপ দূষিত না হইলে, শুদ্ধ বদলাইতে হয়, মনে করিয়া বদলাইতে যাইতে নাই। আর বদল করিবার সময়েও খুব সাবধানে ঠেকো দিয়া এবং কোনরূপ বিভ্রাট না ঘটে, তাহার উপায় করিয়া তবে বদলাইতে হয়। প্রাণিশরীর হইতে সমাজশরীরের বিশেষ পার্থক্য এই, উহা আপনার বহির্ভাগ হইতে আহারের ন্যায় কিছুই গ্রহণ করে না। উহার পোষণ উহার আপনার ভিতর হইতেই হয়। বাহির হইতে কিছু আনিয়া সমাজের গাত্রে লাগাইয়া দিলে, উহা প্রাচীরে ঘুঁটে দিবার ন্যায় গায়ে লাগিয়া থাকে মাত্র—প্রাচীরের বিস্তৃতি কিছুই বাড়ায় না। এই জন্য সামান্য অনুকরণ জাত সমাজ সংস্কার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর হয়।

ফলতঃ, যদি উপমার দ্বারাই বুঝিতে হয়, তবে সমাজশরীরকে প্রাণিশরীর না ভাবিয়া উহাকে দেবশরীর মনে করাই শ্রেয়ঃ *। দেব শরীরের আদ্যারম্ভ নাই, তেমনি কোন সমাজ পৃথিবীতে কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছে তাহারও নিশ্চয়তা নাই। যেমন দেবতারা চির

* "Society is a moral individual essentially different from a physical individual."—Vattel.

কাল যৌবনাবস্থ, তেমনি সমাজও চিরকাল যৌবনাবস্থ। আপনা হইতে সমাজের জরা, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু নাই। যেমন দেবতাদিগের এক একটী বিষয়ে বিশেষ অধিষ্ঠান, তেমনি প্রত্যেক সমাজ আপনাপন মূল প্রকৃতি লইয়াই চিরকাল চলিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, আর্য্য শাস্ত্রকারেরা দৈব, পৈত্র এবং আর্ষ বলিয়া মানুষের যে তিনটী ঋণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দৈব ঋণটী, আত্মসমাজের নিকটেই ঋণ; উহা যজ্ঞদ্বারা অর্থাৎ সমাজান্তর্গত ব্যক্তি সকলের সুখ সম্বর্দ্ধনের দ্বারা, পরিশোধ করিতে হয়। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, আর্য্যশাস্ত্রকারেরা তাঁহাদিগের বিবিধ গূঢ় ভাবব্যঞ্জক শাস্ত্রে, যেমন সমস্ত লোক সমষ্টিকেই কোথাও ব্রহ্মা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তেমনি সমাজ বস্তুটীকেই দেবশরীর বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

দেবশরীরের সহিত সমাজশরীরের আরও একটী সাদৃশ্য আছে। দেবশরীর আপনা হইতে নষ্ট হয় না; সমাজও আপনা হইতে মরে না। কিন্তু দেবশরীর যেমন দৈত্য দানবাদিকর্ত্তৃক বিনষ্ট না হউক, কিন্তু অধঃপাতিত হইতে পারে, সমাজ-শরীরও সেইরূপ অন্য সমাজের প্রতিকূল বলে বিনষ্ট না হউক, কিন্তু অধিনীকৃত এবং হতপ্রভ হইতে পারে। আড়াই শত বৎসর গত হইল, পেগু প্রদেশ জয় করিয়া বর্ম্মিরা অনুজ্ঞা করিলেন যে, পেগু দেশীয়রা আপনাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে পারিবে না—আর ধর্ম্ম ব্যবস্থাও ব্রহ্মের প্রধান ফুঙ্গীর স্থানে লইবে। পেগুর আর স্বাতন্ত্রিকতা রহিল না। এই সে দিন, পোলণ্ডের বিদ্রোহ দমন করিয়া রুসিয়া আজ্ঞা করিল, কোন বিদ্যালয়ে পোল্‌দিগের ভাষা শিক্ষিত হইবে না, আর হাটে বাজারে কেহ কোথাও প্রকাশ্যভাবে পোল্‌ভাষা ব্যবহার করিতে পাইবে না। রুসিয়া অপরাপর ইউরোপীয় রাজ্যের ভয়ে বলিতে পারিল না যে, পোলদিগের ধর্ম্মব্যবস্থাও আর রোমান কাথলিক থাকিবে না, রুসীয় প্রজাদের ন্যায় গ্রীক্ সম্প্রদায়ের অনুযায়ী হইবে। ঐটী পারিলেই, বর্ম্মিরা যাহা পেগু প্রদেশে করিয়াছিল, তাহা

হইবে। ঐটী পারিলেই, বর্ম্মিরা যাহা পেগু প্রদেশে করিয়াছিল, তাহা করা হইত, এবং ধর্ম্মলোপ ও ভাষালোপ এই দুইটী করিতে পারিলেই সমাজের যে বিশিষ্টরূপ অধঃপতন হয়, নব্য ইউরোপে তাহার একটী প্রমাণ প্রদর্শিত হইত।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা উপমাত্মক ন্যায়ের প্রয়োগ দ্বারা আর একটী সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, যে সমাজের রাজনৈতিক শক্তি বিলুপ্ত হয়, সে সমাজেরও ধ্বংস হইয়াছে মানিতে হয়। তাঁহাদের মতে, রাজনৈতিক শক্তি বিলুপ্ত হইবার চিহ্ন, সন্ধিবিগ্রহাদি কার্য্যে অধিকার লোপ। কিন্তু ইহা কোন প্রকৃত কথা নয়। যদি ইহা সত্য হইত, তবে সমাজ পদার্থটী অজর অমর না হইয়া নিতান্তই ঠুন্‌কো জিনিস হইত। তাহা হইলে বৃহৎ সাম্রাজ্য মাত্রকেই অন্তঃশাসন লইয়া বিব্রত হইতে হইত না, অথবা সাম্রাজ্যবন্ধন কখন ভগ্ন হইতে পারিত না। তাহা হইলে, রুসিয়াকে পোলণ্ড লইয়া, ইংলণ্ডকে আয়র্লণ্ড লইয়া, তুরুষ্ককে তাহার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ লইয়া চিরকাল বিব্রত হইয়া থাকিতে হইত না, এবং অষ্ট্রীয়াকেও হঙ্গরীর সহিত সংযুক্ত হইতে হইত না। রাজশক্তি গেলেই সমাজ যায় না—আর সমাজ থাকিলেই রাজশক্তি লাভের আশা এবং সম্ভাবনা থাকে। ইটালী এবং গ্রীস্ যে আবার এক একটী স্বাধীন রাজ্য হইয়া উঠিল, তাহার মূল কারণ, উহাদিগের সমাজ ছিল এবং সেই জন্যই মাথা গজাইল। সমাজ লোপের সহিত ধর্ম্মের লোপ, ভাষার লোপ, এবং জাতিরও লোপ হয়।

ইহাতেই বোধ হইবে যে, কোন সমাজ প্রাণীশরীরের ন্যায় জরা মৃত্যু প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী বিধ্বংসের নিয়মাধীন নয়। সমাজের অনিষ্ট, তাহার বহিঃস্থিত অপরাপর সমাজের সম্বন্ধ জন্যই হইতে পারে। সুবহু স্থলেই সেই সম্বন্ধ, অরি-সম্বন্ধ হইয়া থাকে। যেখানে মিত্র সম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয়, তথায়, কারণ বিশেষ, যথা কোন সাধারণ শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ, দুইটী বা ততোধিক

বিভিন্ন সমাজকে কিছু কালের জন্য মিত্রতাসূত্রে সম্বন্ধ রাখে। অথবা যেমন একটী দেবশরীর অপর দেবশরীরে মিশিয়া বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ কোন কোন স্থলে একটী সমাজ অপর সমাজের সহিত মিলিয়া ক্রমে দুইটিতে এক হইয়া যায়। ভারতবাসী অনার্য্য লোক সকল আর্য্যদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া এক হিন্দু সমাজ হইয়াছে। ইংলণ্ডে, ওএলস প্রদেশবাসী এবং স্কটলণ্ড নিবাসী লোক সকল ক্রমে ক্রমে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া এক-জাতিত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। পরন্তু বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সাধারণতঃ অরি-সম্বন্ধ থাকিলেও তত্তৎ সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অকৃত্রিম প্রণয় এবং সৌহার্দ্দ জন্মিতে পারে। কোন ইংরাজ গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, মানুষে মানুষে স্বভাবতঃ শত্রু সম্বন্ধই বলবৎ—এক জন আর এক জনকে দেখিলে মনে মনে বিতর্ক করে, আমি উহাকে খাইতে পারি, না ঐ ব্যক্তি আমাকে খাইয়া ফেলিতে পারে! বাস্তবিক তাহা নয়, মনুষ্যদিগের মধ্যেও মনুষ্য-জাতিত্ব নিবন্ধন বিশেষ একটি সহানুভূতি আছে। বোম্বাই নগরে যখন প্রথম কাপড়ের কল বসিল, তখন এক জন গম্ভীর প্রকৃতি ইংরাজকে আমি সত্য সত্যই সুখী হইয়া নৃত্য করিতে দেখিয়াছি।

কিন্তু ওরূপ যতই হউক, স্থূল কথা এই যে, বিভিন্ন সমাজের পরস্পর সম্বন্ধ, অরি-সম্বন্ধ। উহাই তাহাদের নিত্য-ধর্ম্ম। এইরূপ হইবার মূল-কারণ, ভূমণ্ডলব্যাপক অতি মহান্ একটা প্রাকৃতিক নিয়ম। সেই নিয়মের প্রভাবে এক প্রকার উদ্ভিদ অন্য জাতীয় উদ্ভিদকে বিনষ্ট করিয়া ক্ষেত্র অধিকার করে, এক প্রকার জন্তু অপর প্রকার জন্তুর স্থান লয়, এক সমাজের মনুষ্য অন্য সমাজের উপর কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এ নিয়মটীও সমাজ মাত্রের সাহজিক বৃদ্ধি বই আর কিছুই নহে। মানুষ যদি সমাজ বদ্ধ হইয়া না থাকে, তবে পৃথিবীতে মনুষ্য বিনাশের কারণ এত বহুমুখ, যে মানুষের সংখ্যা অধিক পরিমাণে বাড়িতে পায় না; রোগে, অনাহারে, হিংস্র জন্তুগণের দৌরাত্ম্যে, আর পরস্পর যুদ্ধে, অনেকে মারা যায়। কিন্তু সমাজ বন্ধনের গুণে, শ্রমবিভাগের প্রথা জন্মে; তাহাতে খাদ্য সামগ্রী বৃদ্ধি

হয়, অকাল এবং অপঘাত মৃত্যু ন্যূন হয়, মানুষ সংখ্যায় বাড়ে, এবং সংখ্যায় যত বাড়ে, অনায়াসে তদুপযুক্ত আহার পায় না, এই জন্য বিস্তৃত হইয়া অপর সমাজের অধিবাসভূমিতে প্রবেশ করে। সমাজে সমাজে অরি-সম্বন্ধ জন্মিবার এইটীই মূল কারণ। অন্য কারণও আছে; যথা, কোন সমাজের অর্থলোভপ্রবণতা—কাহার বিজিগীষা—কাহার অহঙ্কার, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল কারণ, ঐ মূল কারণেরই সহায় বা প্রকটরূপ মাত্র, মূলকারণ না থাকিলে, উহারা কার্য্যকারী হইত না।

সামাজিক প্রকৃতি—ব্যবস্থাসূত্র।

মানুষ সমাজ-সম্বদ্ধ হইয়া থাকিলেই সংখ্যায় বাড়িয়া যায়। সংখ্যায় বাড়িলেই, আর অযত্নসম্ভূত বন্য ফল মূলাদি কিম্বা মৃগয়ালব্ধ পশু পক্ষীর মাংস হইতে আহার্য্য প্রাপ্তি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয় না। এই জন্য সমাজ-বন্ধন হইলেই আহার্য্য বৃদ্ধির উপায় করা আবশ্যক হয়, এবং সেই আবশ্যকতা হেতু সামাজিক ব্যবস্থা সকল জন্মে।

শ্রমোপার্জ্জিত দ্রব্যাদিতে স্বত্বাধিকারের জ্ঞান, পূর্ব্ব হইতেই ঈষন্মাত্রায় জন্মিয়া থাকে। সেই জ্ঞান ক্রমশঃ অধিকতর পরিস্ফুট হয়, এবং তাহা সামাজিক ব্যবস্থার দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হয়। কারণ, স্বত্বাধিকার সংস্থাপিত হইলে, দ্রব্যাদির অপচয় নিবারণ এবং তাহাদিগের সমধিক উৎপাদন, উভয় কার্য্যই জনগণের স্বার্থ সাধক হইয়া উঠে। এই জন্য সকল সমাজেই স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকার সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা, সমাজের প্রকৃতি ভেদে বিশেষ বিশেষরূপ ধারণ করিয়া, ব্যবস্থিত হইতে থাকে। প্রথমেই স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকার প্রতিব্যক্তিনিষ্ঠ না হইয়া উহা গৃহস্বামীতে অথবা গোত্রস্বামীতে একান্ত নিষ্ঠ থাকে। যিনি বাটীর বা গোত্রের প্রধান, তিনি সেই বাটী বা গোত্রস্থ সকল নরনারীরও হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।

বাটীর বা গোত্রের দ্রব্যাদি তাঁহার বই আর কাহার হইবে? এই অবস্থাটীর প্রকৃতি ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রায়ই সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা অনেকেই এটীকে দাসত্বের অবস্থা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।

বাস্তবিক, সমাজের ঐ অবস্থায় দাসত্বের আধিক্য হয় বটে। কিন্তু ইউরোপীয়েরা যাহাকে দাসত্ব বলিয়া বুঝেন, সে দাসত্বে এবং এ দাসত্বে অনেক প্রভেদ। ইউরোপীয়দিগের দাসত্ব অতি ভয়ানক বস্তু। সে দাসত্বে ভিন্ন ধর্ম্মা এবং ভিন্নজাতীয় দুর্ব্বল মনুষ্যের প্রতি, অর্থলালসা-প্রদিগ্ধ অতি প্রবলতর মনুষ্য, পশুবৎ এবং পিশাচবৎ নৃশংস ব্যবহার করে। এ দাসত্বে, বলবান্ মনুষ্য, দুর্ব্বল মনুষ্যকে নিজ গোত্র বা নিজ পরিবার সম্ভুক্ত করিয়া তাহাকে বহিঃশত্রু হইতে এবং নিরন্নদশা হইতে রক্ষা করে। সে দাসত্বে, দাস ক্রীত পশু অপেক্ষাও হীন, এ দাসত্বে দাসে এবং পুত্রে বা কনিষ্ঠ ভ্রাতায় নির্ব্বিশেষ। ইউরোপীয়ের দাস, কাফ্রি জাতীয় টম, তাহার মনিব তাহার বুকের মাংস সাঁড়াসি দিয়া ছিঁড়ে; এসিয়াখণ্ডে মুসলমানের দাস সবক্তগিন্, কুতবুদ্দীন, আল্‌তমস্, যাহারা আপনাপন প্রভুর জামাতা এবং সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী। চিনীয়দিগের দাসেরা মনিবদিগের শিং উপাধি প্রাপ্ত হয়; ভারতবর্ষে আর্য্যের দাসেরা নিম্নতর বর্ণে ব্যবস্থাপিত হইলেও আর্য্যের গোত্রাধিকারী। দাসত্ব দশাটী সমাজ সম্বর্দ্ধনের একটী মুখ্য উপায়। উহা যথাকালে অর্থাৎ গোত্র-স্বামীর সর্ব্বাধিকারিত্বের সময়ে, গোত্রসম্বর্দ্ধকরূপেই প্রচলৎ হইয়া থাকে। এক জন অতি বড় ইউরোপীয় সমাজতত্ত্ববিৎ দাসত্ব দশার উপকারিতা স্বীকারে বাধ্য হইয়া বলিয়াছেন—"দাসত্বদশাও ভাল; কারণ, দাসত্বের প্রবৃত্তি হওয়াতে নর-মাংস ভোজনটা নিবৃত্তি হয়।" এরূপ নরচিত্তানভিজ্ঞতা নৃশংস স্বভাব লোকেরই উপযুক্ত। ফলতঃ মানুষ, মানুষকে পাইলে তাহাকে আপনার করিয়া লইতে চায়, তাহাকে পুষিতে চায়, খাইতে চায় না।

দাসাদি গ্রহণ দ্বারা সমাজ সম্বর্দ্ধিত এবং কৃষিকার্য্যের বিশেষ উৎকর্ষ হইলে, স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে ব্যবস্থা সূত্রের একটী অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়। গৃহস্বামী বা গোত্রস্বামীর সর্ব্বাধিকারিত্বের অভ্যন্তরে নূতন একটী ভাব সঞ্চরিত হইতে থাকে। তিনি যেন পরিবারটীর বা গোত্রটীর প্রতিভূস্বরূপ বলিয়াই সর্ব্বাধিকারিত্ব উপভোগ করেন, এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়া যায়। ঐ প্রতীতি হইতে সম্মিলিত স্বত্ব ও স্বত্বাধিকার এবং তাহার বাহ্যরূপ স্বরূপ সম্মিলিত পরিবার দেখা দেয়। সর্ব্বাধিকারিত্বের সময়েও সম্মিলিত পরিবার, এখনও তাই। কিন্তু সর্ব্বাধিকারিত্বের সময় সম্মিলিত পরিবারগুলি যত দৃঢ়সম্বদ্ধ, এখন আর সেরূপ নহে। এ সময়েও দাস ব্যবহারের প্রথা প্রচলৎ থাকে। কিন্তু কুল পূর্ব্বেই বাড়িয়া উঠিয়াছে, অতএব এ অবস্থায় দাসেরা আর কুলবর্দ্ধকরূপে গৃহীত হয় না। উহারা ক্ষেত্র সংসৃষ্ট পশুবৎ গণ্য হয়। উহাদিগকে অপকৃষ্ট স্বতন্ত্রাবাস প্রদত্ত হয়। কোথাও কোথাও, যথা অধস্তন রোমীয়দিগের মধ্যে, উহারা দিবাভাগে ক্ষেত্রে খাটে, রাত্রিতে কারাগৃহে নিরুদ্ধ থাকে। চীন সাম্রাজ্যে এবং ভারতবর্ষে এবং প্রাচীন মিশর প্রভৃতি দেশে, দাসদিগের কথনই ওরূপ দুরবস্থা হয় নাই। ঐ সকল দেশে সর্ব্বাধিকারিত্ব একবারে নষ্ট হয় নাই। কিন্তু অধস্তন রোমীয়দিগের মধ্যে পৃথক্ স্বত্বের প্রাদুর্ভাবে সম্মিলিত স্বত্বের ভাবও বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

কৃষিপ্রধান অবস্থাতেই কিছু কিছু শিল্প এবং বাণিজ্যেরও অঙ্কুরোদয় হয়। যেথানে শিল্পের এবং বাণিজ্যের বিশেষ আধিক্য হয়, তথায় সম্মিলিত স্বত্বাধিকারের নিয়ম অক্ষুণ্ণ থাকে না—পৃথক্ স্বত্বের ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইয়া উঠে। নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এবং অধস্তন রোমীয়দিগের স্থানে লব্ধ ইউরোপীয় ব্যবস্থা শাস্ত্র উভয়েই এই পৃথক্‌স্বত্বের বিশেষ পক্ষপাতী। এত পক্ষপাতী যে, ইউরোপের মধ্যে কোথাও কোন একটী জিনিস অস্বামিক থাকিতে পায় না। ইংলণ্ডে গোচারণ স্থানগুলি বহু

কাল অস্বামিক ছিল। কিন্তু আর নাই বলিলেই হয়। ঐ অস্বামিকতা পরিহারের চেষ্টায় ভারতবর্ষেও বনভূমি সকল গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অধিকার-সম্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, এবং গরিব লোকেরা একটী পাতা কুটা কাঠি কুড়াইতে গেলেও রাজপুরুষদিগের কর্ত্তৃক নিবারিত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে যাহাই হউক, স্বত্ব পার্থক্যের এত দূর বাড়াবাড়ি হওয়াতে, ইউরোপে একটী তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইবার উপক্রম হইতেছে। জাগতিক কোন বস্তুতেই নশ্বর মানুষদেহধারী কাহারও সম্যক্ স্বত্ব হইতে পারে না, এই ভাব অনেক লোকের মনে উঠিয়াছে, এবং তাহারা মানুষমাত্রেই সকল দ্রব্যের ভোগে সমান অধিকারী হইবে, এইরূপ সমাজনিষ্ঠ স্বত্বাধিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে চাহিতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সকল দ্রব্যেরই মূল্য সমাজের অস্তিত্বনিবন্ধন হয় এবং অনেকানেক স্থলে ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্বও শুদ্ধ বলাৎকার অথবা বঞ্চনার ফল; ইহা ভাবিয়া দেখিলে একান্ত ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্ব অপেক্ষা বরং সমাজ নিষ্ঠ স্বত্বই উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যদিও ঐ মতানুযায়ী কোন বিশেষ কাজ এখনও হয় নাই বটে, কিন্তু ইউরোপ এবং আমেরিকায় ঐ মতানুগামী লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে।

সম্প্রতি এই সমাজনিষ্ঠ স্বত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া বিচার করিলে স্বত্বাধিকারের এই ত্রিবিধ অবস্থা লক্ষিত হয়, অর্থাৎ সর্ব্বাধিকারিত্ব, সম্মিলিতাধিকারিত্ব, আর পৃথগধিকারিত্ব। এই তিনটীরই কিছু কিছু চিহ্ন সকল সমাজেই থাকে। সমাজের প্রকৃতিভেদে তাহার কোনটী কোথাও প্রবল, কোনটী দুর্ব্বল হয়। সর্ব্বাধিকারিত্বের প্রধান চিহ্ন, জ্যেষ্ঠাধিকারের ব্যবস্থা। সম্মিলিতাধিকারের প্রধান চিহ্ন, অবিভক্ত ধনাধিকারের ব্যবস্থা। আর পৃথগধিকারের প্রধান লক্ষণ, বিভাজিত ধনাধিকারের ব্যবস্থা। যেখানে জ্যেষ্ঠাধিকার, যথা ঊর্দ্ধতন রোমীয়দিগের মধ্যে, এবং (ফরাসি বিপ্লবের পূর্ব্বে) ইউরোপীয়দিগের মধ্যে, আর

রুসিয়ার ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে, তথায় বৃদ্ধ শর্ম্ম প্রবল। যেখানে অবিভক্ত ধনাধিকার, যথা চীনে এবং ভারতবর্ষে তথায় কৃষি কার্য্যের বিশেষ প্রাধান্য। বহু পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠাধিকার ছিল, শূদ্রদিগেরই সমাধিকার ছিল; কিন্তু বহুকাল হইতে ব্রাহ্মণশূদ্রনির্বিশেষে সকলেরই মধ্যে সমাধিকারের ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যথায় বিভাজিত ধনাধিকার, যথা মার্কিন এবং ফরাসী এবং ইটালীয় প্রভৃতি নব্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে, তথায় বাণিজ্য কার্য্যের বিশেষ সমাদর। ইংলণ্ডে ভূমিসম্পত্তি সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠাধিকারের ব্যবস্থা, অপর সকল সম্পত্তিতে পৃথক্ এবং সমাধিকারের ব্যবস্থা।

যেমন সমাজের প্রকৃতিভেদে স্বত্বাধিকারের ব্যবস্থা ভিন্নরূপ হয় সেইরূপ সমাজের প্রকৃতিভেদে বৈবাহিক ব্যবস্থাও ভিন্ন হইয়া থাকে। স্বত্ব এবং স্বত্বাধিকারের বিধি ব্যবস্থার দ্বারা আহার্য্য সামগ্রীর বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু সমাজসম্ভুক্ত জনসংখ্যার যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, কালক্রমে খাদ্য সামগ্রীর সম্বর্দ্ধন সে পরিমাণে হইয়া উঠে না। মানুষ সমাজসম্বদ্ধ হইয়া থাকিলেই সংখ্যায় অতি সত্বরে বাড়িয়া যায়। এই জন্য সকল সমাজের প্রথমাবস্থায় জনসংখ্যা সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত যতটা উৎসাহ থাকে, কালে সেই উৎসাহ হ্রাস হইয়া আইসে, এবং জনসংখ্যা সঙ্কুচিত করিয়া রাখিবার নিমিত্ত নানা সমাজে নানা প্রকার ব্যবস্থা অবধারিত হইয়া থাকে। আমার বোধ হয়, মনু-সংহিতার সময় এবং তাহার পূর্ব্ব হইতেও ভারতবর্ষে জনসংখ্যা সঙ্কোচ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত কতকটা চেষ্টা হইয়াছিল। স্পষ্টতঃ কোন শাস্ত্রকারই জনসংখ্যা কমাইতে হয়, এরূপ উপদেশ প্রদান করেন নাই বটে। কিন্তু তাঁহাদিগের কথা গুলির তাৎপর্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। বেদে উক্ত হইয়াছে, উপর্য্যুপরি অধিক সন্তান হইলে, তাহাদের অনেকে অকালে মারা যায়। মনু বলিয়াছেন, প্রথম জাত পুত্রই পুত্র, পরবর্ত্তীরা কামজাত, অতএব অপ্রশস্ত। তিনি একথাও বলিয়াছেন, বিনা পুত্রোৎপাদনেও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন।

এক দিকে গৃহস্থাশ্রমের প্রশংসা, পক্ষান্তরে এই সকল কথা, উভয়ের মীমাংসা করিয়া দেখিলে তাৎপর্য্যার্থ এই হয় যে, বিবাহ করিয়া গৃহী হইবে, সমাজকে আপনার শিষ্টাচরণের জামিন দিবে, কিন্তু অধিক সন্তান জন্মাইয়া সমাজকে দুঃস্থ করিবে না, এবং সেই প্রীতিভাজনদিগের অকালমৃত্যু দর্শন যন্ত্রণা হইতে স্বয়ং মুক্ত থাকিবে।

সমাজের প্রথমাবস্থায় বৈবাহিক নিয়ম অতি সামান্যরূপই থাকে, অথবা ও বিষয়ে কোন নিয়মই থাকে না বলিলেও হয়। আর যে নিয়মগুলি ঐ অবস্থায় প্রচলিত হয়, তাহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য, বিভিন্ন পরিবার এবং বিভিন্ন গোত্রদিগকে পরস্পর সম্বদ্ধ করিয়া সমাজশরীরকে বিস্তৃত এবং দৃঢ় করা, জনগণকে শান্তশীল করা, এবং তাহাদিগকে গার্হস্থধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট করা। কিন্তু ক্রমে জনসংখ্যা যাহাতে অতি বর্দ্ধিত হইতে না পায়, তৎপ্রতিও দৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়। প্রথমে, এক পত্নীকত্বের প্রশংসা, অনন্তর একপত্নীকত্বই নিয়ম হয়; কোথাও শাস্ত্রশাসনের দ্বারা হয়, কোথাও কার্য্যতঃ হইয়া যায়। তাহার পর, ব্যবস্থার দ্বারা বিবাহযোগ্য বয়স উচ্চ করিয়া দেওয়া হয়—কোথাও এত উচ্চ করিয়া দেওয়া হয়, অথবা হইয়া উঠে যে, চারি পাঁচটী সন্তান হইবার বয়স অতিক্রান্ত না হইলে আর কন্যাকাল গত হইয়া বিবাহযোগ্যতা জন্মে না। সাধরণতঃ বয়োধিক বিবাহের নিয়ম, যুদ্ধবৃত্তি এবং বণিকবৃত্তিপ্রধান সমাজের মধ্যেই সমধিক প্রচলিত হয়। সুতরাং পৃথক্ স্বত্বাধিকারের পক্ষপাতী সমাজেই বয়োধিকে বিবাহের নিয়ম। যে সকল কৃষিপ্রধান দেশে ব্যবস্থাতঃ অথবা ব্যবহারতঃ সম্মিলিত স্বত্বাধিকারের প্রথা প্রচলিত থাকে, সে সকল দেশে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়া যায়। কিন্তু অল্প বয়সে বিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকিলেও অধিক সন্তান জননের প্রতিবন্ধক নিয়ম সকল ব্যবস্থাপক এবং পণ্ডিতবর্গের প্রমুখাৎ নির্গত হইতে থাকে। কোথাও বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ হয় (যথা, শাস্ত্রতঃ ভারতবর্ষীয় উচ্চজাতীয়দিগের মধ্যে, এবং ব্যবহারতঃ চীনীয় ভদ্র লোকদিগের মধ্যে) কোথাও (যথা, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে,)

উদ্বাহকার্য্য বয়োধিকে নির্ব্বাহিত হয়, কোথাও মৃতপত্নীক পুরুষের দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ নিন্দিত হয় (যথা, রুসীয় যাজকদিগের মধ্যে,) কোথাও চিরকৌমার ব্রতধারণের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হয় (যথা, ভারতবর্ষে, বৌদ্ধ দেশমাত্রে, কাথলিক খৃষ্টানদিগের মধ্যে,) আর কোথাও এক পত্নীর বহু পতিত্ব ব্যবস্থাপিত হয়, (যথা, তিব্বত, ভোট, সিকিম এবং কানেরা প্রদেশে)।

বিবাহপ্রণালীর সংকোচ ভিন্ন, লোকসংখ্যা ন্যূন করিয়া রাখিবার উপায় আর কিছুই নাই। কিন্তু সে উপায়ও সম্যক্ কার্য্যকারী বলিয়া বোধ হয় না। নর-পশুদিগেরও ইন্দ্রিয়গ্রাম অতি বলবান। সুতরাং বিনা বিবাহবন্ধনে যৌবনাবস্থা অতিবাহিত হইতে দিবার নিয়ম, সামন্যত: নানা দোষের আকর হইয়া উঠে। মানুষ বিবাহিত হইলেই প্রকৃত প্রস্তাবে সামাজিক জীব হয়, নচেৎ অনেক উচ্ছৃঙ্খল এবং দুষ্ট ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই সকল বিবেচনা করিয়া প্রাচীন সমাজগুলির ব্যবস্থাপকেরা সামান্যতঃ বিবাহ-প্রতিষেধের পক্ষপাতী ছিলেন না। এবং সেই জন্য প্রাচীন সমাজ মাত্রেই একটী অতি ভয়াবহ দুষ্ট প্রথার প্রবর্ত্তনা হইয়া গিয়াছিল। প্রথাটি এই—পিতা মাতা, সন্তানের প্রাণ বিনাশ করিত।

পিতা মাতা আপনাদিগের সন্তানকে মারিয়াফেলে—এটী বড়ই লোমহর্ষণ ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীতে এমন সমাজ নাই, যে সমাজে সাক্ষাদ্রূপে অথবা পরোক্ষভাবে ঐ কার্য্য না হইয়াছিল, এবং এখনও না হইয়া থাকে। ইউরোপে অনূঢ়াবস্থায় অনেক সন্তান জন্মে। সে গুলিকে মারিয়া ফেলে বলিয়া ঐ খণ্ডের সকল দেশেই "ফৌণ্ডলিং হস্পিটাল" নামে গূঢ়জাবাস সমস্ত সংস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু আবাস গুলির সংখ্যা তত অধিক নহে। এক একটী প্রদেশের মধ্যে এক একটী বই নয়। ঐ প্রদেশীয় সকল গূঢ়জ সন্তান কি ঐ এক আবাসে আনীত হয়, না তথায় স্থান পায়? তদ্ভিন্ন, কেহ মারিয়া

ফেলুক আর নাই ফেলুক, শিশু সন্তান সামান্য যত্নের অভাবে মরে কত? ইংলণ্ডে, প্রতি শতে একুশটী শিশু আঁতুড় ঘরেই মারা যায়। মুসলমানদিগের মধ্যে শিশুদিগকে শান্ত রাখিবার নিমিত্ত আফিমের জল খাওয়াইবার প্রথা প্রচলিত আছে। আফিম, শিশুশরীরের অতিশয় অনুপযোগী বস্তু। কিন্তু গরিব দুঃখী লোককে খাটিয়া খাইতে হয়, ঘরের কাজ কর্ম্ম দেখিতে হয়, ছেলে কাঁদিলে সে কিছুই করিতে পারে না, তাই একটু একটু আফিমের জল মুখে দিয়া রাখে, ছেলে বেশ ঘুমাইয়া থাকে। তবে উহার যে আয়ুঃ শেষ হয়, বাপ মা তাহা জানেই না।

গ্রীক এবং রোমীয় বড় বড় ব্যবস্থাপকেরা এবং পণ্ডিতেরা যথা, সোলন, লাইকর্গস, প্লেটো, আরিষ্টটল, নুমা, সিসিরো প্রভৃতি সকলেই ভ্রূণহত্যার এবং শিশুহত্যার বিধি প্রদান এবং প্রশংসাবাদ করিয়া গিয়াছেন। তবে আরিষ্টটলের মতে শিশুহত্যাটা দোষ, কিন্তু গর্ভধারণের চারি মাসের মধ্যে ভ্রূণহত্যা করা অবৈধ নয়। পক্ষান্তরে, রোমীয় প্রাচীন ব্যবস্থানুসারে তিন বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শিশুহত্যা অবৈধ!

হিন্দু সমাজেও ছেলে মারা ছিল। তবে যেমন অন্যান্য বিষয়ে, তেমনি এ স্থলেও হিন্দু সমাজের পন্থা ভিন্নরূপ। হিন্দুরা যদি ছেলে মারিত, তাহা দেবোদ্দেশে; অধিক ছেলে রাখিব না, দুর্ব্বল ছেলে রাখিব না, পালনে কষ্ট হইবে, সমাজে দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি হইবে, দরিদ্রতা জন্মিবে, এ সকল স্বার্থসম্বন্ধবিশিষ্ট কোন কারণে নয়। আপনাদিগের সুখবৃদ্ধি কিম্বা দুঃখনিবৃত্তির জন্য দুষ্কর্ম্ম করিতে গেলেই তাহার পাপ গুরুতর হয়। সমাজের হিতসাধন মনে করিলে তাহাও স্বার্থসম্বন্ধশূন্য হয় না। এই জন্য দেবতার উদ্দেশে সমাজের হিতসাধন প্রচ্ছন্ন করিয়া হিন্দুর ব্যবস্থা। চীনীয়দিগের মধ্যেও ছেলে মারা আছে। তথায় কোন কোন হ্রদ এবং নদীর ধারে সাইনবোর্ডের ন্যায় প্রস্তর-ফলকে লেখা থাকে,—"এই স্থানে ছেলে ডুবাইয়া মারিবে না।"

এইরূপে সকল সমাজই কতকটা জ্ঞাতসারে এবং কতকটা অজ্ঞাতসারে জন-সংখ্যার সংকোচ চেষ্টা করিয়াছে এবং করিতেছে।

যে প্রাকৃতিক নিয়মের বশীভূত হইয়া ঐরূপ করিতেছে, তৎসম্বন্ধে অনেক দিন গত হইল, একটী ফরাসি ডাক্তারের সহিত আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিলেন—"পৃথিবীতে সুখ অধিক নয়, দুঃখই অধিক। যেখানে সুখ বোধ হয়, সে সুখও ভ্রম-মূলক; প্রকৃত জ্ঞান হইলেই আর সুখবোধ থাকে না। মনে কর, একটা গারদে পাঁচ শত লোক বদ্ধ আছে। তাহাদের খাবার সামগ্রী ঐ পাঁচ শতেরই উপযুক্ত। সেই গারদে প্রতি মাসে পঞ্চাশৎ পঞ্চাশৎ করিয়া নূতন নূতন কয়েদী প্রবিষ্ট করা যাইতে লাগিল, কিন্তু খাবার সামগ্রী উপযুক্ত পরিমাণে বাড়াইয়া দেওয়া গেল না। ঐ কয়েদীদিগের দশা কেমন হয়!—পৃথিবীতে মনুষ্যের, মনুষ্য বলি কেন, জীব মাত্রের, কি সেই দশা নয়?—আর সেই কয়েদী সমূহের বুভুক্ষাজনিত ক্ষিপ্তাবস্থার কুকার্য্য সকল দমন করিয়া রাখিবার উপায়ের নাম কি দণ্ডবিধি নয়?।" আমি বলিলাম—"শুদ্ধ দণ্ডবিধিরই উল্লেখ করিলেন কেন, দানের বিধিও ত আছে।" তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—"দানের নিয়ম আছে বটে. কিন্তু উহা কি?—উহাতে মানুষ প্রকৃতির দোষ নিবারণে যে উন্মুখ, ইহাই প্রমাণিত হয়, কিন্তু মানুষ যে তাহা পারে, ইহার ত প্রমাণ হয় না। কয়েদীদিগের মধ্যে একজন আর একজনকে এক মুঠা ভাত দিল, তাহার প্রাণ বাঁচাইল, কিন্তু গারদের ভিতরে ত ঐ ভাত মুষ্টি বাড়িল না! দানবিধি, ধর্ম্মবিধিই থাকা উচিত—উহাকে সামাজিকবিধি ব্যবস্থার মধ্যে আনিতে নাই।" আমি বলিলাম—"আপনার উপমাটী বেশ চৌচাপটে লাগে বলিয়া বোধ হয় না। পৃথিবী কয়েদির জেলখানাই হউক, আর বিলাসীর আবাস নিকেতনই হউক, আর ধর্ম্মাত্মার কর্ম্মক্ষেত্রই হউক, বাহির হইতে ইহার ভিতরে কিছুই আইসে না। আপনি যাহাদিগকে কয়েদি

বলিলেন, তাহারাই বিলক্ষণ জানিয়া শুনিয়া আপনাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ইহারা যদি ভোগসুখের বৃদ্ধিকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে না করিয়া, ধর্ম্ম বৃদ্ধিকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে, এবং ধর্ম্মের অতি প্রধান অঙ্গ যে ইন্দ্রিয় সংযম, তাহা সম্যক অভ্যস্ত করে, তাহা হইলে সংসারে দুঃখ কষ্ট কম হয়, অত্যাচার এবং পাপাচার কম হয়, দারিদ্র্য যন্ত্রণা কম হয়, পরপীড়ন এবং পরস্বাপহরণ কম হয়, দণ্ডবিধি এবং দানবিধি, উভয়েরই প্রয়োগস্থল কম হয়, অকালমৃত্যু ঘটনা কম হয়, যুদ্ধের প্রয়োজন কম হয়, অস্ত্রবিদ্যার চর্চ্চা কম হয়, এবং মনুষ্য ধর্ম্মচর্য্যায় এবং জ্ঞানচর্য্যায় নিরত হয়। যে সমাজ ইন্দ্রিয় দমন করিতে শিক্ষা দেয়, সেই সমাজই উৎকৃষ্ট।—তোমাদের ফরাসি জাতি বিনা রাজব্যবস্থার সাহায্যে যে স্বদেশে লোকসংখ্যার অযথা বৃদ্ধি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাতে সাংসারিক সচ্ছলতারূপ কতক ফললাভ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি উহারা ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রানুযায়ী হইয়া পবিত্র শিক্ষার প্রভাবে চলিতে পারিত, তাহা হইলেই উহাদিগের প্রকৃত মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি হইত, এবং ফরাসি জাতিই ইউরোপ খণ্ডের সর্ব্বপ্রধান জাতি হইত।"

সামাজিক প্রকৃতি—অধিকার পালন।

সমাজের মধ্যে যত প্রকার বিধি ব্যবস্থা হয়, তাহার একমাত্র মূল জনসংখ্যার সহিত তাহাদিগের উপজীব্যের সামঞ্জস্য বিধান। ঐ কারণ হইতেই স্বত্বের উৎপত্তি, ভূম্যধিকারের নিয়ম, পৈতৃক ধনাধিকার, বৈবাহিক ব্যবস্থা, সন্তান পালনের বিধি এবং দণ্ডবিধি ও দানবিধি। কিন্তু এই সকল বিধি ব্যবস্থা করিয়াও কোন সমাজ সর্ব্বতোভাবে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে না, এবং এক সমাজের লোক অন্য সমাজের অধিকারে প্রবেশ করিতে যায়।

কোন সুচতুর ইংরাজ গ্রন্থকার রুসিয়দিগের সম্বন্ধে একখানি সুন্দর পুস্তক রচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে, কৃষিজীবী বলিয়া উহাদিগের নূতন নূতন কৃষিক্ষেত্রের প্রয়োজন হয়; এই জন্যই রুসিয়রা নিরন্তর আপনাদের ভূম্যধিকার বিস্তৃত করিয়া চলিতেছে। গ্রন্থকার এই কথাটীকে একটী নূতন কথার ন্যায় করিয়া এবং উহা রুসীয়দিগের প্রতিই খাটে, এমত ভাবে লিখিয়াছেন। কিন্তু পাশুপাল্যোপজীবী তাতার জাতীয়দিগের সম্বন্ধেও অবিকল ঐরূপ বলা যায়। তাহাদেরও পশু চারণের নিমিত্ত নূতন নূতন ভূমিখণ্ডের বিশেষ প্রয়োজন হয়; এবং তাতারীয়রাও সেই নিমিত্ত আপনাদের অধিকার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। অপরন্তু বাণিজ্য ব্যবসায়ী জাতীয়েরাও আপনাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি বিক্রয় করিবার স্থান খুঁজিয়া বেড়ান, এবং সেই জন্য পৃথিবীর অতি দূরদেশ সকলেও গিয়া অধিকার এবং উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। প্রকৃত কথা এবং স্থূল কথা এই যে, প্রধান উপজীবিকা যাহাই হউক, সমাজমাত্রেই আপনাপন আয়তন বৃদ্ধি করিয়া লইতে চায়, এবং তজ্জন্য অপরাপর সমাজের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করে।

পরন্তু, সকল সমাজের সংঘর্ষ-প্রবণতা সমান নয়। কোন কোন সমাজ এমন সুব্যবস্থিত এবং ধর্ম্মশাসনে সুশাসিত যে, আপনার নিবাসভূমি অতিক্রম করিয়া গিয়া অন্যের প্রতি উপদ্রব করে না। হিন্দু সমাজ কখন ভারতবর্ষের বহির্ভাগে অধিকার বিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে নাই। কিন্তু চিনীয়েরাই এই বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিতে হয়। উহারা একবার মাত্র তিব্বত, তাতার, আনাম এবং ব্রহ্মদেশে আপনাদিগের প্রাধান্য সংস্থাপনের জন্য বাহির হইয়াছিল, আর কখন স্বদেশের বহির্ভাগে, যদিও প্রয়োজন পড়িলে যুদ্ধ করিতে গিয়াছে, কিন্তু দিগ্বিজয় করিতে নির্গত হয় নাই। উহাদিগের মধ্যে লোকসংখ্যার যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন হয় নাই। এক চীন সাম্রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা সমস্ত পৃথিবীর অধিবাসিসংখ্যার পঞ্চমাংশ। কিন্তু লোক

সংখ্যার বৃদ্ধির ফল এই হইয়াছে যে, দেশের ভিতর কোথাও অনাবাদী ভূমি পড়িয়া নাই—পাহাড়ের শিরোভাগ পর্য্যন্ত উত্তমরূপে কর্ষিত হইয়াছে—অনুর্ব্বর স্থান সকল জলসঞ্চারের দ্বারা শস্যশালী এবং মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে, এবং অন্যান্য সমাজে গবাদি পশুদিগের দ্বারা যে সকল শ্রমসাধ্য কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়, চীন দেশে তৎসমুদায় কার্য্য অধিক পরিমাণে মনুষ্যের দ্বারাই সাধিত হইয়াছে, এবং পশুর পালন বিশিষ্টরূপেই ন্যূন হইয়া গিয়াছে।

ইউরোপখণ্ডে ইহার ঠিক বিপরীত কার্য্য হইয়াছে। বিভিন্ন জাতীয়দিগের শিল্পের এবং বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় যন্ত্রাদির প্রয়োগ এত বৰ্দ্ধিত হইয়াছে যে, মনুষ্যের শ্রম করিবার স্থল অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয়দিগের একটা কলে এক হাজার লোক খাটে—কিন্তু বিশহাজার লোক খাটিয়াও যত কাজ না করিতে পারিত, তত কাজ সম্পন্ন হয়। সুতরাং লোক সকল বেকার হইয়া পড়ে, আপনাদের আহার্য্য সংস্থান করিতে পারে না, এবং ভূরিপরিমাণে স্বদেশ হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীর অপরাপর সমাজের প্রতি আক্রমণ করিয়া বেড়ায়। পৃথিবীর মধ্যে ইউরোপীয়েরাই অতিশয় সংঘর্ষশীল। কিন্তু খাস্ ইউরোপের ভিতর যদিও যুদ্ধাদি ব্যাপারের প্রসঙ্গ অনুক্ষণই হইয়া থাকে, তথাপি ঐ যুদ্ধ গুলি ঠিক সমাজ-সংঘর্ষের লক্ষণাক্রান্ত হয় না, অর্থাৎ ঐ যুদ্ধ গুলি সকল স্থলেই ভূম্যধিকারের হ্রাস বৃদ্ধিতে পরিসমাপ্ত হয় না। তাহার কারণ, ইউরোপখণ্ডের বিভিন্ন জাতীয় জনগণের মধ্যেও এক প্রকার ব্যবস্থা-শাস্ত্র চলে। ঐ শাস্ত্রের মূল কথা, বিভিন্ন রাজ্যের বলসামঞ্জস্য, অর্থাৎ কোন একটী সমাজকে তাহার পার্শ্বস্থ অপর সকল সমাজ অপেক্ষা এমন অতি-প্রবল হইতে না দেওয়া যাহাতে অপরের বিশেষ শঙ্কা জন্মে। কিন্তু কিছুকাল হইতে ইউরোপের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় ঐ ভাব একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন মৌলিক বর্ণসাদৃশ্য লইয়া জাতিসংঘটনের চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। রুসিয়া সকল স্লাভবর্ণের

লোককে, ফরাসিরা সকল লাটিন্ জাতীয়দিগকে, প্রুসিয়া সমুদায় জর্ম্মণ জাতীদিগকে সম্মিলিত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করে। তাহাতে যুদ্ধাবসানে ভূম্যধিকার পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু সেই সকল পরিবর্ত্তে ইউরোপীয় বিভিন্ন সমাজের আপনাপন দলের পোষণ ইচ্ছা মাত্রই বুঝায়।

পৃথিবীর যে যে ভাগে কতকগুলি সম প্রকৃতিক বিভিন্ন রাজ্য এক সময়ে জন্মিয়া থাকে, সেই সেই স্থানেই এক এক প্রকার আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাও জন্মিয়া যায় এবং বিভিন্ন সমাজস্থ লোকদিগের পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপিত করিয়া দেয়। গ্রীসদেশে, রোমের অত্যুৎকট প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে ইটালীতে, ভারতবর্ষে, ঐরূপ আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা জন্মিয়াছিল। নব্য ইউরোপে ঐ ব্যবস্থার অনেক শাখা পল্লব বাহির হইয়া উঠিয়াছে, এবং ইউরোপীয় জাতিদিগের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে ঐ ব্যবস্থাশাস্ত্র লইয়া অনেক তর্ক উপস্থিত হয়। কিন্তু ইউরোপের বহির্ভাগে এবং ইউরোপীয়েতর জাতিদিগের প্রতি ঐ সকল ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োগ হয় না। তবে আজি কালি চীনীয় এবং জাপানীয়দিগের বল বর্দ্ধিত হইয়া অবধি ঐ দুইটী জাতির সহিত ও ইউরোপীয়দিগের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সম্পর্ক দাঁড়াইতেছে। ভূতপূর্ব্ব ব্রহ্মরাজ থীবা ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির সহিত একটা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গছাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ক্ষিপ্রকর্ম্মা ইংরাজ তাঁহাকে উহা করিতে দিলেন না। ফল কথা, আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, এক সমাজের প্রতি অপর সমাজের দৌরাত্ম্য কতকটা নিবারণ করিয়া রাখে।

কতকটা করিতে পারে; যদি পূর্ণমাত্রায় পারিত, তাহা হইলে বিভিন্ন সমাজগুলি আপনাপন অধিকার মধ্যে সুস্থির হইয়া থাকিত, এবং যে যেরূপে যতদূর পারিত, জনসংখ্যার সংকোচ এবং আহার সামগ্রীর সম্বর্দ্ধন করিত। আর সকলেই ধর্ম্মসঙ্গত বাণিজ্য কার্য্যদ্বারা পরস্পরের ভোগ সুখ বৃদ্ধি করিত।

যদি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা প্রণালী পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ হইত, তাহা হইলে ইউরোপীয়েরা যে বাণিজ্য ব্যাপারের সূত্র ধরিয়া পৃথিবীস্থিত অপর সকল

দেশকে উত্তেজিত করিতেছে, তাহা করিতে পারিত না। বাণিজ্য পদার্থটা কি? কোন দ্রব্য আমি চাই, কোন দ্রব্য তুমি চাও, যেটী আমি চাই, তাহা তোমার আছে, যাহা তুমি চাও তাহা আমার আছে, এস দুইজনে বিনিময় করি, উভয়েরই ভোগ সুখ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু ইউরোপের সহিত বাণিজ্য সেরূপ সহজ ব্যাপার নয়। ইউরোপীয় বলে, তুমি চাও আর নাই বা চাও, তোমাকে আমার জিনিস লইতে হইবে, আর আমি যাহা চাই তাহা তোমার স্থানে লইব—এ বন্দোবস্তে সম্মত না হও, যুদ্ধং দেহি। ইউরোপীয় বলে, তুমি ভিন্ন দেশের রাজা, অবশ্য স্বাধীন পুরুষ; কিন্তু তুমি হীনবল আর ইউরোপীয় নও, অতএব অসভ্য; তোমার দেশে আমার যে সকল লোক বাণিজ্য ব্যাপার করিতে আসিয়া থাকিবে, তাহারা কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে, তুমি তাহাদিগের দোষাদোষ বিচার করিতে পাইবে না, সে কর্ম্ম আমার নিয়োজিত কর্ম্মচারীরাই করিবে। আর আমাদের ধর্ম্মপ্রচারকেরা তোমাদের ধর্ম্ম-প্রণালীর এবং সামাজিক রীতি নীতির নিন্দা করিবে এবং তোমাদের লোকসকলকে ভজাইতে থাকিবে। এ সব কেবল গায়ের জোর বই আর কিছুই নয়, সুতরাং ধর্ম্ম্য বিচারের একান্ত বহির্ভূত। এই জন্য সামান্যতঃ সমাজে সমাজে সংঘর্ষ হইয়া কি হয়, তাহার বিচার কোন এক দেশীয় আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাশাস্ত্র হইতে হইবার যো নাই—ইতিবৃত্ত হইতেই সে বিচার করা আবশ্যক।

প্রাচীন মিশরীয়, আসিরীয়, পারসীক প্রভৃতি জাতীয়েরা এক এক সময়ে খুব প্রবল হইয়াছিল। তাহাদিগের রাজারা অথবা সেনাপতিরা অপর দেশ আক্রমণ করিয়া জয় করিত। কিন্তু জয় করিয়া আর কিছু করিত না, তাহাদিগের ধন ধান্যাদি, গো মহিষাদি, রত্ন সুবর্ণাদি লুঠ করিয়া স্বদেশে আনিত। কখন কখন ঐ বিজিত রাজ্যের রাজাদিগকেও বন্দী করিত এবং বিজিতদেশে আপনাদিগের মতানুগামী কোন কোন ব্যক্তিকে রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত করিত এবং

তাঁহার স্থানে বর্ষে বর্ষে কিছু কিছু কর লইত। ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে বিজয় ব্যাপার আরও সরল ছিল। বিজিত রাজ্যের মন্ত্রী, অমাত্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকসকলকে জিজ্ঞাসা করা হইত, যুদ্ধে পরাভূত রাজকুলের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি রাজধর্ম্মপালনের যোগ্য। যিনি যোগ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেন, তাঁহাকেই রাজাসন অর্পিত হইত। বিজেতা কিছু কর গ্রহণ করিতেন, স্থাপিত রাজার সহিত কোন কোন নিয়ম অবধারণ করিতেন——কিন্তু বিজিত রাজ্যের ধর্ম্মপ্রণালী, আচার, ব্যবহার, রীতি নীতি কিছুতেই হস্তার্পণ করিতেন না। তাহা করা হিন্দুর আন্তর্জাতিক শাস্ত্রানুসারে দোষ বলিয়া গণ্য হইত।

এই সকলের পর অতি প্রধান বিজিগীষু লোক রোমীয়রা। ইহারা পররাজ্য জয় করিয়া তাহার উপর কর সংস্থাপন করিয়াই ছাড়িয়া দিত না। বিজিত রাজা এবং রাজপরিবারকে বন্দী করিয়া আপনাদিগের লোকজন দিয়া বিজিত দেশের রাজকার্য্য চালাইত, স্বজাতীয় ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত করিত, আপনাদিগের ব্যবস্থাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিত, এবং বিজিত জনপদের ধর্ম্মব্যবহার কিয়ৎ পরিমাণে আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রণালীর অন্তর্ভূত করিয়া লইত।

রোমীয়দিগের পর মুসলমানেরা বিশিষ্টরূপেই প্রবল হয়। ইহারা যে দেশ জয় করিত, সে দেশের ধর্ম্ম এবং ব্যবস্থাশাস্ত্র উঠাইয়া দিয়া আপনাদিগের ধর্ম্ম এবং ব্যবস্থাশাস্ত্র চালাইত। উহাদিগের ধর্ম্মগ্রহণ ব্যতিরেকে কেহই কোন রাজকার্য্য পাইত না। বিশেষ কারণে মুসলমানদিগের এই নীতি ভারতবর্ষে অনেকটা রূপান্তরিত হইয়াছিল।

মুসলমানদিগের পর নব্য ইউরোপীয় জাতীয়েরা। তন্মধ্যে পূর্ব্বে স্পেনীয়েরা এবং সম্প্রতি ইংরাজেরা প্রধান। স্পেনীয়দিগের প্রণালী অনেক পরিমাণে মুসলমানদিগের সদৃশ। উহারাও বিজিত জনপদবাসীদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিত, দীক্ষা গ্রহণ না করিলে পীড়ন করিত, এবং বিজিত দেশে আপনাদের বিধি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিত। ইহারাও

মুসলমানদিগের স্থায় এক জন যাজক-নরপালের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া বিদেশ জয় করিতে যাইত।

ইংরেজেরা কোন রাজা বা যাজকের কথায় দিগ্বিজয়ে বাহির হয়েন না। ইহাঁরা উপনিবেশ স্থাপন করিতে অথবা বাণিজ্য করিতে বাহির হয়েন। যেথানে উপনিবেশ করেন, সেখানকার আদিম অধিবাসীদিগের সমূলোচ্ছেদ করেন। যেথানে বাণিজ্য করেন, সেথানে শুদ্ধ আপনাদের লাভ ছাড়া আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। যদি বহুজনপূর্ণ মহাদেশ ইহাঁদিগের করতলে আইসে, তাহার ধর্ম্মের প্রতি ইহাঁরা কোন সাক্ষাৎ অত্যাচার করেন না। সে দেশের প্রাচীন ব্যবস্থাদির প্রতিও কোন সাক্ষাৎ ব্যাঘাত করা হয় না। কিন্তু রাজকর্ম্ম সমুদায় আপনাদের হাতেই রাখেন। ইহাঁরা বিজিতদেশ হইতে ধন শোষণ করিতে পাইলেই তুষ্ট। ইংরাজ ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য লাভ করিয়া অবিকল ঐ পথানুবর্ত্তী হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিয়োজিত গবর্ণর ডাল্‌হৌসি সাহেব দেশীয়দিগের সর্ব্বপ্রকার অধিকার নষ্ট করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অনন্তর, যখন সিপাহী বিদ্রোহের পর দেখা গেল যে, এই রাজনীতি ভারতবর্ষের যোগ্য নয়, তখন মহারাজ্ঞী এই সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎকর্ত্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিবার সময় ঘোষণা প্রদান করিলেন যে, ইংরাজ এবং দেশীয় লোক নির্ব্বিশেষে রাজকার্য্য সমর্পণ করিবেন, ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় প্রধান প্রধান লোকদিগকে স্থান দিবেন, এবং ভারতবর্ষীয়দিগের হিতসাধন করাই রাজকার্য্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে, ইহাদিগের কোন অধিকারে হস্তার্পণ করা হইবে না। ইংরাজ কি ভাল বা উচিত, তাহা সামান্যতঃ বিচার করিয়া কাজ করেন না এবং অন্যের পক্ষে কি ভাল কি মন্দ তাহা আদবেই বুঝিতে পারেন না। কিন্তু যেথানে যোগ্যতা দেখেন, সেই থানেই আপনার প্রকৃতি কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারেন এবং যে সকল অনুষ্ঠানে আপনার ভাল হইয়াছে মনে করেন, অন্যের পক্ষেও তাহাতে

ভাল হইবে মনে করিয়া তাহাদের জন্য কিয়ৎপরিমাণে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইংরাজ স্বার্থপর এবং সহানুভূতিশূন্য হউন, কিন্তু তিনি বীরপুরুষ। তিনি সক্ষমের সমাদর করেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

পাশ্চাত্যভাব—ইংরাজসমাগম।

হিন্দু সমাজের প্রকৃতি শান্তি-প্রবণতা, ইংরাজ সমাজের প্রকৃতি ভোগসুখানুসন্ধানে কার্য্যতৎপরতা, হিন্দু সমাজ প্রধানতঃ কৃষ্যুপজীবী, ইংরাজ প্রধানতঃ শিল্প এবং বাণিজ্যোপজীবী, হিন্দু সমাজ মিলিতস্বত্ব এবং মিলিত স্বত্বাধিকার স্বীকার করে, ইংরাজ জ্যেষ্ঠাধিকার মানে এবং পৃথক্ স্বত্বের একান্ত পক্ষপাতী, হিন্দুসমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত, ইংরাজ সমাজে বয়োধিকে বিবাহই নিয়মিত, হিন্দু সামাজিক অন্তঃশাসনের পক্ষপাতী, ইংরাজ অধিকার পালনে রাজশাসনকেই সর্ব্বাঙ্কুশ করিতে উন্মুখ—ভারতবর্ষে এই দুইটী পরস্পর ভিন্নধর্ম্মী সমাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ কার্য্যতৎপর, কার্য্যকুশল, অহঙ্কারী এবং লোভী; হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব এবং সন্তুষ্টচেতা। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ইংরাজের স্থানে হিন্দুকে কার্য্যকুশলতা শিখিতে হয়, আর কিছুই শিখিতে হয় না, প্রত্যুত আর কিছু না শিখিলেই ভাল হয়।

কিন্তু তাহা হয় না। শিক্ষা কার্য্যের সর্ব্বপ্রধান অবলম্বন অনুকরণ। অনুকরণ করিতে গেলে, দোষ এবং গুণ দুইই অনুকৃত হইয়া যায়। তবে দোষের অনুকরণই সহজ। এই জন্য হিন্দু, ইংরাজের স্থানে সাহঙ্কার ব্যবহার শিখিতেছে, এবং আপনার জাতিসুলভ নম্রতা পরিত্যাগ করি-

তেছে। হিন্দুর সন্তুষ্টচিত্ততাও তিরোহিত হইয়া ইংরাজ সাহচর্য্যে লোভ-পারবশ্য জন্মিতেছে। হিন্দুর হৃদয়ে পরার্থজীবনতা যতদূর উঠিয়াছিল, পৃথিবীর অপর কোন জাতির হৃদয়ে উহা তত দূর উঠে নাই, ইংরাজের হৃদয়ে স্বার্থপরতা যেমন বলবান পৃথিবীর আর কোন জাতির হৃদয়ে উহা তত প্রবল নয়। আবার বলি, এরূপ দুইটী সমাজের পরস্পর সংস্রবে হিন্দুর স্বভাবে পরিবর্ত্ত না ঘটিয়া যদি ইংরাজের স্বভাবেই পরিবর্ত্ত ঘটিত, তাহা হইলেই ভাল হইত।

কিন্তু তাহার কোন চিহ্নই এ পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছে না। ক্রমে ক্রমে পরার্থচিন্তা তিরোহিত হইয়া ইংরাজি শিক্ষিত হিন্দুর হৃদয় স্বার্থচিন্তায় সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে। আমি ইংরাজী কলেজে শিক্ষিত কোন যুবাকে বলিতে শুনিয়াছি, "মহাশয়! অমুক কার্য্যটীতে আমার স্বার্থ আছে, তবে আমি ঐ কার্য্যটী করিব না কেন?" * * * "করিবে না এই জন্য যে, ঐ কাজটী করায় পরার্থ নষ্ট হয়" * * * "পরার্থ রক্ষা করিয়া চলায় আমার ইষ্ট কি?" * * * "ঐ পরার্থ রক্ষাই তোমার ইষ্ট" * * * "পরার্থ রক্ষায় পরের ইষ্ট, তাহাতে আমার ইষ্টসিদ্ধি নাই।" বিচার ফুরাইল। বুঝিলাম, এত কাল ধরিয়া পবিত্র শাস্ত্র শিক্ষার মহিমায় হিন্দুর হৃদয়ে যে পরার্থজীবনের ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছিল, সে ভাব ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে এক পুরুষেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে! আর এক দিন একটী নব্য উকীলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কথা প্রসঙ্গে তাঁহারা যে, এক জন অযোগ্য ব্যক্তিকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে একটু তর্ক উপস্থিত হইল। উকীল বাবু স্বীকার করিলেন, যে পাত্রটী অভিনন্দনের যোগ্য নহে। অনন্তর বলিলেন, "আমরা ত সত্য সত্যই তাঁহার প্রতি ভক্তিপ্রণোদিত হইয়া অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতেছি না। উহাঁকে তুষ্ট করিলে আমাদের একটী স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে—তাই এ কার্য্য করিতেছি"। এ স্থলেও বিচার ফুরাইল।

বর্ষ কতিপয় গত হইল, কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব একটী সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। সভাতে ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন এবং ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ দুই প্রকারের লোকই উপস্থিত ছিলেন। একজন সভাসদ প্রস্তাব করিলেন—"সভার কার্য্য-বিবরণ বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত হউক"। অমনি এক জন 'কৃতবিদ্য' গাত্রোত্থান করিয়া ঘৃণাসূচক হাস্য সহকারে ঐ কথার প্রতিবাদ পূর্ব্বক ইংরাজীতে বলিলেন—"বাঙ্গালা ভাষার ব্যবহার প্রবৃত্ত করিলে, দেশটী দুই সহস্র বর্ষ পাছু হইয়া যাইবে"। ভাবিলাম, এখনকার দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ত সম্রাট বিক্রমাদিত্যের সন্নিহিত সময়—সে সময়ে পঁহুছিলে দেশটী পাছু যায় না আগু হয়? কৃতবিদ্য মহাশয়ের অগ্র পশ্চাৎ বোধটী বড় সুপরিষ্ফুট হয় নাই।

কোন জিলায় একটী "কৃতবিদ্য" মুনসিফ হইয়া আসিয়া তথাকার জজ, মাজিষ্ট্রেট, পুলিস সাহেব এবং এঞ্জিনিয়ার সাহেব, সকলেরই বাটী বাটী গিয়া তাঁহাদিগের সম্মান রক্ষা এবং বন্দনা করিয়াছিলেন। কেবল ঐ নগরে যে একটী মহারাজা থাকিতেন, তাঁহার নিকট গমন করেন নাই, প্রত্যুত দেশীয় কোন বড় লোকেরই নিকট গমন করেন নাই। নিজেই অপ্রাসঙ্গিক রূপে ঐ কথার উত্থাপন করিলে, ওরূপ করিলে কেন জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—"রাজা বেটা কি করিতে পারে?—আর দেশীয় লোকে কেই বা কি করিতে পারে"?—"কৃতবিদ্যটীর" সাম্যজ্ঞান এবং সৌজন্য বোধের মূলেই যে কুঠারাঘাত হইয়া গিয়াছে, তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম।

ইংরাজী শিক্ষিত অনেকানেক যুবার মন যে স্বার্থপ্রবণ, বুদ্ধি অগ্র পশ্চাৎ বোধশূন্য, চিত্তবৃত্তি সাম্য এবং সৌজন্য বোধ বিরহিত এবং ব্যবহার অবিনীত হয়, তাহার কারণ কি ভাল করিয়া দেখা আবশ্যক। ইংরাজী শিক্ষিতেরা মুখে যাহাই বলুন, আর মনে মনেও আপনাদের মন না বুঝিতে পারিয়া যাহা ভাবুন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা অপরিসীম ইংরাজভক্ত। তাঁহাদিগের ভক্তিটী মুখের ভক্তি নহে—অন্তরের

অন্তস্তলভাগের ভক্তি। এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। রোম জাতীয় বাগ্মি-প্রধান সিসিরো কোন সময়ে সিলিসিয়া নামক একটী প্রদেশের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত করিয়া রোম নগরে ফিরিয়া গেলে, তাঁহার কোন বিপক্ষ ব্যক্তি সেনেট্ সভায় বলিয়াছিলেন যে, সিসিরো একটা প্রদেশের শাসন কর্তৃত্ব পাইয়া কোন কাজই করিতে পারেন নাই, একটী যুদ্ধও জয় করেন নাই, একটী শত্রুও বিনাশ করেন নাই। সিসিরো তাহার প্রত্যুত্তরে বলেন—"আমি সিলিসিয়া প্রদেশে রোমীয় অধিকার বদ্ধমূল করিয়াছি। আমি যাহা করিয়াছি, তাহাতে ঐ প্রদেশবাসীরা চিরকালের জন্য রোমের দাসানুদাস হইয়া থাকিবে। আমি রোমীয় ভাষা (লাটিন) শিক্ষার নিমিত্ত এক শত চল্লিশটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছি। ঐ সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একেবারে রোমীয় মন্ত্রে দীক্ষিতের ন্যায় হইবে, কখন রোমীয় ভিন্ন অপর কাহাকেও আপনাদের আদর্শস্থলীয় মনে করিতে পারিবে না।" সেনেট সভা সিসিরোর বাক্যগুলির সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছিলেন। অতএব কেবল মাত্র ইংরাজীতে শিক্ষিত হইলে যে, ইংরাজই হিন্দুজাতীয় যুবকদিগের আদর্শ স্থলীয় হইয়া উঠিবে, ইহা সাধারণমনুষ্যস্বভাবসিদ্ধ। কয়েক বর্ষ গত হইল ইংরাজীতে অতি ব্যুৎপন্ন কোন বন্ধুবরের বিরচিত "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নামক একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝিয়াছিলাম যে তখনও লেখকের ইংরাজী কলেজের সকল বিষ নামে নাই। ইংরাজী কলেজের বিষ এই যে, উহা ইংরাজকে আমাদিগের আদর্শস্থলাভিষিক্ত করে। গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা কিরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন? এই মাত্র দেখাইয়াছেন, যে উহা ইংরাজদিগের ধর্ম্মের সহিত মিলে—গ্রন্থকর্ত্তার মনের মানদণ্ড ইংরাজ। অতএব ইংরাজী শিক্ষার ফলে যে, ইংরাজ আমাদিগের আদর্শ পুরুষ হইয়া দাঁড়াইবে, ইহা অবশ্যম্ভাবী বলিলেও বলা যায়। ইংরাজী শিক্ষার এই বিষ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইবার উপায় কিছুই নাই বলিয়াই বোধ হয়। তবে বাল্যকাল হইতে যদি ইংরাজীর সহিত সংস্কৃতেরও শিক্ষা হয়, তাহা

হইলে কতকটা বিষ কম লাগিতেও পারে। আমি দেখিয়াছি আজি কালি কোন কোন সুবোধ ব্যক্তি আপনাদিগের পুত্র কন্যার শিক্ষায় ঐ পথ অবলম্বন করিতেছেন—উহাদিগকে ইংরাজী পড়াইবার পূর্ব্ব হইতে কিছু কিছু সংস্কৃত পড়াইয়া লয়েন, এবং সংস্কৃতের চর্চ্চা ইংরাজী শিক্ষার সহিত বরাবর প্রচলৎ রাখেন।

আর এক প্রণালী অবলম্বন করিতে পারিলেও ইংরাজের প্রতি অযথা ভক্তি কিছু কম হইতে পারে। ইংরাজ তাঁহার বৈজ্ঞানিক উন্নতির অন্যূন বার আনা ভাগ অপরাপর জাতীয়দিগের স্থানে পাইয়াছেন। তাঁহার বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ জর্ম্মেণি হইতে, তাঁহার বৈদ্যুতিক আলোক আমেরিকা হইতে, তাঁহার সামরিক উপকরণ ফ্রান্স হইতে, তাঁহার মুদ্রাযন্ত্র হলণ্ড হইতে,—এইরূপ প্রধান প্রধান সকল যন্ত্র তন্ত্র অস্ত্র শস্ত্রাদি, ইংরাজ অন্যের স্থানে পাইয়াছেন। কিন্তু তাহা পাইয়াছেন বলিয়া যে, ঐ সকল জাতির কিছুমাত্র গৌরব করেন, তাহা নহে। আমরা যদি ঐ পথ অবলম্বন করিতে পারি, অর্থাৎ ইংরাজ এবং অপরাপর জাতির স্থানে যন্ত্রাদির নির্ম্মাণ কৌশল এবং প্রয়োগ বিধান শিখিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে অনেকটা অযথা ভক্তির হ্রাস হয়। এই জন্য হ্রাস হয় যে, যন্ত্রাদি প্রয়োগ এত বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ থাকে না, প্রত্যুত অতি স্থূল ব্যাপার বলিয়াই প্রতীত হয়, এবং তাহা হইলেই বাহ্য চৈক্কণ্যে এবং বাহ্য উন্নতিতে এতটা মোহ জন্মে না। মনুষ্যের দুইটী কর্ম্ম আছে—বাহ্য জগৎকে জয় করা আর অন্তর্জগৎকে জয় করা; সে দুইটী কার্য্যের মধ্যে যাহা ইংরাজেরা করিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ বাহ্য জগতের উপর কতকটা প্রাধান্য লাভ, তাহা আমাদের শাস্ত্রকারেরা যে বিষয়ে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তদপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ বিষয়। এই প্রকৃত তথ্যের জ্ঞানোদয় হইলেই আর ইংরাজের অনুকরণেচ্ছা অতি প্রবলা হইতে পারে না, ইংরাজ আর আদর্শস্থলীয় থাকে না, এবং তাহার রীতি চরিত্রের সংসর্গদোষে ভোগসুখেচ্ছা বর্দ্ধিত হইয়া জনগণকে স্বার্থপর করিয়া তুলে না। চিনীয় এবং

জাপানীয়েরা ইউরোপীয়দিগের স্থানে কল কৌশল এবং অস্ত্র শস্ত্রাদির নির্ম্মাণপ্রণালী শিক্ষা করিতেছে, কিন্তু ইউরোপকে আপনাদের আদর্শ-স্থলীয় মনে করে না। আমরা ইংরাজ রীতির প্রতি অতি ভক্তিমান হইয়াছি, এবং ভারতবর্ষকে কিরূপে ইংলণ্ড করিয়া তুলিব তাহা ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি বটে, কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রবিদেরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে, ইউরোপ নিতান্ত অসুখময় হইয়া উঠিয়াছে, ওখানে একটা অতি ভয়ানক সমাজবিপ্লব অবশ্যই ঘটিবে। সেই বিপ্লব নিবারণার্থ কোম্‌টী হিন্দু সমাজের ন্যায় যাজকপ্রধান সমাজ সংঘটনের পরামর্শ দিয়াছেন, আর সোপেন্‌হৌর্‌ ভারতবর্ষীয়দিগকেই ইউরোপের আদর্শস্থলীয় করিতে চাহিয়াছেন।

কিন্তু ঐ সকল মহামহোপাধ্যায় দার্শনিকমহোদয়দিগের কথা যেরূপ, সাধারণ ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তৃবর্গের কথা সেরূপ নহে। উহারা ইংরাজ মাহাত্ম্য কীর্ত্তনেই শতমুখ—উহারা ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই বলিতেছে, ইংরাজ তাহাদিগকে কত কি শিখাইয়া মানুষ করিয়া তুলিতেছে, এবং ইংরাজপ্রবর্ত্তিত পাশ্চাত্য মহান্‌ ভাব সকলের প্রভাবে ভারতবর্ষ উন্নত হইয়া উঠিতেছে। দেশীয় "কৃতবিদ্যেরা"ও ঐ সকল কথা কণ্ঠস্থ করিতেছেন, এবং আপনাদিগকেই পাশ্চাত্যভাবের অধিকারী জানিয়া সেই সকল ভাবের ভাবে একান্ত গদগদ হইতেছেন।

কোন ব্যক্তি আমার সম্বন্ধে একটী আত্মীয়ের নিকট বলিয়াছিলেন— "কি আশ্চর্য্য গো! লোকটার মস্তিষ্কে একটাও পাশ্চাত্যভাব প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না"—

আমি স্বয়ং যত দূর ভাবিয়া বা অন্যের সহিত কথোপকথন করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে পাশ্চাত্য ভাব গুলির সকলই এদেশে সম্পূর্ণ নূতন কি পুরাতনেরই বেশ পরিবর্ত্তন মাত্র, এবং উহারা স্বতঃই কতদূর উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট, আমাদের সমাজের উপকার বা অপকার করিবার যোগ্য, জাগতিক নিয়মাবলীর সহিত কত দূর সংশ্লিষ্ট বা অসংশ্লিষ্ট, এই সকল বিষয়

প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিবার বিশিষ্ট প্রয়োজনই আছে বলিয়া মনে করি। পাশ্চাত্যভাব বলিয়া যে গুলির উল্লেখ হয়, তাহা নিম্নবর্ত্তী পদার্থের মধ্যে কোনটী না কোনটী হইয়া থাকে, যথা,—

(১) স্বার্থপরতা (২) উন্নতিশীলতা (৩) সাম্য (৪) ঐহিকতা (৫) স্বাতন্ত্রিকতা (৬) বৈজ্ঞানিকতা (৭) শাসনকর্ত্তার সমাজ-প্রতিভূত্ব।

পাশ্চাত্যভাব—স্বার্থপরতা।

অহং জ্ঞানটী সকল সংজ্ঞার মূলে অবস্থিত। কীটাণু হইতে মহর্ষি পর্য্যন্ত যাহার সংজ্ঞা মাত্র আছে, তাহারই আত্মবোধও আছে। শাস্ত্রে বলিয়াছে যে, আত্মজ্ঞানটী "প্রতিবোধবিদিত" অর্থাৎ সকল বোধের সহিত সম্মিষ্ট। কিন্তু অহং জ্ঞানটী যেমন মৌলিক বস্তু "নাহং" জ্ঞানটীও তেমনি মৌলিক। বস্তুতঃ ঐ তুইটী বোধ পরস্পর সাপেক্ষ। উহাদিগের মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ ভাব আছে বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। নাহং বোধ ব্যতিরেকে অহং বোধ হয় না, আর অহং জ্ঞান না জন্মিলেও নাহং বোধ হইতে পারে না। উহারা যমজ প্রায়। এই জন্য আর্য্য শাস্ত্রকারেরা স্বার্থে এবং পরার্থে অভেদ বুদ্ধি করিবার নিমিত্ত বার বার ভূরি ভূরি যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। আমি কি এবং আমি কি নই, কিছু দূর পর্য্যন্ত এই বিচার লইয়া গেলেই দেখা যায় যে, অহং এবং মমতার ভাব ক্রমশঃই অতিব্যাপক হইয়া, অবস্থা, শিক্ষা এবং সংস্কার গুণে সমুদায়কেই আমি এবং আমার করিয়া দেয়, স্বার্থে এবং পরার্থে ভেদ রাখিতে দেয় না, এবং যাহা পরার্থ নয় তাহাতেও আর স্বার্থ বোধ থাকে না। কিন্তু ঐ অত্যুচ্চ শাস্ত্রীয় বিচার ছাড়িয়া দিয়াও দেখা যায় যে, অজ্ঞানান্ধ শিশুর স্বার্থ যেমন সংকুচিত পদার্থ

বয়োধিকের স্বার্থ তেমন ক্ষুদ্র বস্তু নহে; এবং যাহার জ্ঞান যেমন অধিক তাহার স্বার্থও তেমনি সুবিস্তৃত হয়। তদ্ভিন্ন, প্রায় সর্ব্ব স্থানেই দেখা যায়, যে মানুষ যখন আপনার সুখ, গৌরব এবং ঐশ্বর্য্যানুসন্ধানে বড় নিবিষ্টচিত্ত, তখনও আপনাকে অন্যের চক্ষুতেই দেখিয়া থাকে। ঐশ্বর্য্য এবং গৌরব অন্যের চক্ষুতে না দেখিতে পারিলে কিছুই থাকে না, সুখেরও ভোগ অন্যের সহানুভূতি হইতেই অধিক পাইতে হয়।

হিন্দুর স্বার্থ অতি সুবিস্তৃত বস্তু। হিন্দু জানেন "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" হিন্দু জানেন "সর্ব্বভূতময়োহি সঃ।" হিন্দু প্রধানতঃ বৈদান্তিক, অতএব একাত্মবাদী। হিন্দুর আত্ম পর নাই। ইংরাজের স্বার্থ বড়ই সংকীর্ণ পদার্থ—ইংরাজের বিষয়জ্ঞতা অধিক, ইংরাজ নানা দিগ্দেশে গমন করেন, নানা প্রকার সমাজ দেখেন, বিবিধ অবস্থায় অবস্থাপিত হয়েন, কিন্তু তিনি যেমন আপনার রীতি, নীতি, পদ্ধতিতে একান্ত দৃঢ়-সম্বদ্ধ, এমন আর কোন জাতি নয়। তিনি নিজেও কাহার হইতে পারেন না, কাহাকেও আপনার করিতে পারেন না।

ফরাসি পণ্ডিত নিজ শিষ্যমণ্ডলীকে নীতি শিখাইলেন—"পরার্থে জীবন যাপন করিবে"। ইংরাজ দার্শনিক ঐ কথার খুঁত ধরিয়া বলিলেন "আত্মার্থে জীবন ধারণ না করিলে জীবন থাকে কৈ?—অতএব আত্মার্থেই জীবন ধারণ করিবে"। ফরাসি পণ্ডিতের তাৎপর্য্য এই—"এরূপ করিয়া জীবন ধারণ করিবে, জীবনের সমস্ত কার্য্যাই যেন পরের উপকারে আইসে; যাহাতে পরের উপকার তাহাতেই আপনার প্রকৃত উপকার।" কিন্তু ইংরাজ দার্শনিক ও সকল তাৎপর্য্য ভাবিয়া বুঝিতে অক্ষম। ইংরাজ জন্মগুণেই স্বার্থবাদী।

কিন্তু ইংরাজের স্বার্থপরতায় একটী অদ্ভুত বৈচিত্র আছে; এবং সেই জন্য, অজ্ঞানকৃত পাপের ন্যায় অনেক স্থলেই স্বার্থপরতার সকল দোষ ইংরাজকে স্পর্শ করে না। সে বৈচিত্র্যটী এই। ইংরাজের স্বার্থবোধ অতি গাঢ়তম তমোগুণে আচ্ছন্ন; তাঁহার মনের যাবতীয় ভাব

ঐ স্বার্থবোধে নিমজ্জিত। যেটীতে তাঁহার স্বার্থ, সেটী তাঁহার মনে চিরকাল ধর্ম্ম জ্ঞানের অবিরোধীরূপেই প্রতীয়মান হয়। এই ঘোর স্বার্থপরতার প্রভাবে, ইংরাজ একেবারেই সহানুভূতি শূন্য। তিনি বুঝিতেই পারেন না যে, যাহাতে তাঁহার স্বার্থ, সেটী কেমন করিয়া ধর্ম্মব্যাঘাতক অথবা অপরের অনিষ্টজনক হইতে পারে। তিনি যাহাতে সুখী সমুদায় জগৎ তাহাতেই সুখী নয় কেন?—এইরূপ একটী বালসুলভ মোহময় ভাব ইংরাজের মনে বিরাজমান। যাঁহারা ইংরাজের ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই কথাগুলির ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই। তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, ইংরাজ যতক্ষণ উপকার বা সাহায্য প্রাপ্ত হয়েন, ততক্ষণই খুব ভাল বাসেন, আর যেই উপকার প্রাপ্তি থামিয়া গেল মনে করেন, অমনি পূর্ব্বোপকৃতি স্মরণ করিতে অশক্ত হইয়া পড়েন। ইংরাজের ইতিহাসে ঐ স্বার্থপরতার এবং কৃতোপকারবিস্মৃতির অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু সে সকল কথার বিশেষ উল্লেখ না করিয়া ইংরাজের যে প্রগাঢ় অন্ধতমসাচ্ছন্ন স্বার্থবোধের উল্লেখ করিয়াছি, তাহারই দুই একটী উদাহরণ দিব।

১৮১৫ অব্দ হইতে গ্রীক জাতীয় লোকের অধ্যুষিত আইওনীয় দ্বীপপুঞ্জ ইংরাজের অধীন ছিল। পরে ১৮৩০ অব্দের পর গ্রীসদেশ স্বাধীন হইয়া উঠিলে আইওনীয় দ্বীপনিবাসী গ্রীকজাতীয় লোকেরাও গ্রীসের সহিত সম্মিলিত হইতে ইচ্ছা করিল। ইংরাজ ওরূপ ইচ্ছার হেতু বুঝিতেই পারিলেন না। তিনি বলিলেন "আমার অধীনতা ত্যাগ করিতে চাহিবে কেন?—এত সুখ আর কোথায় পাইবে?" ইংরাজ বলেন, "আফ্‌গান জাতীয়রা আমাকে ভাল বাসে। আমি তাহাদের দেশে প্রবেশ করিয়া অনেক উপদ্রব করিয়াছি বটে, এবং উহারাও আমার অনেক লোক জনকে যুদ্ধ করিয়া এবং প্রতারণা করিয়া হত্যা করিয়াছে বটে, কিন্তু আফগান তবু আমাকে ভাল বাসে। আমার গুণ কত! আর কেহ কি আমার সঙ্গে তুলনার যোগ্য!"

ইংরাজ বলেন, ব্রহ্ম দেশীয়রা আমাকে পাইবার জন্য ঊর্দ্ধ-বাহু হইয়াছিল। যাই ব্রহ্মরাজ থীবা পদচ্যুত হইল, আর উহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। বর্ম্মিদিগের মধ্যে যাহারা আমাকে চায় না, তাহারা বিদ্রোহী, দস্যু, ডাকাইত! অপরাপর লোকে ইংরাজের ঐ সকল কথাকে ভণ্ডতা মনে করিতে পারেন, এবং রাজনীতিজ্ঞ বড় লোকদিগের পক্ষে এবং হৃদয়বান ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ওগুলি ধূর্ত্তপণাই বটে, কিন্তু ইংরাজ জাতি সাধারণ যদি একান্ত স্বার্থ-বিমুগ্ধ না হইত, তবে রাজনৈতিক কৌটিল্যও ঐ পথ অবলম্বন করিত না। ফরাসিরা আলজিরিয়া এবং টুনিস্ প্রদেশ মুসলমানদিগের স্থানে লইয়াছে। রুসিয়রাও মধ্য আসিয়া খণ্ডে তুর্কমানদিগের স্থানে অনেক ভূমি অধিকার করিয়াছে। কিন্তু ঐ দুই জাতীয় লোকের রাজনৈতিকেরাও বলিয়া বেড়ান না, যে মুসলমানেরা এবং তুর্কিরা আমাদিগকে পাইবার নিমিত্ত বড়ই আগ্রহান্বিত ছিল এবং আমাদিগকে পাইয়া চরিতার্থ হইয়াছে।

ইংরাজ সত্য সত্যই মনে করেন যে, যে সৌভাগ্যক্রমে একবার তাঁহাকে পাইয়াছে, সে আর তাঁহাকে ছাড়িতে চায় না। ইংরাজের হৃদয় স্বার্থপরতায় পূর্ণ; উহাতে অপরের হইয়া চিন্তা করিবার এক-টুকুও স্থল নাই। ইতিহাসে ইংরাজের একটা অস্বার্থপর কার্য্যের উল্লেখ আছে এবং ইংরাজ গ্রন্থকারেরা সর্ব্বদাই সেই কার্য্যটির ব্যাখ্যা বাহির করিয়া থাকেন। ১৮৩২ অব্দে ইংরাজ নিজ ঘর হইতে দুই কোটী টাকা খরচ করিয়া ওয়েষ্ট ইণ্ডিসের কাফ্রিজাতীয় লোকগুলির দাসত্ব মোচন করিয়াছিলেন। কাজটি খুব উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ কাজটির প্রবর্ত্তক ইংরাজ নহেন। ১৮২২ অব্দ হইতে ব্রেজিল দেশে কাফ্রি জাতীয় দাসদিগকে মুক্ত করিয়া দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সেই অবধি প্রতি বর্ষে তথায় রাজস্বের ষষ্ঠাংশ ঐ কার্য্যে ব্যয়িত হইতেছে এবং ১৮৯২ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য চলিলে দাসত্বমোচন সম্পূর্ণরূপে সমাধা হইবে। কিন্তু ব্রেজিল সাম্রাজ্যে ঐ মহৎ কার্য্যের আরম্ভ

হইয়াছিল বলিয়া যে, ইংরাজকৃত কার্য্যটীর মাহাত্ম্য নাই, একথা বলা যায় না। কিন্তু তিনি যে টাকা খরচ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ঘর হইতে বাহিরে অধিক যায় নাই, অর্থাৎ স্বজাতীয় চিনি-করদিগের হাতেই গিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্যও কাজটীর মাহাত্ম্য একেবারে কমে না। ইংরাজ আমেরিকায় অপদস্থ হইয়া অবধি আপনার ঔপনিবেশিকদিগের প্রতি যে যত্ন করিতে শিখিয়াছেন, উল্লিখিত দাসমোচন কার্য্যটী তাহারই একটী অঙ্গ বলিয়া অবশ্য ধর্ত্তব্য হইতে পারে।

আর দৃষ্টান্ত বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। দেখা গেল যে, ইংরাজের স্বার্থপরতা অতি ঘোর তমোগুণে একান্ত সমাচ্ছন্ন। হিন্দুর হৃদয়ে কি ওরূপ তমোগুণের প্রাবল্য জন্মিতে পারে? হিন্দুজাতির সহজাত গুণ পরচিত্তজ্ঞতা এবং পরের ইষ্টানিষ্ট বোধ। হিন্দুর মন কোন সময়েই সম্যক্ বিমূঢ়তা চায় না। হিন্দু মৃত্যুও সজ্ঞানে হয়, ইহার প্রার্থী। আমি জানি, কোন ব্যক্তির অস্ত্র চিকিৎসার প্রয়োজন হইলে ডাক্তার সাহেব তাঁহাকে ক্লোরোফরম্ শুঁকাইয়া অজ্ঞান করিয়া অস্ত্র চিকিৎসা করিতে চাহিয়াছিলেন। পীড়িত ব্যক্তি বলিলেন "সাহেব! যদি কাটা ছেঁড়া করিতে করিতে মরিয়া যাই।" সাহেব উত্তর করিলেন—"মরণ যাতনাও জানিতে পারিবে না" * * রোগী বলিল—"তাহাতে আমার কোন লাভ নাই—আমি সজ্ঞানে মরিতে চাই—তুমি অস্ত্র চালাও আমি সহ্য করিব—আমি অজ্ঞানাবস্থায় মরিব না"। অস্ত্র চিকিৎসা সজ্ঞানেই হইল; একবারও কাতরতার চিহ্ন প্রকটিত হইল না। দেখিলাম, বাঙ্গালীর মধ্যেও রেগুলস্ আছেন। কথা হইতেছে এই যে, হিন্দুর একান্ত জ্ঞানলোলুপ হৃদয়ে কি ইংরাজের ন্যায় অশেষ স্বার্থপরতার স্থান হইতে পারে? কখনই পারে না। সুতরাং ইংরাজ সংসর্গে, যদি হিন্দুর স্বার্থপরতা বর্দ্ধিত হয়, তবে সে স্বার্থপরতা ইংরাজের স্বার্থপরতার ন্যায় একান্ত অন্ধ হইবে না। হিন্দু স্বার্থপর হইলে, জেনে শুনেই স্বার্থপর হইবেন। তাঁহার পাপ, জ্ঞানকৃত পাপ হইবে। অজ্ঞানকৃত পাপের

প্রায়শ্চিত্ত আছে, জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই—উহার অবশ্যম্ভাবি ফল অধঃপতন। অতএব ইংরাজের ন্যায় স্বার্থপর হইয়া কাজ নাই। ওরূপ স্বার্থপরতা আমাদের স্বভাবের বিপরীত। হিন্দু যদি ইংরাজের ন্যায় স্বজাতিবৎসল, স্বজাতিপক্ষপাতী, স্বজাতিগুণগ্রাহী, স্বজাতিদোষ প্রচ্ছাদক হইয়া উঠেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।

পাশ্চাত্যভাব—উন্নতিশীলতা।

নব্য ইউরোপীয়েরা বলেন, মনুষ্য উন্নতিশীল। পশু পক্ষ্যাদি পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও প্রায় তেমনি আছে। তাহাদিগের কাহার আকারগত, আবাসগত, উপভোগগত কোন একটী বিষয়েও পূর্ব্বাপেক্ষায় বিশেষ উৎকর্ষ হয় নাই, মনুষ্যের তাহা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, মানুষ ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতেছে ও করিবে এবং এখনও যে সকল কাজ মানুষের অসাধ্য হইয়া আছে, কালে সে সকল কাজও সুসিদ্ধ হইয়া উঠিবে।

এইরূপে মনুষ্যজাতি সাধারণের ক্রমোৎকর্ষের কথা বলিয়া ইউরোপীয়েরা বলেন যে, আমরাই পৃথিবীর অপর সকল মনুষ্য জাতি অপেক্ষায় অধিক উন্নতিশীল;—অর্থাৎ মনুষ্য, পশু পক্ষ্যাদি হইতে যে গুণে বড়, আমরা অপর সকল মনুষ্য হইতে সেই গুণেই বড়। সুতরাং, অপর কাহাকেও উন্নতি শীল বলিয়া ধরা যাইতে পারে না।

নব্য ইউরোপীয়দিগের এই মতবাদের পৃষ্ঠ পূরক স্বরূপ, যদি কতকগুলি বাহ্য বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, এবং বার্ত্তাশাস্ত্রিক, কথার উল্লেখ না হইত, তাহা হইলে উহাঁদিগের এই মতবাদের বিচার করিবার প্রয়োজন হইত না। গ্রীক্ এবং ভারতবর্ষীয় এবং চিনীয় প্রভৃতি জাতীয়েরা যেমন অপর সকল লোককে "বর্ব্বর" "ম্লেচ্ছ" এবং "প্রান্তবাসী অন্ত্যজ" বলিয়া গালি দিয়াছেন, ইউরোপীয়দিগের "অনুন্নতিশীল" শব্দটীও সেইরূপ,

অপর জাতিদিগের প্রতি গালি দান বলিয়াই ধরা যাইতে পারিত। কিন্তু বিজ্ঞানবাদী ইউরোপীয় শুদ্ধ গালি দান করিয়া নিবৃত্ত হয়েন না; তিনি যাহা বলেন তাহার প্রমাণার্থ যুক্তি প্রদর্শনও করিতে চেষ্টা করেন।

সুতরাং সেই যুক্তিগুলির বিচার করা আবশ্যক। ইউরোপীয় বাহ্য-বিজ্ঞান শাস্ত্রের আধুনিক প্রচলিত মত পরিণাম-বাদ। পরিণামবাদ বলেন যে, কি সজীব, কি নির্জীব সকল প্রকার পদার্থই আপনাপন পরিবৃতির প্রভাবে নিরন্তর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া রূপান্তর ও গুণান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। প্রাণি শরীরেও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন সাধন হইয়া এক প্রকার শরীর অন্য প্রকার হইয়া উঠিতেছে। বাহ্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের এই প্রচলিত মতবাদটীকে অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত করা হয় যে, পূর্ব্বকালের নিকৃষ্ট দেহসম্পন্ন মনুষ্য হইতে এখনকার উৎকৃষ্ট দেহ সম্পন্ন মনুষ্যগণ জন্মিয়াছে। এই কথার প্রমাণ স্বরূপ একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যথা, যে সকল মনুষ্য বহু পূর্ব্বগত "প্রস্তর যুগে" জন্মগ্রহণ করিয়া ভূগর্ভ বা পর্ব্বত গহ্বর মধ্যে বাস করিত, তাহাদিগের মৃত শরীরের কঙ্কাল দেখিয়া নিশ্চিত হইয়াছে যে, উহারা এখনকার ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা খর্ব্বকায়, দুর্ব্বলাস্থি, এবং ক্ষুদ্রতর করোটি বিশিষ্ট ছিল। সুতরাং উহারা বলবীর্য্যে, আয়ুষ্মত্তায় এবং বুদ্ধিমত্তায় হীন ছিল।

কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত সমীচীন হয় নাই। বিজ্ঞান শাস্ত্র, উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। বিজ্ঞান বলেন, যাহার যেরূপ পরিবৃতি সে ক্রমশঃ সেই পরিবৃতির যোগ্য হইয়া আইসে। পরিবর্ত্ত হইলেই যে উৎকর্ষ হয়, এমন কথা বিজ্ঞানে নাই। দ্বিতীয়তঃ যে প্রকার খর্ব্বকায়, দুর্ব্বলাস্থি এবং ক্ষুদ্র করোটি বিশিষ্ট মনুষ্যের কঙ্কাল প্রস্তর যুগের বলিয়া পাওয়া যায়, অবিকল সেইরূপ আকার প্রকারের মনুষ্য এখনও পৃথিবীর সর্ব্বত্রে আছে। তৃতীয়তঃ অতি বৃহৎ-শরীর ইউরোপীয়ের অপেক্ষাও বৃহত্তর শরীরের কঙ্কাল অতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ও কোথাও কোথাও পাওয়া

গিয়াছে। চতুর্থতঃ পর্য্যটকেরা বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর কোন কোন ভাগে ইউরোপীয়দিগের হইতেও বৃহত্তর শরীর সম্পন্ন লোক সকল এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব মনুষ্য শরীরের ক্রমোৎকর্ষ-শীলতার যে বৈজ্ঞানিক মূল বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে করা হয়, সেরূপ কোন বৈজ্ঞানিক মূলই বাহির হয় নাই। প্রত্যুত অতি ঘোর পরিণামবাদী একজন ইউরোপীয় দার্শনিক ইহার বিপরীতমতবাদই খ্যাপন করিয়াছেন। তাঁহার কথার তাৎপর্য্য এইরূপ।—"অপরাপর প্রাণি শরীর যেরূপে পরিণত হইয়া কাহার কশেরুর সংখ্যার বৃদ্ধি, কাহার বা কশেরুর দীর্ঘতা বৃদ্ধি, কাহার বা এক-সফক্ত গিয়া দ্বি সফক্ত, কাহার বা অঙ্গুলির উদ্গম, কাহার বা দন্ত লোমাদির বিলোপ, কাহারবা পক্ষোদ্গম, কাহার বা চর্ম্মাবরণ হইতে শল্ক-সম্ভূতি ইত্যাদি ইত্যাদি পরিণতি ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত জীবের সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহাই হউক, কিন্তু ঐ দেহ প্রাপ্তির পর হইতে আর তেমন কিছু হয়ও নাই, হইতে পারেও না। কারণ মনুষ্যের মস্তিষ্ক বৃদ্ধি এবং তজ্জনিত বুদ্ধির প্রাখর্য্য, এতদূর জন্মিয়া গিয়াছে যে, পরিণতির পথ ঐ দিকেই অর্থাৎ মস্তিষ্কের অন্তশ্চক্রের বৃদ্ধির দ্বারা বুদ্ধি সম্বর্দ্ধনের দিকেই, উন্মুক্ত হইয়াছে; সুতরাং দেহের পরিণতি সম্বন্ধে একেবারে বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে।" অতএব অতি ঘোর পরিণাম বাদীও বলিতে পারেন না যে মস্তিষ্কভাগ ভিন্ন মনুষ্য শরীর উৎকর্ষলাভ করিয়াছে বা করিতে পারে। যত দিন যায়, মনুষ্য ততই শারিরীক উৎকর্ষ-লাভ করে এরূপ কোন নিয়ম বিজ্ঞানে নাই।

ক্রমোৎকর্ষের কোন ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন বটে, যে নব্য ইউরোপীয়েরা প্রাচীন মিসরীয়, পারশীক, গ্রীক এবং রোমীয়দিগের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সর্ব্ব বিষয়ে উৎকর্ষলাভ করিয়াছেন। কিন্তু বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিলে ওরূপ কোন কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথমে ধর

শারীরিক বলবীর্য্য;—সে সম্বন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে, যে, ঐ সকল প্রাচীন জাতীয়দিগের সৈনিকেরা অতি গুরুভার বর্ম্ম এবং অস্ত্রাদি ধারণ করিত এবং প্রয়োজন উপস্থিত হইলে প্রত্যহ বিশ পঁচিশ ক্রোশ পথ চলিতে পারিত। নব্য ইউরোপীয় সৈনিকেরাও উহা অপেক্ষা অধিক পারে না। নব্য ভারতবর্ষীয় সৈনিকেরাও তাহাই পারে। অথচ এখনকার ভারতবর্ষীয়েরা আপনাদিগকে পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা বলবীর্য্যে উৎকৃষ্টতর বলিয়া মনে করেন না। কখন শুনা যায় নাই যে, ইংরাজের গোরা ফৌজ, সিপাহীদিগের অপেক্ষা অধিক বেগে বা অধিক দূর পর্য্যন্ত গিয়া সিপাহীদিগকে পাছু ফেলিয়াছে। সেনাপতি লেক্ সাহেব কোন সময়ে বড়ই দৌড়কুচ করিয়াছিলেন—গোরা এবং সিপাহী বরাবর এক সঙ্গে গিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ অঙ্গ-সৌষ্ঠব;—সে বিষয়েও বলিতে পারা যায় যে, প্রাচীন জাতীয়দিগের অপেক্ষা নব্য ইউরোপীয়েরা কিছুমাত্র উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন তাহার প্রমাণ নাই। প্রত্যুত যদি গ্রীক্ জাতীয়দিগের চিত্রপট এবং ভাস্করীয় মূর্ত্তি তজ্জাতীয় লোক সকলের শরীরাদর্শ হইতে জন্মিয়াছে মনে করা যায়, এবং তাহা করাই ন্যায্য, তাহা হইলে নব্য ইউরোপীয়েরা প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের অপেক্ষা অঙ্গসৌষ্ঠবে কমিয়াছেন বই বাড়েন নাই। তাহার পর বুদ্ধিমত্তার কথা;—সে বিষয়ে তুলনা করিতে গেলে মনে রাখা আবশ্যক যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় যন্ত্রাদি নির্ম্মাণে; সমাজ সংঘটনে; গ্রন্থাদি বিরচনে এবং অন্যান্য প্রকারে প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট রচনাই বুদ্ধিমত্তার স্থায়ী এবং উচ্চতম আদর্শ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন দার্শনিক, কবি, ঐতিহাসিক প্রভৃতির রচনা প্রণালী এত উৎকৃষ্ট যে নব্য লেখক মাত্রের আদর্শ হইবার যোগ্য এবং তাহাই হইয়া আছে। অনন্তর ধর্ম্মজ্ঞানের বিষয়;—এই বিষয়ে একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক তন্ন তন্ন করিয়া বিচার পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বকালের লোকদিগের অপেক্ষা এখনকার লোকেরা কিছুমাত্র উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে পারেন না।

তখনকার লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ পর্ব্বত চূড়ার ন্যায় এত উচ্চ হইয়া উঠিতেন যে, এখনকার অত্যুচ্চ ব্যক্তিরাও তাহাদিগের সমকক্ষরূপে গণ্য নহেন। তখনকার শিক্ষা সর্ব্বাঙ্গীন হইত, এখনকার শিক্ষা ঐকদেশিক হইয়া পড়িয়াছে। সাধারণ লোকের মধ্যে সামান্য একটু শিক্ষার বাহুল্য হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে উহাদিগের স্বভাবের উন্নতি বা ধর্ম্মের বৃদ্ধি কিছুই হয় নাই।

অতএব কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কেহই দেখান না যে নব্য ইউরোপীয়েরা মনুষ্যজাতির যেরূপ ক্রমোৎকর্ষের কথা বলেন সেরূপ ক্রমোৎকর্ষের কোন নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। এক্ষণে সমাজতত্ত্ব, অথবা ইউরোপীয় মতে, সমাজতত্ত্বের অস্থি কল্প, বার্ত্তাশাস্ত্র কি বলেন, দেখা যাউক। ইউরোপীয় বার্ত্তাশাস্ত্র বলেন, সমাজ বন্ধন যত দৃঢ় হয়, সমাজ মধ্যে শ্রম-বিভাগের নিয়ম ততই বিস্তৃত হইয়া উঠে। শ্রম-বিভাগের গুণে ভোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া উঠে, এবং সেই জন্য সমাজের কতক লোক দৈহিক পরিশ্রমের দায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া জ্ঞান-চর্চ্চায় নিযুক্ত হইতে পারে। গতানুগতিকতা ও অর্থলোভ, আর বিভিন্ন সমাজের পরস্পর প্রতিযোগিতা নিবন্ধন শ্রমবিভাগের শুভময় ফল যে দৈহিক পরিশ্রমের লাঘব তাহা শ্রম-জীবীদিগের ভাগ্যে কিছুই ফলে না। দেখ ইউরোপে শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা যৎপরোনাস্তি বাড়িয়াছে। কিন্তু তাহার কি ফল হইয়াছে? যে শ্রম-বিভাগের গুণে প্রথমাবস্থায় অবসর লাভ, বিদ্যাচর্চ্চার উপায়, এবং ধনের বৃদ্ধি হইয়াছে, পরে সেই শ্রম বিভাগেরই প্রভাবে, মানুষ একেবারেই অবকাশ-শূন্য, জ্ঞান-চর্চ্চায় অশক্ত, এবং কতকগুলি লোক অপরিসীম ধনী এবং অপর অধিকাংশ লোক সর্ব্বতোভাবে নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঐরূপ ভীষণ বৈষম্য হইতে অতি তীব্র অসন্তোষ এবং সেই অসন্তোষের অবশ্যম্ভাবী ফলে সমাজের উপপ্লব আসন্ন হইয়াছে। যাহাতে সমাজের বৃদ্ধি, তাহা হইতেই উহার যেন বিনাশের ও সূত্রপাত হইতেছে। অতএব

প্রাকৃতিক কার্য্যের অপরাপর সকল স্থলে যে লক্ষণ, মনুষ্যের সমাজ তত্ত্বেও সেই লক্ষণ বিদ্যমান। সৃষ্টিশক্তি, স্থিতিশক্তি এবং লয়শক্তি—এ তিনটী বিভিন্ন শক্তি নয়—এক শক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। সুতরাং কোথাও ঋজু রৈখিক পথ নাই—সর্ব্বস্থলেই বৃত্তাকার পথ, চক্র নেমির পরিবর্ত্ত।

অতএব বিজ্ঞানশাস্ত্রও যেমন ক্রমোৎকর্ষের নিয়ম দেখায় না, তেমনি ইতিহাসও তাহা দেখিতে পায় না, এবং ইউরোপীয় বার্ত্তাশাস্ত্র তাহার বিপরীত ভাবই প্রদর্শন করে—মনুষ্যের ক্রমোৎকর্ষের পথটীকে বিলক্ষণ বক্র হইয়া অপকর্ষে পরিণত হইতে দেখায়।

পাশ্চাত্যভাব—উন্নতিশীলতা।

(২)

তবে কি মনুষ্য জাতির ক্রমোৎকর্ষের কথা সর্ব্বতোভাবেই মিথ্যা—ঐ কথার কি কোন মূলই নাই ?—আমার বোধ হয় উহা নিতান্ত অমূলক নয়। প্রাকৃতিক সমুদায় পদার্থ হইতে মনুষ্যের একটী বিশেষ লক্ষণ আছে। প্রকৃতির অপর কোথাও পরিস্ফুট আত্মবোধ নাই—মানুষে সেই আত্মবোধ এবং তজ্জনিত একটী চেষ্টাশক্তি * আছে। অতএব প্রাকৃতিক কার্য্যের সর্ব্বস্থলে যে চক্রনেমি ক্রম দেখা যায় যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম সম্ভবে, তাহা মানুষের কার্য্যে, এবং তাহা মানুষের ঐ আত্মবোধ জনিত বিশেষ চেষ্টা শক্তির যথাযথ প্রয়োগেই জন্মিতে পারে। পূর্ব্বোল্লিখিত বার্ত্তাশাস্ত্রীয় সূত্রে ঐ আত্মবোধ জনিত বিশেষ চেষ্টাশক্তির প্রয়োগে কি হইতে পারে, তাহা দেখা যাউক। যদি ইউরোপীয়েরা মনে করেন যে, শ্রমবিভাগের এবং যন্ত্রাদি প্রয়োগের শুভময় ফলই ফলাইব, ইহার অশুভ ফল ফলিতে দিব না, তাহা হইলে তাঁহারা সমুদায় পৃথিবীময় বল ছলের প্রয়োগে আপনাদের শিল্পজাত বেচিয়া বেড়াইবার অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্বদেশের

---

* আত্মবোধ বিকাশের সাক্ষাৎ ফল কি তাহা বিচার করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

ব্যবহারের ও সরল বাণিজ্যের জন্য যাহা উপযোগী সেই পরিমাণমাত্র শিল্পজাত প্রস্তুত করিতে পারেন, এবং তাহা হইলে পৃথিবীর অপরাপর লোকেও উদ্বেগ পায় না, এবং তাহাদিগের কারিগরেরাও দুই চারি ঘণ্টা মাত্র পরিশ্রম করিয়া অব্যাহতি পায়; এবং অবসর কালটী বিদ্যার চর্চ্চায় নিযুক্ত করিয়া আপনাদের মনুষ্যত্ব সাধন করিতে পারে। চীনীয় মহা-মহোপাধ্যায় মেনসিয়স্ এই জন্যই বলিয়া গিয়াছেন যে, মানুষের ক্রমোন্নতি সংযম এবং ধর্ম্মের পথে, লোভ এবং অধর্ম্মের পথে নয়। অর্থাৎ শুদ্ধ প্রবৃত্তির পথে চিরস্থায়ী উন্নতি হয় না। প্রবৃত্তি যদি নিবৃত্তি কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, তাহা হইলে যে উন্নতি জন্মে তাহা স্থায়ী হইতে পারে।

বস্তুতঃ মনুষ্যের ক্রমোন্নতির নিয়ম যাহা আছে তাহার পথ একমাত্র মনুষ্যের মনস্তত্ত্ব বিচারের দ্বারাই আবিষ্কৃত হইতে পারে। মনুষ্য অনেকগুলি সমপ্রকৃতিক বস্তু দেখিয়া তাহাদিগের সকলগুলির গুণবিশিষ্ট এবং সকলগুলির দোষবিরহিত একটী চিত্তাদর্শ মনে মনে প্রস্তুত করিতে পারেন। শুদ্ধ মনে মনে প্রস্তুত করিতে পারেন এমত নহে। সেই চিত্তাদর্শের প্রতি তৎস্রষ্টা মনুষ্যের প্রীতিও জন্মে, আর সেই প্রীতিও বহুকাল বন্ধ্যা থাকে না, প্রায়ই সে চিত্তাদর্শের অনুরূপ বাহ্য ব্যাপারের জননী হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি বিনির্ম্মিত ঐরূপ অনেকগুলি চিত্তাদর্শ প্রত্যক্ষী-ভূত হইলে, আবার তাহাদিগের প্রত্যেকের হইতে উৎকৃষ্টতর একটী চিত্তাদর্শ জন্মে। সেরূপ আদর্শের অনুরূপ সৃষ্টি হইয়া গেলে, তদপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর আদর্শ জন্মিয়া যায়। এইরূপ বহুকাল ধরিয়া চলিতে পারে এবং তাহা চলিলেই ক্রমোৎকর্ষের পথ উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু এই কথার প্রতি একটী প্রতিবাদ আছে। মানুষের উৎকর্ষবোধটী সকল সময়ে একরূপ থাকে না। সুতরাং অবস্থাভেদে চিত্তাদর্শের প্রকৃতি ভিন্ন হইয়া যায়, এবং যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে উৎকৃষ্ট তাহাকেও উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ না হইয়া অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট বস্তুকেও উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এই বিপদ হইতে

রক্ষার কোন সমীচীন উপায় নাই। তবে যাহা যাহা পূর্ব্বাগত তাহার প্রতি দৃঢ় ভক্তি এবং যাহা অভিনব তাহাকে সেই পূর্ব্বাগতের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে তুলনা করিয়া দেখিলে, চিত্তাদর্শের হঠাৎকারে অপকর্ষ জন্মিতে পারে না।

ইহাকেই রক্ষণশীলতা বলা যায়, এবং এই কার্য্যটী সংস্কারকার্য্য হইতে স্বল্পতর যত্নসাধ্য বলিয়া বোধ হয় না। একটী সামান্য দৃষ্টান্তদ্বারা এই কথাটীকে আরও কিছু স্পষ্টতর করিবার চেষ্টা করিব। এখনকার ভাগ্যবান লোকদিগের বৈঠকখানায় গিয়া দেখ, প্রায়ই দেখিতে পাইবে, ইউরোপজাত বেলজিয়ান গালিচা সকল বিছান আছে। কিন্তু ওগুলি কি পারস্যদেশজাত গালিচার সমতুল্য, না জব্বলপুর নগরেও যে গালিচা সকল প্রস্তুত হইতেছে সেগুলিরও সমান? বাস্তবিক বেলজিয়ান গালিচা জব্বলপুরী গালিচা হইতেও শতগুণে নিকৃষ্ট। এই জন্য যে বাটীতে ঐ উৎকৃষ্টতর বস্তু দুই এক খানি থাকে, সেখানে বেলজিয়ান গালিচার প্রবেশ হইতে পারে না। সেখানে গৃহস্বামীর সঙ্গতি বৃদ্ধির সহিত পারস্য অথবা জব্বলপুরী গালিচারই সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া উঠে।

উচ্চতর বিষয় লইয়া আর একটী দৃষ্টান্ত দিব। যে বাটীতে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা থাকে, যেখানে গৃহকর্ত্তা এবং গৃহকর্ত্রীর চিত্তক্ষেত্রে, শ্রীরামচন্দ্র এবং সীতাদেবীর চিত্র স্পষ্টাক্ষরে অঙ্কিত হইয়া আছে, সে বাটীর ছেলেরাও ইংরাজী শিখিয়া ইংরাজকে আপনাদিগের আদর্শস্থলাভিষিক্ত করিতে পারে না। কারণ তাহাদিগের চিত্তাদর্শ ইংরাজপ্রদর্শিত সকল আদর্শ অপেক্ষা সহস্রগুণে উৎকৃষ্টতর।

তবে কি প্রাচীন আদর্শই অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিলে মানুষের উন্নতির পথ মুক্ত থাকে? তাহাও নয়। প্রাচীন আদর্শ অবিবেচনা পূর্ব্বক অথবা অনুকৃতিপরবশ হইয়া পরিত্যাগ করিলেই দোষ। যদি কোন নূতন ভাব আইসে, তাহা ঐ প্রাচীনের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। যদি ঐ ভাব তাহাতে সম্মিলিত করিলে পূর্ব্ব চিত্তাদর্শের জ্ঞানচক্ষে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয়, তবেই উহাকে গ্রহণ করিতে হয়, নচেৎ উহাকে গ্রহণ

করিতে হয় না। বাল্মিকি কর্তৃক চিত্রিত শ্রীরামচন্দ্রচরিত্র, ভবভূতির হস্তে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে।

ইউরোপীয় গ্রন্থকারদিগের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় লোকের সভ্যাবস্থায় প্রকারভেদ লইয়া অনেক কথাবার্ত্তা প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা কোন জাতিকে নিকৃষ্ট সভ্যাবস্থ বলেন, কাহাকেও বা অসম্পূর্ণ অথবা অর্দ্ধ সভ্যাবস্থ বলেন, কাহার সভ্যাবস্থা স্থগিত-গতি বলেন, আবার কাহার, অর্থাৎ আপনাদিগের, সভ্যাবস্থাকে উন্নতিশীল বলেন। বিভিন্ন জাতীয় লোকের সভ্যাবস্থার এরূপ ইতর বিশেষ কি জন্য জন্মে, এই প্রশ্নের উত্তরও নানাবিধ হইয়াছে। কোন গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, সংশয়বাদের বৃদ্ধিতে সভ্যাবস্থার উন্নতি, শ্রদ্ধাভক্তির বৃদ্ধিতে সভ্যাবস্থার অবনতি! আর এক জন বলিলেন, সাম্য রক্ষাতে সমাজের সভ্যাবস্থা বর্দ্ধিত হয়, বৈষম্য দেখা দিলে উহার অবনতি জন্মে! অপর এক জন বলিলেন, শান্তিরক্ষাপূর্ব্বক উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করাই মনুষ্যের কর্ত্তব্য। এ কথাটী বেশ বটে; কিন্তু কিরূপে ঐ দুইয়ের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে তাহার কোন উপদেশ ইউরোপীয় পণ্ডিত দেন নাই।

ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃবর্গ বিভিন্ন প্রকার সভ্যাবস্থার যে বিবিধ নামকরণ করিয়াছেন সেই নামগুলি হইতে কি প্রকৃত তাৎপর্য্যের বোধ হওয়া উচিত তাহা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাউক। তাহা না করিলে ওগুলি কেবল কথাই থাকিয়া যায়। আমার বিবেচনায় কেবলমাত্র বৈষয়িক উন্নতির উপর সভ্যতার তারতম্য বিচার করা অবিধেয়। জাতীয় চিন্তাদর্শের উৎকর্ষাপকর্ষ লইয়াই বিচার করিলে শ্রেণী বিভাগ অধিকতর বিশুদ্ধ হইবে। যথা——

(১) যে জাতীয় লোকের চিন্তাদর্শ অল্প সংস্কৃত সে জাতীয় লোকের সভ্যাবস্থা হীন।

(২) যে জাতীয় লোকের চিন্তাদর্শের উৎকর্ষ আংশিক সে জাতির সভ্যাবস্থাও পূর্ণসর্ব্বাঙ্গ হইতে পারে না। তাহার সভ্যাবস্থা আংশিক।

(৩) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ সুসংস্কৃত তাহাদিগের সভ্যাবস্থা উৎকৃষ্ট।

(৪) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ অপরের সংস্রবে বা অন্য কারণে ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করে, তাহার সভ্যাবস্থা উন্নতিশীল।

(৫) যাহার চিত্তাদর্শ সমভাবাপন্ন থাকিলেও তৎপ্রতি অনুরাগ এবং তাহার সাধন চেষ্টা থাকে, সে জাতির সভ্যাবস্থা সজীব।

(৬) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ সমভাবাপন্ন কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগ ন্যূন হইতেছে, সে জাতির সভ্যাবস্থা পতনপ্রবণ।

(৭) যে জাতীয় লোকের চিত্তাদর্শ পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহা অপেক্ষা মলিন হইয়া যাইতেছে, সে জাতির সভ্যাবস্থা পতনশীল।

(৮) যে জাতির চিত্তাদর্শ সুসংস্কৃত এবং তৎপ্রতি অনুরাগও বলবান কিন্তু তাহার সাধন চেষ্টা কম, সে জাতির সভ্যাবস্থা স্থগিতগতি।

অর্থাৎ জাতীয় চিত্তাদর্শের উৎকর্ষ এবং পূর্ণতার তারতম্য, তৎপ্রতি অনুরাগের তারতম্য এবং তৎসাধনচেষ্টার তারতম্য এই তিনটী তারতম্যের বিচার করিয়া জাতীয় সভ্যাবস্থার বিশেষ বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়। কেহ আপনাকে উন্নতিশীল বলিলেই সে উন্নতিশীল ইহা প্রমাণ হয় না। আমার বিবেচনায়, ইউরোপে সভ্যাবস্থা পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ সূত্রের অন্তর্গত। সুতরাং উহা আংশিক ও পতনপ্রবণ। ভারতবর্ষীয়দিগের সভ্যাবস্থা অষ্টম সূত্রের অন্তর্গত; অর্থাৎ স্থগিত গতি। কিন্তু কোন সমাজই স্থগিত-গতি হইয়া অধিক কাল থাকিতে পারে না। হয় চতুর্থ বা পঞ্চম সূত্রের অন্তর্গত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করে নচেৎ ষষ্ঠ ও সপ্তম সূত্রের অন্তর্গত হইয়া হীন হইয়া যায়। বৌদ্ধ জাতীয়দিগের সভ্যাবস্থা তৃতীয় ও সপ্তম সূত্রের অন্তর্নিবিষ্ট; অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কিন্তু পতনশীল। মুসলমানজাতীয়দিগের সভ্যাবস্থা পঞ্চম সূত্রের দ্বারা বিচার্য্য।

উপসংহারে বলি। সমাজ মনুষ্যের সম্মিলন জাত। সুতরাং অন্তঃসম্মিলন যত দৃঢ় হইবে সমাজ ততই সবল হইবে এবং উঁহার ক্রিয়াশক্তিও ততই বাড়িবে। সম্মিলন বাড়ে বশ্যতা হইতে, সম্মিলন বাড়ে একোদ্দেশ্যসাধনচেষ্টা হইতে, সম্মিলন বাড়ে সহানুভূতির বৃদ্ধি হইতে, সম্মিলন বাড়ে স্বার্থত্যাগ হইতে, মোট কথায় সম্মিলন বাড়ে ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতে। অতএব যেখানে যত দিন যতদূর ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেখানে ততদিন ততদূর সমাজেরও সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়া থাকে। সমাজের প্রকৃত উন্নতি শুদ্ধ কলকৌশলের সৃষ্টিতে হয় না, শুদ্ধ সস্তা দরে উপভোগ্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারিলেও হয় না, আর ধনের অতিশয় বৃদ্ধিতেও হয় না, মৌখিক সাম্যভাবের বিস্তারেও হয় না, আর আত্মমুখে আত্মগরিমা খ্যাপন করিলেও হয় না। যে সমাজে মনুষ্যের চিন্তাদর্শ যত উচ্চ, তাহার প্রতি যত প্রীতি এবং ভক্তি এবং তৎসাধনার্থ কায়মনোবাক্যে যত চেষ্টা, সে সমাজ সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট সভ্যাবস্থ, ধর্ম্মনিষ্ঠ, এবং উন্নতিশীল।

পাশ্চাত্যভাব—সাম্য।

পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম্মপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, তৎসমুদায় দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। কতকগুলি ধর্ম্মপ্রণালীর মূল, প্রকৃতির পর্য্যালোচনা। এই গুলিকে প্রকৃতিমূলক বা প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলা যায়। অপর কতকগুলি মনুষ্য মনের ভাব পর্য্যালোচনা হইতে সম্ভূত। এই গুলিকে ভাবমূলক বা ভাবিক বলা যায়। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে পরব্রহ্মে মানুষের আত্মত্বারোপ অল্প হয়, ভাবমূলক ধর্ম্মে ঐরূপ আত্মত্বারোপ অধিক হয়। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে পরব্রহ্ম নির্গুণ—অর্থাৎ তাঁহাতে দয়া, মমতা, ক্রোধ প্রভৃতি মনুষ্য হৃদয়ের ভাব সকল আরোপিত হয় না।

ভাবমূলক ধর্ম্মে পরব্রহ্ম সগুণ—অর্থাৎ মনুষ্যহৃদয়ের যাবতীয় পরস্পর সাপেক্ষ ভাব ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে জ্ঞানই একমাত্র মোক্ষপথ, ভাবমূলক ধর্ম্মে ভক্তিই মুক্তির উপায়। প্রাকৃতিক ধর্ম্মের দৃষ্টান্তস্থল হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম। ভাবমূলক ধর্ম্মের দৃষ্টান্তস্থল খৃষ্টীয় এবং মুসলমান ধর্ম্ম। প্রাকৃতিক ধর্ম্ম কঠোর, ভাবমূলক ধর্ম্ম কোমল। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে একমাত্র কার্য্য কারণ শৃঙ্খলার উপর নির্ভর করিয়া সুখপ্রাপ্তির এবং দুঃখ নিবৃত্তির পথ দেখিতে হয়। ভাবমূলক ধর্ম্মে উপসনার পথ সুবিস্তৃত; ইহাতে অনুগ্রহের আশা এবং নিগ্রহের ভয় করিতে হয়। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে স্বর্গ নরকাদি সুখদুঃখব্যঞ্জক পদার্থ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ মূলক কর্ম্মফলভোগমাত্র। ভাবমূলক ধর্ম্মে উহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা সমুদ্ভূত। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে দুষ্কৃতি করিলে তাহার অবশ্যম্ভাবি ফল হয় দুঃখ। ভাবমূলক ধর্ম্মে দুষ্কৃতির সাক্ষাৎ ফল হয় ঐশ বিরাগ এবং সেই বিরাগের ফল হয় দুঃখ। ফলকথা, প্রাকৃতিক ধর্ম্মে কারণ এবং কার্য্যের অন্তর্বর্ত্তী সংকল্প বিকল্পাত্মক ইচ্ছাশক্তির স্থান নাই। "আপ্তকামস্য কা স্পৃহা ?" ভাবমূলক ধর্ম্মে তাদৃশ ইচ্ছাশক্তিই সর্ব্বে সর্ব্বা। প্রাকৃতিক ধর্ম্মে পরমাত্মার অপাপবিদ্ধত্ব, নিত্যত্ব, সর্ব্বময়ত্ব প্রতিপাদিত হয়। ভাবমূলক ধর্ম্মে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বমঙ্গলময়ত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণ ব্যাখ্যাত হয়।

ধর্ম্মপ্রণালীর এই মৌলিক ভেদ যদিও খুব স্পষ্ট এবং কোথাও কখন সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয় না, তথাপি উভয় প্রণালীই যেন কিয়ৎপরিমাণে পরস্পর সম্মিলনপ্রবণ বলিয়া বোধ হয়। সকল প্রকার প্রাকৃতিক ধর্ম্মেই পরমাত্মার অবতার অথবা তাদৃশ কোন পদার্থের স্বীকার আছে। আবার ভাবমূলক ধর্ম্মেও ঈশ্বরস্বভাবে মনুষ্যের আত্মভাবারোপ যে অন্যায্য এবং অবৈধ, তাহাও মধ্যে মধ্যে ব্যক্ত হইয়া থাকে। পরন্তু, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম-প্রণালীতে যে অবতারাদি স্বীকৃত হয়, তাহার মূল, ধর্ম্মনীতির অনুরোধমাত্র। ধর্ম্মনীতি দেখেন যে, শুদ্ধ বিধিনিষেধের দ্বারা যে কার্য্য হয়, দৃষ্টান্তপ্রদর্শনের

দ্বারা তাহা অপেক্ষা অধিকতর এবং উৎকৃষ্টতর ফললাভ হয়। এই জন্য যেন ধর্ম্মনীতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াই প্রাকৃতিক ধর্ম্মগ্রন্থে অবতারাদির অবতারণা হইয়া থাকে। ভাবমূলক ধর্ম্মে যে, ঈশ্বরে মনুষ্যের আত্মত্বারোপ পরিত্যাগ করিবার কখন কখন চেষ্টা হয়, তাহার কারণ সত্যের অববোধমাত্র। প্রাকৃতিক ধর্ম্মাবলম্বীরা যে পরিমাণে অবতারাদির ভক্ত হইতে শিখেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদিগের মনের দৌর্ব্বল্য বুঝিতে হয়। তাঁহারা আর বিধি নিষেধের সূত্র সকল খাটাইয়া আপনাদিগের চরিত্র সংঘটন করিতে পারেন না। তাঁহাদের পক্ষে দৃষ্টান্ত দর্শনের প্রয়োজন হইয়াছে, বুঝা যায়। ভাবমূলক ধর্ম্মাবলম্বীরা যে পরিমাণে আত্মত্বারোপ পরিহারের চেষ্টা করেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের প্রকৃতি সতেজ হইয়া উঠিতেছে অনুমান করা যাইতে পারে। হিন্দুদিগের মধ্যে শঙ্করমতবাদ এবং স্মার্ত্তাচার যত ন্যূন হইয়া রামানুজাদিব্যাখ্যাত দ্বৈত বাদের এবং রামানন্দ প্রভৃতির প্রদর্শিত ভক্তিমার্গের প্রাশস্ত্য জন্মিতেছে, ততই হিন্দুর চিত্তে দৌর্ব্বল্য অনুভূত হইতেছে। আর মুসলমানদিগের মধ্যে অদ্বৈতবাদ (সুফি মত) এবং খৃষ্টানদিগের মধ্যেও নির্গুণবাদ (আগনষ্টিক মত) যত বিস্তৃত হইতেছে, ততই উঁহাদিগের চিত্তের বল অনুভূত হইতেছে। জ্ঞানমার্গ ত্যাগ করিয়া ভক্তি মার্গে যাওয়া কিম্বা প্রাকৃতিক ধর্ম্মপ্রণালী ছাড়িয়া ভাবিক ধর্ম্ম-প্রণালীতে পদার্পণ করা, ইহা উন্নতির চিহ্ন নয়, অবনতির লক্ষণ।

অতএব স্থূল সিদ্ধান্ত এই যে, প্রাকৃতিক ধর্ম্মপ্রণালী ভাবিক ধর্ম্মপ্রণালী হইতে উৎকৃষ্টতর। কিন্তু একটী স্থলে আপাতদৃষ্টিতে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম-প্রাণালী হইতে ভাবমূলক ধর্ম্মপ্রণালী যেন উৎকৃষ্টতর বলিয়াই বোধ হয়। ঐ স্থলটী সাম্যবাদ বিষয়ক এবং তাহাই এই প্রবন্ধের বিচার্য্য বিষয়।

জগতের কোথাও সাম্য নাই। গাছের একই ডালের দুইটী পাতাও পরস্পর সমান হয় না। একটী বালুকারেণুও অপর কোন বালুকা-রেণুর সমান নয়। একটী বৃষ্টিবিন্দুও অপর কোন বৃষ্টিবিন্দুর সমান নহে। জগতে সাদৃশ্য আছে, কিন্তু সাম্য নাই। সাদৃশ্য-প্রত্যক্ষ হইতে মনুষ্য

হৃদয়ে সামাজ্ঞানের উদ্বোধ হইয়া যায়। গাছের দুইটী পাতা লইয়া পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিতে গেলেই বুঝিতে পারা যায় যে, একটী যদি অপরটী হইতে কোন কোন বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন না হইত, তাহা হইলেই দুইটীতে ঠিক সমান হইত। সাম্যজ্ঞান এইরূপ প্রত্যক্ষীভূত সাদৃশ্যমূল হইতে জন্মিয়া সাদৃশ্যবোধ হইতে ভিন্ন অপর একটী ভাব রূপে লক্ষিত হয়।

ভাবমূলক ধর্ম্মপ্রণালীতে এই সাম্যবোধের বিলক্ষণ কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। মানুষের হৃদয় সম্ভূত-সাম্যভাব ঈশ্বরে আরোপিত হইয়া শুদ্ধ জগৎ-কার্য্যের মীমাংসায় গোলোযোগ বাধাইয়া দেয় এমত নহে, ঈশ্বরকেও যেন বিচারের অধীন করিয়া তুলে। সেই জন্য ভাবিকদিগকে অনেক কষ্ট কল্পনা করিয়া মনুষ্যের সমীপে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষের পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার ন্যায়পরতা সাব্যস্থ করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে হয়। সাম্যভাবের আরোপ নিবন্ধন ঈশ্বর এমন করিলেন কেন, ঈশ্বর তেমন করিলেন কেন, এতে আর ওতে এত পৃথক করিলেন কেন, এইরূপ প্রশ্ন সকলের দ্বার অবারিত হইয়া থাকে, এবং সেই সকল প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য ভাবিক-গণকে ঈশ্বরের সকল অভিপ্রায় কল্পনাবলে জানিয়া রাখিতে হয়।

সাম্যবাদের আরোপ নিবন্ধন ধর্ম্মবিচারে এই সকল গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে সত্য; কিন্তু সাম্যবাদীরা বলেন, উহার দ্বারা জনসমাজে সমূহ উপকার দর্শিয়াছে। মানুষে মানুষে সমান, এই ভাব হইতে পরপীড়নের হ্রাস হইয়াছে, সাধারণের অবস্থার উৎকর্ষসাধনচেষ্টা অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে, সকলের হৃদয়ে আপনাপন উন্নতির আশা প্রদীপ্ত হইয়াছে, এবং সমাজের চেষ্টাশক্তি জাগরিত হইয়াছে। সাম্যবাদের যে কতকটা ঐরূপ শুভ ফল আছে, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই, এবং উহার ঐ সকল শুভ ফল আছে বলিয়াই দুঃখজীবী জনসাধারণের কর্ণে সাম্যবাদ বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়। উহা এত মধুর যে, যথায় উহা সত্য হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, সেই ইংরাজের মুখেও উহা আজি কালি ভারতবাসীর মনোহরণ করিতেছে।

কিন্তু ভাবিয়া দেখ, সাম্যবাদের যেমন এক পক্ষে পীড়ন নিবারণ প্রবণতা আছে, উহা তেমনি পক্ষান্তরে দয়া বৃত্তির সংকোচ প্রবণ। যেমন সকলের মনে স্ব স্ব উন্নতি বিষয়ক আশার আলোক প্রকাশ করিতে পারে, তেমনি ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ এবং দুরাকাঙ্ক্ষার অগ্নিও প্রজ্জ্বালিত করিয়া হৃদয়ক্ষেত্র দগ্ধ করিতে থাকে। যেমন সমাজে অধ্যবসায় বর্দ্ধিত করে, তেমনি সন্তোষাদি গুণের বিলোপ করিয়া দেয়।

সাম্যবাদ হইতে সমাজের মধ্যে আর এক প্রকারে অসন্তোষ এবং অসুখের কারণ উপস্থিত হয়। মুখে যিনিই যাহা বলুন, সামান্যতঃ মানুষ মানুষের অপেক্ষা বড় হইতে চায়। অতএব এক পক্ষে সাম্যধর্ম্ম পালন, পক্ষান্তরে অন্য মানুষ অপেক্ষা আপনি বড় হইবার প্রয়াস, এই দুইয়ের সামঞ্জস্য ঘটিয়া উঠে না। সাম্যবাদটা কথায় মাত্র থাকে, ব্যবহারে বড়ই বৈষম্য উপস্থিত হইয়া যায়। যে সমাজে সাম্যের তান নাই, সে সমাজে বৈষম্য রক্ষার জন্য নিরন্তর যত্নও অধিক নাই। মার্কিনেরা চাকরদিগকে চাকর বলেন না, সহায় বা সাহায্যকারী বলেন, কিন্তু মার্কিনদিগের মধ্যে ধনবত্তার গৌরব ইংরাজদিগের অপেক্ষাও অধিক। ইংলণ্ডে তবু কতকটা বংশমর্য্যাদা আছে, আমেরিকায় ধন ভিন্ন আর কিছুরই মর্য্যাদা নাই। বিদ্যার গৌরবও অতি অল্প। ভাবিক সাম্যবাদটা যেমন অপ্রকৃত বস্তু, তেমনি উহা কার্য্যতঃ অগ্রাহ্য। ইহার একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ—দাস নিয়োগ। মুসলমানেরা সাম্যবাদী, কিন্তু উঁহাদিগের কেনা গোলাম থাকে। খৃষ্টান জাতীয়েরা সাম্যবাদী। কিন্তু অল্পকাল গত হইল উঁহাদিগেরও সকলের দাস রাখা ছিল। সম্প্রতি দাস রাখিবার প্রথাটা অনেক উঠিয়া গিয়াছে, এবং যাহা বাকী আছে, তাহাও উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু তাহা উঠাইবার প্রকৃত কারণ সাম্যবাদ নয়। বার্ত্তাশাস্ত্রের একটী সূত্র এই যে, দাসদিগের শ্রম অধিক ব্যয়সাধ্য। ইউরোপীয় সমাজে শ্রম-জীবী লোকেরা যে অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে দাস অপেক্ষা

উঁহাদিগের পরিশ্রমের মূল্য ন্যূন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রকৃত ব্যাপারের সহিত সাম্যবাদের সম্মিলন হওয়াতেই, দাস ব্যবসায় বর্জ্জন সম্বন্ধে সাম্যবাদ কার্য্যকারী হইতে পারিয়াছে।

প্রাকৃতিক ধর্ম্মেও সাম্যবাদ আছে। কিন্তু সে সাম্যবাদ অতি ঘোরতর বস্তু। প্রাকৃতিক সাম্যবাদ মৌলিক একত্ব-বোধ মূলক। উহা নিবিষ্টচেতাজ্ঞানীদিগের হৃদয়ে স্বতই উদ্ভূত হয়। উহা সমস্ত জগতকে একেরই বিভূতি স্বরূপে প্রতীয়মান করিয়া কোথাও কোন মৌলিক ভিন্নতা লক্ষ্য করে না। প্রাকৃতিক সাম্যবাদে শুদ্ধ মনুষ্য মনুষ্যের সমান, এই কথা বলে না, সকলেই সকলের সমান, এই কথা বলে। বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তিতে এবং কুক্কুরেতে সেই একমাত্র শক্তি বিরাজমান দেখিয়া উভয়ের সমতা অনুভব করে, কোথাও কোন পার্থক্য দেখে না। উহা যে ভিন্নতা দেখে তাহা ব্যবহারিক ভিন্নতা এবং সংসার যাত্রার উপযোগী—পারমার্থিক ভিন্নতা অথবা কোন চিরস্থায়ী বস্তু বলিয়া মনে করে না। প্রাকৃতিক ধর্ম্ম যে ভিন্নতা দেখে তাহা কর্ম্মপ্রসূত বলিয়া জানে এবং বল ছলাদি প্রয়োগদ্বারা তাহার উচ্ছেদ চেষ্টা অবিধেয় বলিয়া মনে করে। ভাবিক ধর্ম্ম মৌলিক একতা দেখিতে পায় না—উহা কর্ম্মসূত্রেরও তাদৃশ বিভূতি অনুভব করে না—উহা সাদৃশ্য দর্শন হইতে সাম্যের ভাবমাত্র গ্রহণ করে এবং ভিন্নতার প্রতি বিরূপতাবলম্বন করাকেই ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত বলিয়া খ্যাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়।

প্রাকৃতিক সাম্যবাদে মৌলিক তথ্য নিহিত এবং ভাবিক সাম্যবাদে মৌখিক সাম্য প্রকট হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক সাম্যবাদ বলেন সকলই মূলতঃ এক, কর্ম্মভেদে পৃথকভূত।' ভাবিক সাম্যবাদ বলেন সকলেই জন্মতঃ সমান, সামাজিক ব্যবস্থাদির পক্ষপাত দোষে পৃথককৃত। এইজন্য প্রাকৃতিক ধর্ম্মাবলম্বীরা সমাজের মধ্যে অপ্রকৃত এবং অশান্তিকর সাম্যবাদের প্রবেশ হইতে দেন না। তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, সমাজের মধ্যে বড়ছোট থাকিবেই থাকিবে। সমাজের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী সেই উচ্চাবচ ভাবটী লোকের

গুণানুসারিণী করিবার জন্যই সকল সমাজে চেষ্টা হইয়া থাকে। মনু-সংহিতায় ব্যক্তিগত মান্যস্থান নির্দ্দেশপূর্ব্বক ব্যক্ত হইয়াছে —

বিত্তংবন্ধুবয়ঃকর্ম্মবিদ্যাভবতি পঞ্চমী
এতানি মান্যস্থানানি গরীয়োযদ্‌যদুত্তরং।

বিদ্যাবত্তাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; তাহার নীচে কর্ম্মশালিতা, তাহার নীচে বয়োধিক্য; তাহার নীচে সম্পর্ক অথবা আভিজাত্য; তাহার নীচে ধনবত্তা। এই পঞ্চবিধ মান্য স্থানই সকল সমাজে স্বীকৃত। কিন্তু সমাজভেদে এই পাঁচটীর মধ্যে কোনটির প্রতি বিশেষ সমাদর হয়। সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে যে, নব্য ইউরোপে ধনবত্তার গৌরব বাড়িতেছে। এদেশেও ইংরাজ সমাগম হইয়া তাহাই হইবার কতকটা উপক্রম হইয়াছে। এই দুইএর মধ্যে প্রাকৃতিক ধর্ম্মাবলম্বীরা সাহজিক গুণবত্তার প্রতি বিশেষ আস্থা বশতঃ মনে করেন যে, সামাজিক বৈষম্যের ব্যবস্থা বংশমর্য্যাদানুসারিণী হওয়াই ভাল, বিভবানুসারিণী হওয়া ভাল নয়। বিভবানুসারিণী বৈষম্য যদিও চেষ্টাশক্তির উত্তেজক, তথাপি লোভ, ঈর্ষ্যা, শঠতা, অস্থৈর্য্য প্রভৃতি অনেকানেক দোষের আকর।

আমি দেখিয়াছি, আমাদিগের অনেক ভাল ভাল গ্রন্থকর্ত্তাও সাম্যবাদের আভ্যন্তরিক গূঢ় ভেদটী পরিষ্কাররূপে না বুঝিয়া যিশু এবং মহম্মদের সহিত বুদ্ধদেবকেও সাম্যবাদী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমতবাদ ভাবিক নয়, প্রাকৃতিক; সুতরাং উহাতে সামাজিক সাম্যবাদের বীজমাত্র থাকিতে পারে না। বুদ্ধদেব সামাজিক সাম্যের কোন কথাই বলেন নাই; প্রত্যুত পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে ক্রমোৎকর্ষ এবং ক্রমাবনতির নিয়ম স্বীকার করিয়া মনুষ্যের মধ্যে সাহজিক উৎকর্ষাপকর্ষের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে বৌদ্ধ মতবাদে ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের প্রতি যথেষ্ট বিদ্বেষ প্রকাশিত হইয়া আছে, এবং এদেশে ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ করিলেই সাম্যবাদ রক্ষা করা হইতেছে

বলিয়া অনেকে বোধ করেন। নব্য গ্রন্থকর্ত্তৃগণ ঐরূপ ভ্রমে পড়িয়াই বুদ্ধদেবকে সাম্যবাদীর মধ্যে ধরিয়া লইয়া থাকিবেন।

যাহাই হউক, ভারতবর্ষে যে সামাজিক বর্ণভেদের ব্যবস্থা আছে, তাহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, উহা অতি উদার উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রথমতঃ দেখা যায় যে, জাতিভেদটা কেবল গৃহস্থাশ্রমের মধ্যেই প্রবল, গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিলে জাতিভেদ মানিতে হয় না। অপরাপর আশ্রমের সহিত গার্হস্থ্যাশ্রমের বিশেষ এই যে, গার্হস্থ্যাশ্রমে বিবাহ আছে, অন্যান্য আশ্রমে বিবাহ নাই। আর একটি বিশেষ এই যে, গৃহস্থাশ্রমে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য ব্যবসায় অবলম্বন আছে, অপরাপর আশ্রমে তাহা নাই। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণান্তর্গত লোকের মধ্যে বিবাহ হইলে জাতিপাত হয়। অথচ জাতীয় ব্যবসায় ভিন্ন অন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিলে অপ্রায়শ্চিত্তিক কোন দোষ হয় না। জাতিভেদ প্রথা মুখ্যতঃ বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ প্রতিষেধের জন্যই প্রবর্ত্তিত এবং ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়া আছে। বিবাহ প্রতিষেধ দৃঢ় সম্বদ্ধ করিবার জন্যই খাওয়া দাওয়ার বিষয়েও আঁটাআঁটি হইয়াছে। ভারতবর্ষে এইরূপ বিবাহ প্রতিষেধক বর্ণভেদ প্রথার নৈসর্গিক কারণ আছে। উহা এদেশে অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই এখানে জন্মিয়াছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে সে কথার সবিস্তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজনীয়। Thus you cut the Gordian knot!

দ্বিতীয়তঃ জাতিভেদ প্রচলৎ থাকায় ধনের গৌরবটা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতে পায় না। জাতি ধনের আয়ত্ত নয়। সুতরাং যে সমাজে জাতিভেদের ব্যবস্থা থাকে, সে সমাজে ধনই সকল সম্মান এবং গৌরবের আস্পদ হয় না। ধনের প্রতি লোভ, যে কারণেই হউক, কিছু কম হইয়া থাকিলে সমাজ ভালই থাকে, লোকের প্রকৃত সুখও অধিক হয়।

তৃতীয়তঃ জাতিভেদ প্রচলৎ থাকায় ভারতবর্ষের সমুদায় শিল্প কার্য্য বহু পূর্ব্বকাল হইতে অপরিসীম উৎকর্ষ লাভ করিয়া আছে, এবং সমস্ত পৃথিবীতে উহা তুলনা রহিত হইয়াছে।

চতুর্থতঃ জাতিভেদ থাকায় লোকেরা আপনাপন অভিলাষানুযায়ী ব্যবসায়, অবলম্বন করিতে পারে না বলিয়া একটা কথার কথা মাত্র আছে। মনুসংহিতার মতে "বৃত্তি কর্ষিত" হইলে, একমাত্র ব্রাহ্মণের ব্যবসায় ভিন্ন অপর সকল ব্যবসায়ই সকলে অবলম্বন করিতে পারে, এবং তাহাই চিরকাল করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণ সমাজের শিক্ষক। শিক্ষকের মস্তিষ্কে পৈতৃক ব্যবসায়জনিত দোষও পরিহার করা বিধেয়।

পঞ্চমতঃ একমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণ ভিন্ন আর কাহার অপেক্ষা অন্য বর্ণের লোকেরা আপনাদিগকে তেমন অপকৃষ্ট বলিয়া মনে করে না। বাঙ্গালার নবশাখেরা আপনাদিগকে কায়স্থদিগের অপেক্ষা জাতি নিবন্ধন নিকৃষ্ট মনে করে না। মান্দ্রাজের পরিয়া নামক অস্পৃশ্য জাতীয়েরা বলে যে, তাহারা ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব, সুতরাং আপনাদিগকে হেয় জ্ঞান করে না। বোম্বাই প্রদেশীয় মাড়েরা তথাকার অস্পৃশ্য জাতি। কিন্তু উহাদিগেরও আত্মগৌরব আছে। উঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর সকল জাতি অপেক্ষা শুচি এবং শুদ্ধ বলিয়া জানে।

ষষ্ঠতঃ জাতিভেদ প্রথা প্রত্যেক বর্ণের স্বাতন্ত্রিকতা স্থাপন করিয়া সকলেরই অনেকটা আত্মগৌরব রক্ষা করে। অতএব পরাধীন জাতির পক্ষে এই প্রথা বিশেষ শ্রেয়স্করী।

অতি বালককালে একবার শিকারী পাখীর শিকার শিক্ষা দেখিয়াছিলাম। একজন পাখীটিকে হাতের উপর করিয়া লইয়া যাইতে ছিল এবং এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিতেছিল। আমাদের একটা টিয়া পাখী সেইমাত্র পলাইয়া নিকটবর্ত্তী নিমগাছের ডালে বসিয়াছিল। আমি তাহার প্রতি স্থিরদৃষ্টি হইয়াছিলাম। যে ব্যক্তির হাতে শিকারে বসিয়াছিল, সে বোধ হয়, আমার দৃষ্টির অনুসরণে দৃষ্টিপাত করিয়া টীয়াটীকে দেখিল এবং তাহার শিকরেকে ছাড়িল। তীরবেগে শিকরে গিয়া টিয়ার উপরে পড়িল, আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম। শিকরী বুঝিতে পারিল যে, টিয়াটী পোষা। সে একটী শীশ দিল, শিকরে অমনি টিয়াকে ছাড়িয়া তাহার হাতের উপরে আসিয়া চঞ্চুপুট দিয়া আপনার পক্ষ কুট্টন করিতে লাগিল—কে বলিবে যে এই শিকরে সেই শিকরে।

বাল্যকালের ঐ অদ্ভুত দর্শন চিত্তপটে সংলগ্ন হইয়া গিয়াছিল, কখন অপনীত হয় নাই। অতএব বয়োধিক হইয়া যখন প্রবৃত্তির পথ উৎকৃষ্ট কি নিবৃত্তির পথ উৎকৃষ্ট, ব্রাহ্মণ সন্তানের হৃদয়ে এই বিচার স্বতঃই উত্থিত হইল, তখন জর্ম্মণদেশীয় রিথ্‌টর নামক একজন গ্রন্থকর্ত্তার শ্যেন পক্ষীর শীকার সম্বন্ধীয় উপমাটি বড়ই মিষ্ট লাগিল, এবং প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সম্বন্ধীয় বিচারের মীমাংসাও সেই উপমাটীর বলে সম্পাদিত হইয়া গেল। রিথ্‌টর বলেন, শ্যেন পক্ষী যেমন স্বীয় প্রভুর ইঙ্গিত মাত্রে শীকারের প্রতি ধাবমান হয়, আবার ইঙ্গিতমাত্রে ফিরিয়া আইসে, মনুষ্যের মনও সেইরূপে শিক্ষিত হওয়া উচিত। বিধি বা কর্ত্তব্য জ্ঞান যে কার্য্যে প্রবৃত্তি দিবে, মানুষ তাহাই একান্ত মনে এবং সর্ব্ব প্রযত্নে সম্পন্ন করিবে, আবার বিধি বা কর্ত্তব্যজ্ঞান যাহা হইতে নিবৃত্ত করিবে, বিনা বিলম্বে এবং বিনা ক্ষোভে সেই বিষয় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে। সমুদায় আর্য্যশাস্ত্রের শাসনও ঐরূপ। ইন্দ্রিয় গ্রাম সংযত

এবং মনকে সর্ব্বতোভাবে বশীভূত করিয়া অনাসক্ত চিত্তে নিয়ত কার্য্যানুষ্ঠান করিতেই শাস্ত্রের উপদেশ। ইহাতে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়েরই সামঞ্জস্য বিধান হইয়া দুঃখের হ্রাস, চিত্তের প্রাসর্য্য এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্য জন্মে। ইহাই ঐহিক এবং পারমার্থিক উভয় শ্রেয়ের সাধনোপায়। ঐহিক সাধনের প্রকৃত পথ পারমার্থিক সাধনের প্রকৃত পথ হইতে ভিন্ন নহে। "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ:"।

কিন্তু শাস্ত্রের মত এইরূপ পরিষ্কার, বিশুদ্ধ এবং প্রশস্ত হইলেও, আমাদিগের দেশে কতকটা ভিন্নরূপ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। প্রবৃত্তির পথ এবং নিবৃত্তির পথ দুইটিকে মিলাইয়া যে, উভয়লোক হিতকরী ব্যবহার-পদ্ধতি জন্মে, তাহা এখন আর তেমন যত্নপূর্ব্বক দেখিয়া লওয়া হয় না। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি বাহ্যজগতের আকর্ষণ এবং বিপ্রকর্ষণের ন্যায় পরস্পর বিপরীত হইলেও যে যুগপৎ কার্য্যকারী তাহা একেবারে বিস্মৃত হওয়া হইয়াছে, এবং তাহার ফল এই হইয়াছে যে, যাহারা প্রবৃত্তির পথে যাইতেছে তাহারা ক্রমে অধোগত হইয়া পাপ পঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে, আর যাহারা নিবৃত্তির পথে যাইতেছে মনে করে, তাহারাও অনেকে ভ্রষ্টাচার এবং স্বার্থপর হইয়া পড়িতেছে।

মানুষ পথ চলে কেমন করিয়া? একটী পা স্থির থাকে, অপরটী অগ্রসর হয়, আবার সেইটী স্থির হয়, পূর্ব্বেরটী অগ্রবর্ত্তী হয়। অতএব গমন রূপ একটী কার্য্যের মধ্যে স্থিরভাব এবং চলভাব দুইটীই বিদ্যমান থাকে। জীবনবর্ত্মের চলনেও ঐরূপ হওয়া বিধেয়। প্রবৃত্তি প্রভাবে অয়ন, নিবৃত্তি প্রভাবে বিশ্রাম। প্রাণিশরীর জীবৎ থাকে কিরূপে? হৃৎকোষ সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইতে শোণিতধারা নির্গত হইয়া সমুদায় দেহে সঞ্চরিত হইয়া পড়ে, আবার হৃৎকোষ প্রসারিত হয়, তাহাতে প্রত্যাবর্ত্তিত শোণিতধারা আসিয়া প্রবেশ করে। অতএব রক্ত প্রবহণ ব্যাপারে সংকোচন এবং প্রসারণ রূপ বিপরীত উভয় কার্য্যের সম্মিলন হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষাও ঐ প্রকারে

হয়। জাগতিক যাবৎ পদার্থের বিভূতি জ্ঞানময় কোষে প্রবিষ্ট হয়, এবং সেই জ্ঞানময় কোষ হইতে কর্ম্মরূপে বহির্ভাগে আইসে। ফলতঃ জগতের সকল বস্তুতেই দুইটি পরস্পর বিপরীত শক্তির যুগপৎ আবির্ভাব থাকে। আকর্ষণ না থাকিলে বিপ্রকর্ষণ বা তাপের প্রভাবে পরমাণু সকল পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া সমস্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত হইত, আবার বিপ্রকর্ষণ বা তাপ যদি কিছু মাত্র না থাকে, তাহা হইলে কোন দ্রব্যেরই বিবৃতি সম্ভবে না, সংঘাতের অশেষ বলে সকলেই একেবারে রূপ বিহীন হইয়া পড়ে। অতএব দুইটী বিভিন্ন এবং বিপরীত শক্তির যুগপৎ অবস্থানই জগতে প্রতীয়মান হয়, একমাত্র শক্তির কার্য্য কোথাও স্থূল দৃষ্টিতে দৃশ্যমান হয় না।

কিন্তু বাহ্যীভূত জগতের নিয়ম এই রূপ হইলেও, শাস্ত্রকারেরা দেখিয়াছেন যে, প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি এই উভয় শক্তির মধ্যে সাধারণতঃ প্রবৃত্তির বলই অধিক। ভগবান ইন্দ্রিয়গণকে বহির্ম্মুখ করিয়াই সৃষ্ট করিয়াছেন।* সেই জন্য তাঁহাদিগের উপদেশে নিবৃত্তির শিক্ষাই অধিকতর হয়। প্রবৃত্তি প্রবলা—নিবৃত্তি দুর্ব্বলা। শাস্ত্রকারেরা উহাদিগের সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশে যেটী দুর্ব্বলা, উপদেশাদি দ্বারা সেইটীর সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। অপরাপর জাতির শাস্ত্রকারদিগের অপেক্ষা আর্য্যশাস্ত্রকারেরা নিবৃত্তি পক্ষের শিক্ষাদানে অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়াই কেহ কেহ অনুমান করেন, যে তাঁহারা কেবলমাত্র নিবৃত্তিবিষয়ক শিক্ষাদানেই পটু। এরূপ ভ্রমানুমানের আরও একটী কারণ আছে। আর্য্যশাস্ত্রকারদিগের মধ্যে কেহ কেহ, যথা ভগবান শঙ্করস্বামী, নিবৃত্তি মার্গের চরম ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল ব্যাখ্যাতৃবর্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য না বুঝিয়া এবং আর্য্যশাস্ত্রের মূলীভূত অধিকারীর ভেদ বিচার বিষয়ে একান্ত অজ্ঞতা প্রযুক্ত, অনেকেই আর্য্যশাস্ত্রকে ঐহিকতার বিরোধী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক আমাদিগের শাস্ত্রের শিক্ষা লোকদ্বয়ের শুভসাধিনী—শুদ্ধ পারলৌকিক উন্নতি-সাধিনী নহে।

* "পরাঞ্চি খানি ব্যতৃনৎ স্বয়ম্ভূঃ"।

কোন সর্ব্বজনগ্রাহ্য শাস্ত্র শুদ্ধ পারলৌকিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই প্রস্তুত হইতে পারে না। কোন সুদূরদর্শী শাস্ত্রকারের চক্ষে পারলৌকি সুখসমৃদ্ধি, ইহলৌকিক সুখ সমৃদ্ধি হইতে সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্ররূপে প্রতীয়মান হইতেও পারে না। অপ্রত্যক্ষ স্বর্গ নরকাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া "ইহৈব নরকঃ স্বর্গঃ" এই কথা লইয়াই যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলেও সংসার মধ্যেই পূর্ব্বলোক, বর্ত্তমান লোক এবং পরলোক তিনটী লোকই দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমাদিগের পূর্ব্বগত পুরুষেরা আমাদিগের পূর্ব্বলোক, আমরা বর্ত্তমান লোক, এবং আমাদিগের পরবর্ত্তী পুরুষেরা পরলোক। যদি বর্ত্তমানের লোকেরা দৈহিক এবং মানসিক গুণে উৎকৃষ্ট হইতে না পারেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী পুরুষেরা বর্ত্তমান লোকদিগের অপেক্ষা উৎকর্ষলাভ করিতে পারিবেন না।

ফলতঃ পরোক্ষপ্রিয়, দেবস্বভাব আর্য্য-শাস্ত্র, বর্ত্তমান লোককে ভাবী বা পরলোকের সাক্ষাৎকারণ স্বরূপ জানিয়া এবং সেই পরলোকের প্রতি বিশিষ্টরূপে স্নেহবান হইয়া তাহারই হিতার্থে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শম দম যমাদির উপদেশ পরোক্ষ দৃষ্টি মূলক, কিন্তু উহা ইহলোকেরও হিতসাধক। উহাদিগের উপদেশে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়ের সামঞ্জস্য বিধান হইয়া আছে।

তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, ভারতবাসী কিম্বা চীনদেশনিবাসীদিগের ব্যবহারের এবং কথাবার্ত্তার সহিত ইউরোপীয় জাতীয় লোকের ব্যবহারাদি এবং বাক্যালাপের তুলনা করিয়া দেখিলে ইউরোপীয়রা যে সত্য সত্যই পরকালে বিশ্বাস করেন, তাহা বোধই হয় না। তাঁহাদিগের মধ্যে চিরকালাবধি ঐহিকতার প্রাবল্য; আজি কালি উহা আরও প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। এখন উহাঁদিগের মধ্যে যে মতবাদ সাধারণ্যে পরিগৃহীত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সারভাগ এই——

সুখই পরম পুরুষার্থ। সুখ প্রাপ্তির কাল বর্ত্তমান। সুখ প্রাপ্তির স্থান এই পৃথিবী।*

পূর্ব্বকালে কোন সময়ে অবিকল ঐরূপ ঐহিকতা ভারতবর্ষেও দেখা দিয়াছিল। চার্ব্বাক বা লোকায়তিক মতের সারাংশ সংগৃহীত হইয়া উক্ত হইয়াছে——

স্বর্গ নাই অপবর্গ নাই পারলৌকিক আত্মাও নাই। * * যত দিন বাঁচিবে সুখে থাকিবার চেষ্টা করিবে। ঋণ করিয়াও ঘৃত ভোজন করিবে। শরীরটা পুড়িয়া ভস্ম হইলে উহার আর প্রত্যাগমন কোথায়? †

অতএব ভারতবর্ষে পাশ্চাত্যভাবের অবয়বীভূত ঐহিকতার প্রবেশে কোন একটা নূতন ভাবের প্রবেশ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এখনকার ইংরাজী শিক্ষা এবং ইংরাজ সংসর্গ পূর্ব্বকালের সেই লোকায়তিক মতবাদের পুনঃ প্রাবল্যসাধন করিতেছে মাত্র। বাস্তবিক সকলেই দেখিতে পাইতেছেন যে, পাশ্চাত্য ভাবের প্রভাবে যত গুলি ব্যাপার সংস্কার কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত এবং আন্দোলিত হইতেছে, তাহার একটীও মনুষ্যের চিত্ত শুদ্ধির অনুকূল নহে। সকল গুলিই অত্যধিক পাশবভাবের অনুকূল, একটীও দিব্যভাবের অনুকূল নয়। একটীও ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধের পক্ষ নহে। সকলগুলিই ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদক।

---

* Happiness is the only good.
The time to be hapyy is now.
The place to be happy is here.

† নস্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।

* * *

যাবজ্জীবেৎ সুখংজীবেৎ ঋণংকৃত্বাঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥

এক জন অতি প্রধান মুসলমান মৌলবীর সহিত কথোপকথন কালে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, তোমাদিগের মধ্যে ইংরাজিনবিসেরা যত সংস্কার কার্য্যের উল্লেখ করেন, তাহার একটীও কঠোর ব্যবহারের অনুকূল হয় না কেন? হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রধান গুণই এই যে, এই জাতীয় লোকেরা অন্যান্য জাতীয়দিগের অপেক্ষা ইন্দ্রিয় দমনে সুশিক্ষিত—ইহারা কখনই নিতান্ত ইন্দ্রিয়সুখপরায়ণ হয় না। এই গুণ থাকাতেই হিন্দু জাতি এতদিন বাঁচিয়া রহিয়াছে—এই গুণ থাকাতেই মুসলমানদিগের ভগ্নাবস্থা হইলেও হিন্দুদিগের ভগ্নাবস্থা হয় নাই; তাহারা পুনর্ব্বার তেজ করিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এই বারে বুঝি হিন্দুর সেই চিরসঞ্চিত গুণের লোপ হইবে—হিন্দু একান্ত ঐহিকতার দাসত্ব পাইবে। ইন্দ্রিয়দমনমূলক না হইলে প্রকৃত সংস্কারকার্য্য হয় না।" কথাটী অনেক দিনের, কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের অনুরূপ। বোধ হয় সেই জন্য এখনও মনে রহিয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্যভাব—স্বাতন্ত্রিকতা।

সকল সমাজেই দুইটী বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ লক্ষিত হইয়া থাকে। তাহার একটীর নাম সামাজিকতা, অপরটীর নাম স্বাতন্ত্রিকতা বলা যায়। যে শক্তির প্রভাবে সমাজান্তর্গত পরিবার সমূহ পরস্পর সহানুভূতি সম্পন্ন এবং কিয়ৎ পরিমাণে এক প্রকৃতিক এবং একাকার হইয়া যায় তাহার নাম সামাজিকতা। আর যে শক্তির প্রভাবে প্রত্যেক পরিবার আপনাপন সুখ দুঃখ, হিতাহিত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার পূর্ব্বক পরস্পর পৃথকভূত থাকে, এবং যাহার প্রাবল্যে কখন কখন সমাজবিধির পরিবর্ত্ত ঘটিয়া যায়, তাহার নাম স্বাতন্ত্রিকতা।

সমাজ ভেদে ঐ দুইটী শক্তির তারতম্য দৃষ্ট হয়। সময়ভেদে কোন সমাজে সামাজিকতার আধিক্য, আর কোন সমাজে স্বাতন্ত্রিকতার আধিক্য হইয়া থাকে। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় সমাজে বহুকালাবধি সামাজিকতার সবিশেষ প্রাবল্য ছিল। ঐ সকল লোকেরা জন্মভূমি এবং আত্ম সমাজকেই সমুদায় ভক্তি, শ্রদ্ধা, এবং প্রেমের আস্পদ স্বরূপে জানিত। উহাদিগের হৃদয়ে আত্মসমাজটাই যেন সাক্ষাৎ পরমেশের স্থানীয় হইয়াছিল। ইহাদিগের বিবেচনায় সমাজের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ অপেক্ষা উদারতর ধর্ম্মকার্য্য আর কিছুই হইতে পারিত না এবং উহাই অক্ষয় স্বর্গলাভের এবং পুরুষার্থ সাধনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া গণ্য হইত। উহাদিগের আরাধ্য এবং উপাস্য দেব দেবীগুলিও সমাজান্তর্গত বিশেষ বিশেষ শক্তির অথবা স্বদেশীয় বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রতিরূপ স্বরূপ ছিল। প্রাচীন গ্রীক এবং রোমীয় সমাজের এই প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া কোন বিচক্ষণ দার্শনিক স্থির করিয়াছেন যে, উহাদিগের সামাজিকতাই অতি দৃঢ়ীভূত এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

নব্য ইউরোপীয় সমাজগুলির গঠন কতকটা গ্রীক এবং রোমীয়ের ছাঁচেই হইয়াছে—কারণ নব্য ইউরোপের শিক্ষা গ্রীস এবং রোম হইতে। কিন্তু নব্য ইউরোপের ধর্ম্মশাস্ত্র ইউরোপের বাহির হইতে আসিয়াছে। ঐ শাস্ত্র তাঁহাদিগের নিজ সমাজসম্ভূত বা তাহারই ছায়াভূত নহে। উহা রোমীয় সাম্রাজ্য বিস্তারের চরম দশায় প্রাদুর্ভূত এবং সর্ব্বজনীনপ্রায় এই জন্য ইউরোপীয়ের ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং প্রেমের পদার্থ সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট বস্তুতেই নিবদ্ধ হয় নাই। গ্রীক এবং রোমীয়ের চক্ষে আত্ম সমাজই যেমন সর্ব্ব প্রধান এবং অতি ব্যাপকরূপে প্রতিভাত হইত, নব্য ইউরোপীয়ের চক্ষে, সমাজ সেরূপে প্রতিভাত হয় না। উহারও দোষ গুণ বিচার করিবার উপযোগী একটী মানযন্ত্র, নব্য ইউরোপীয় পাইয়াছেন এবং সেই জন্য সমাজের সংস্কারকার্য্য তিনি আপনার সাধ্যা-

রত্ত জ্ঞান করেন। গ্রীক এবং রোমীয় মনে করিতেন যে, সমাজ আপনার নিদানভূত সকল ব্যক্তির প্রতি সর্ব্বক্ষণ কর্তৃত্ব করিতে পারেন এবং ব্যক্তিবিশেষের সুখ, সমৃদ্ধি, জীবন পর্য্যন্ত তাঁহার নিজের সংরক্ষণ এবং পুষ্টিসম্বর্দ্ধনার্থ গ্রহণ করিতে পারেন। নব্য ইউরোপীয়ের চক্ষে সমাজের ততটা অধিকার সম্যক্ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য ইউরোপীয় সমাজে গ্রীক এবং রোমীয়দিগের সমাজ অপেক্ষা স্বাতন্ত্রিকতার অধিকার সমধিক বিস্তৃত।

ইউরোপীয় গ্রন্থকর্তৃবর্গ তাঁহাদিগের প্রাচীন এবং নব্য সমাজের মধ্যে এই প্রভেদটী লক্ষ্য করিয়াছেন এবং সকল প্রাচীন সমাজের প্রকৃতিই গ্রীক এবং রোমীয়দিগের কতকটা অনুরূপ হইবে, মনে মনে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া ভারতবর্ষীয় সমাজেও সামাজিকতার অত্যাধিক্য এবং স্বাতন্ত্রিকতার অতি ন্যূনতা অবধারিত করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা সেই জন্যই বলিতেছেন যে, ইংরাজ সমাগমে ভারতবর্ষে স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি হইয়া ভারতবর্ষের সমূহ উপকার হইতেছে।

উল্লিখিত গ্রন্থকর্তৃবর্গের কথাটী দুই দিক হইতে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে। এক দিক এই—সামাজিকতা এবং স্বাতন্ত্রিকতার পরস্পর মর্য্যাদা কিরূপ? অর্থাৎ উহাদিগের মধ্যে কোন একটী সীমা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে কি না? অন্য দিক এই—ভারতবর্ষে ঐ দুই শক্তির মধ্যে কোনটী অযথা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া আছে কি না? যদি থাকে সেটী কোন্ শক্তি? এই দুইটী কথার বিচার করিলেই ইংরাজ সমাগমে আমাদিগের সামাজিকতা এবং স্বাতন্ত্রিকতার কিরূপ সীমানিবেশ হইতেছে তাহা বুঝা যাইবে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, গ্রীক এবং রোমীয়দিগের মধ্যে উদারতম ধর্ম্মজ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই। উহারা জানিত যে, আপনাপন সমাজের হিতসাধনার্থে সকল কাজই করিতে পারা যায়—অর্থাৎ অপর সমাজের হানি করায় কোন দোষ হয় না। গ্রীক এবং রোমীয়

দিগের সম্বন্ধে ইউরোপীয়েরা এ কথাও বলিয়া থাকেন যে, ঐ ঐ জাতীয় লোকেরা ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগের দেশাচার ও কুলাচার এবং দেশ ব্যবহার ও কুল ব্যবহারকেই ধর্ম্মের নিদানভূত বলিয়া মনে করিত এবং ঐ আচার এবং ব্যবহার রক্ষা করিয়া চলিলেই তাহারা আপনাদিগেক সাধিত পুরুষার্থ বলিয়া জানিত।

ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের ঐ কথাগুলি কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও উহার কতকটা যাথার্থ্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। অন্যান্য বিষয়েও যেরূপ হইয়া থাকে, ধর্ম্মজ্ঞান লাভেও মনুষ্যের অবস্থা সেইরূপ হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞানও ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়া উহা প্রথমতঃ কুলাচারে দেশাচারে এবং সামাজিক বিধিতে নিবদ্ধপ্রায় লক্ষিত হয়। ধর্ম্মজ্ঞানের উদ্বোধক প্রীতি। সম্যক ন্যায়পরতার বিকাশও প্রীতিমূলক। প্রীতিটী প্রথমে স্বজনদিগের প্রতিই সঞ্চরিত হইয়া থাকে। উহা আত্মপরিবার, গোত্র এবং সমাজ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সাধারণ জনগণের পক্ষে তাহাতেই নিবদ্ধ থাকিয়া যায়। আজি পর্য্যন্ত মানুষের প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান ঐ অবস্থাকে সর্ব্বতোভাবে অতিক্রম করে নাই। নিজ সমাজের বহির্ভূত বর্ব্বর জনগণের প্রতি গ্রীকেরা এবং প্রাথমিক রোমীয়েরা যেরূপ নির্দ্দয় আচরণ করিত, নব্য ইউরোপীয়েরাও কি ইউরোপীয়েতর জনগণের প্রতি কতকটা সেইরূপ আচরণ করেন না? কিন্তু তাহা করিলেও নব্য ইউরোপীয়দিগের মনে ধর্ম্মবুদ্ধির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতি এবং উদারতা জন্মিয়াছে, এবং যে পরিমাণে তাহা জন্মিয়াছে সেই পরিমাণে তাঁহাদিগের সমাজতন্ত্রতাও কিছু শিথিল হইয়াছে। পরবর্ত্তী বন্ধনের বলে পূর্ব্ববর্ত্তী বন্ধনের দৃঢ়তা ন্যূন হয়। অতএব উদারতর সহানুভূতির উদ্গমে পূর্ব্বাবস্থার তীব্রতর সহানুভূতি স্তিমিততেজঃ হইয়াছে। এখন লোকে কুলাচার বা দেশাচার বা সমাজবিধি লইয়াই ন্যায়ান্যায় বিচারের পরিসমাপ্তি করিতে পারে না—ঐ সকলের পরেও একটী স্বতন্ত্র ধর্ম্মবিধি দেখিতে পায় এবং কতকটা তাহার অনুযায়ী হইতে চেষ্টা

করে। এইরূপে গ্রীক এবং রোমীয়ের সুদৃঢ় সমাজিকতার অভ্যন্তরে একটু স্বাতন্ত্রিকতা প্রবিষ্ট হইয়া নব্য ইউরোপীয় সমাজকে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর করিয়া তুলিয়াছে।

এখন দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষীয় সামাজিকতা কি গ্রীক বা রোমীয়দিগের সমাজতন্ত্রতার ন্যায় অতি দৃঢ় সম্বদ্ধ এবং আপনার অন্তর্নিবিষ্ট জনগণ ভিন্ন অপর সকলের প্রতি সহানুভূতিশূন্য? এ কথা মুখেও আনিবার যো নাই। সর্ব্বময় ব্রহ্মবাদপরায়ণ হিন্দু—অপর দেশীয় মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সকল জীবের প্রতিই সহানুভূতি বিশিষ্ট। সামাজিক বিধি ব্যবস্থার প্রতি, দেশাচারের প্রতি এবং কুলাচারের প্রতি হিন্দুর শ্রদ্ধা ভক্তি অতি প্রোজ্জ্বল বটে। কিন্তু হিন্দুর ধর্ম্মজ্ঞান ঐ গুলিতেই সম্বদ্ধ নহে। ঐ গুলি তাঁহার মূল ধর্ম্মজ্ঞানের অন্তর্ভূত বলিয়াই উহারা ধর্ম্ম্য এবং পালনীয়। মনু ধর্ম্মের লক্ষণে সদাচার এবং শাস্ত্রীয় বাক্যেরও অতীত একটী পদার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভিঃ নিত্যমদ্বেষ রাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যোধর্ম্ম স্তন্নিবোধত॥

ঐ "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ" বিশেষণটীর দ্বারা শাস্ত্র শাসনের এবং সাধু আচারের উর্দ্ধবর্ত্তী ধর্ম্মলক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল এবং অপর বিশেষণ গুলির দ্বারা উচ্ছৃঙ্খলতার নিবারণ হইল। যে কেহ আপনার হৃদয় কর্ত্তৃক কোন কার্য্যে অভ্যনুজ্ঞাত হইলেই যে তাহা ধর্ম্মকার্য্য হইবে না এ-কথাও বলা হইল। ফলতঃ "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ" বলায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রিকতার সম্পূর্ণ অস্তিত্বই স্বীকৃত হইল।

অতএব ধর্ম্মতত্ত্বের উন্নতি প্রভাবে সামাজিকতার বন্ধন যত টুকু শিথিল থাকার প্রয়োজন তাহা হিন্দু সমাজে হইয়া আছে। সুতরাং স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত অনুদার ধর্ম্মজ্ঞানের সংস্রবে সম্পাদিত হইতে পারে না।

কিন্তু সমাজ মধ্যে স্বাতন্ত্রিকতার আর একটী স্থল আছে। কুলাচার, দেশাচার এবং সমাজবিধির বশীভূত থাকিতে থাকিতে ঐ গুলি এমন অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, আর উহাদিগের হেতুর বা তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান হয় না। এইরূপ হওয়াতেও এক প্রকার অন্ধসামাজিকতা জন্মে। শাস্ত্রে ইহার দোষ প্রখ্যাপিত হইয়া উক্ত হইয়াছে "যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে"। ভারতবর্ষে যখন দেশীয় রাজাদিগের আধিপত্য ছিল, তখন যে প্রদেশে যেরূপ প্রয়োজন পড়িত, তদনুযায়ী নূতন নূতন ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্তৃবর্গের দ্বারা প্রণীত ও রাজাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইত। কোন কোন স্থলে নব নব সংহিতাও জন্মিত; কিন্তু অধিক স্থলেই পুরাতন সংহিতারই নূতনরূপ ব্যাখ্যা হইত। আর কখন বা মহাত্ম ব্যক্তিবর্গ মিলিত হইয়া বহুপ্রদেশব্যাপক ব্যবস্থার পরিবর্ত্ত এবং নূতন বিধির প্রণয়ন করিতেন। কিন্তু এক্ষণে আর ঐরূপ হইতে পায় না। এখন এদেশের বিধি ব্যবস্থা ইংরাজ রাজেরই ইচ্ছানুযায়ী হইয়া থাকে। তাহাতে দেশীয় জনগণের মধ্যে প্রকৃত স্বাতন্ত্রিতা জন্মিতে পারে না। যদি দেশীয় জনগণের প্রয়োজনানুরূপ সামাজিক ব্যবস্থাপন কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায় নিজ সমাজের মুখাপেক্ষী মহানুভব ব্যক্তিদিগের সন্মিলন এবং চেষ্টা সম্ভূত হয় এবং সেই সকল বিধি জন সাধারণ কর্ত্তৃক সমাজ শাসনের বলেই পরিগৃহীত এবং প্রতিপালিত হয় তাহা হইলেই সমাজের মধ্যে প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতার জীবন্ভাব বিদ্যমান হইতে পারে। এক্ষণে যেরূপ হইতেছে তাহাতে প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতা ক্রমশঃই ন্যূন হইয়া পড়িতেছে।

পরন্তু যাঁহারা ইংরাজ সমাগমে স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি হইয়াছে বলেন, তাঁহারা সামাজিকতার অন্তর্ভূত উল্লিখিত দ্বিবিধ স্বাতন্ত্রিকতার মধ্যে কোনওটির কথাই মনে করেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা যে ভিন্ন জাতীয় রাজার অধিকারে অবস্থিত হইয়া আত্মসমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতি ব্যবহারাদির প্রতি অব্যাঘাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন,

সেই স্বাতন্ত্রিকতার প্রতিই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। ঐ স্বাতন্ত্রিকতাটা অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু। সকল সমাজেই আহার, বিহার, লোকলৌকিকতা, রীতি ব্যবহারাদির এক একটা পদ্ধতি পড়িয়া যায়। ওগুলি প্রায়ই তত্তদ্দেশের যথাযোগ্য হইয়া থাকে। ওগুলির পরিহারে বা পরিবর্ত্তে বিশেষ উপকার নাই। প্রত্যুত পরিহার এবং পরিবর্ত্ত চেষ্টায় সমাজের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ হয় মাত্র, এবং সমাজের প্রতি তাচ্ছিল্যভাবে ধর্ম্মবুদ্ধির মূলে কুঠারাঘাত হইয়া যায়। কারণ ধর্ম্মবুদ্ধি সহানুভূতি হইতেই উদ্গত এবং সহানুভূতির প্রকৃত ক্ষেত্র আত্মসমাজ। ইউরোপীয়দিগের মধ্যেত পানভোজনাদি সম্বন্ধে কোন বিশেষ বিধি নিষেধ প্রচলিত নাই। তথাপি উহাঁরা স্ব স্ব সমাজ প্রচলিত রীতি পরিত্যাগ করেন না। কোন ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়া হ্যাট কোট ছাড়িয়া পাগড়ী চাপকানের ব্যবহার করেন না; অথচ তাঁহারা সকলেই বলিয়া থাকেন যে, পাগড়ী চাপকানই এদেশের যোগ্যতর পরিচ্ছদ। মদ্যপান স্বাস্থ্যের হানিকর জানিয়াও প্রায় কোন ইংরাজ তাহা ভোজকালীন পরিত্যাগ করেন না। বস্তুতঃ সমাজ প্রচলিত নিয়ম সকল রক্ষা করিয়া চলাই ভাল।

স্বাতন্ত্রিকতার যেরূপ প্রবৃত্তিতে সামাজিকতার ব্যাঘাত হয় না, তাহার উদাহরণ বর্ত্তমান জাপনীয়দিগের ব্যবহার দর্শনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাপানীয়রা এক্ষণে ইউরোপীয় অনুকরণে রত। কিন্তু উহাঁরা যে ইউরোপীয় ব্যবহারের অনুকরণ করেন, তাহা প্রথমতঃ আপনাদিগের সম্রাট এবং সচিব সভার অনুমোদিত হইলে, তবে অনুকরণ করেন। যাহার মনে যাহা আসিবে সে তাহাই তৎক্ষণাৎ অনুকরণ করিবে, জাপানীয়দিগের মধ্যে এ প্রকার রীতি প্রবর্ত্তিত হয় নাই। জাপানীয়দিগের ইচ্ছা হইল যে, ইউরোপীয়দিগের ন্যায় টুপি ব্যবহার করে; তাহারা সম্রাটের নিকট আবেদন করিল, সম্রাট তদর্থে অনুমতি পূর্ব্বক আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে, ইউরোপীয় অনুকরণে টুপির

ব্যবহার তাঁহার অনভিমত নহে। তাহার পর জাপানীয়েরা ইউরোপীয় ধরণে টুপি পরিতে লাগিল। এইরূপে স্বাতন্ত্রিকতার প্রবেশ সর্ব্বতো-ভাবে নির্দ্দোষ। প্রতি ব্যক্তিকৃত অনুকরণে সমাজের অবমাননা হয়, সমাজকৃত অনুকরণে অনেক স্থলে তাহার সজীবতাই বুঝা যায়।

চীনীয়দিগের মধ্যেও কখন কখন সমাজ বিধির প্রয়োজনোপযোগী অন্যথা করা হয়। কিন্তু তাহাও সমাজান্তর্গত ব্যক্তিবিশেষের স্বেচ্ছা-সম্ভূত হয় না। চীনীয় সম্রাট সকল বিধির বিধাতা। তিনি স্বশরীরে সমুদায় সমাজশক্তি ধারণ করেন। তাঁহার আজ্ঞাক্রমে সমাজ বিধির পরিবর্ত্ত হইতে পারে। দেবতাদিগের পূজাবিধিও তাঁহার আজ্ঞায় পরি-বর্ত্তিত হইয়া যায়। ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট সভাও প্রচলিত সমাজবিধির অন্যথা এবং নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত করিতে সমর্থ।

প্রত্যুত সকল সমাজেই কোথাও না কোথাও একটী স্বাধীন শক্তির স্থান আছে। পরাধীনতা নিবন্ধন ভারতবর্ষে সেই শক্তি আর সমস্ত সমাজ ব্যাপক হইয়া নাই—উহা সম্প্রদায় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভাজিত হইয়া পড়ি-য়াছে। তাহাতে ভারতবর্ষীয় সমাজের স্বাতন্ত্রিকা অতি বিসৃতরূপ হইয়া সমাজের পূর্ণ সজীবতার ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। এমন অবস্থায় ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রিকতার বৃদ্ধি কখনই অপকারক বই উপকারক হইতে পারে না। এখন সমাজান্তর্গত জনগণের মধ্যে বশ্যতা, পরস্পর সহানুভূতির আধিক্য এবং সম্মিলনই একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্রিকতা অবশ্য পরিহার্য্য।

উপসংহারে বক্তব্য এই (১) যথায় সামাজিকতা নিবন্ধন অপরাপর সমাজান্তর্গত লোকের প্রতি অন্যায়াচরণ হয়, তথায় ধর্ম্মজ্ঞান প্রণোদিত স্বাতন্ত্রিকতার প্রবেশ বাঞ্ছনীয়। (২) যে সামাজিকতার প্রভাবে সামাজিক নিয়মগুলির মূলীভূত হেতুসমূহ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় লোকদিগেরও মন হইতে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়, তথায় হেতুবাদ প্রকট করিয়া উচ্ছৃঙ্খল স্বাতন্ত্রিকতার উদ্রেক নিবারণ করা আবশ্যক। (৩) সমাজবিধির পরিবর্ত্ত,

সমাজের প্রতি পূর্ণসহানুভূতি সম্পন্ন, সুদূরদর্শী মহাত্মাদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইতে পারে। অপর সকলের সমাজ সংস্কার চেষ্টায় পাশবভাব এবং উচ্ছৃঙ্খলতার বৃদ্ধি হয়, সামাজিক নিয়ম এবং দেশাচারের প্রতি বিদ্বেষ প্রকটিত হয় এবং লোকের মুখাপেক্ষতার প্রতি তাচ্ছিল্য হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধির ক্ষীণতা জন্মায়।

এখন স্পষ্টই দৃষ্ট হইল যে, প্রথম সূত্রের উল্লিখিত যে স্বাতন্ত্রিকতা তাহা হিন্দুর যেমন আছে, ইউরোপীয়দিগেরও তেমন নাই। ইংরাজ প্রদত্ত শিক্ষায় পুরাতন প্রথার প্রতি অশ্রদ্ধা সঞ্চারে ঐ সকল প্রথার মূলীভূত হেতু সমূহ প্রকট হইতেছে না। অন্ধ অনুকরণ স্রোতমাত্র চলিতেছে এবং উচ্ছৃঙ্খলতারই বৃদ্ধিদেখা যাইতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে দ্বিতীয় সূত্রোল্লিখিত প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতার উদ্রেক হইতেছে না।

পাশ্চাত্যভাব—বৈজ্ঞানিকতা।

বিজ্ঞান অতি প্রধান বস্তু। ইয়ুরোপীয়েরা বিজ্ঞানের অনুশীলনপ্রভাবে ধন এবং বলের বৃদ্ধি করিয়া পৃথিবীর অপর সকল মনুষ্য অপেক্ষা অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছেন। মিশর যুদ্ধের সময় একজন ইংরাজ আপনাদিগের পোতবাহিনীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"এসিয়া এবং অফ্রিকা খণ্ডের মধ্যে এমন একটীও জাতি নাই, যাহা কর্ত্তৃক এই রণতরীগুলির আক্রমণ সহ্য হইতে পারে।" বস্তুতঃ পৃথিবীর অপর কোন ভাগের লোকেরাই আর ইয়ুরোপীয়দিগের প্রতিপক্ষতা করিতে সমর্থ নহে। দেখ, একমাত্র ষ্টান্‌লী সাহেব, তিনি কোন দেশের রাজা বা রাজপ্রতিভূ কিম্বা প্রধান রাজপুরুষ কিছুই নহেন তথাপি, কয়েকশত ইয়ুরোপীয় সখের ফৌজ সঙ্গে লইয়া আফ্রিকাখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সেই ভূভাগকে

ওতপ্রোত করিয়া ফেলিয়াছেন।* আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যেও দুই জন পাঁচজন ইউরোপীয় বা তদ্বংশসম্ভূত ব্যক্তি অকাতরে চলিয়া যায়—আদিম নিবাসীদিগের বৃহৎ বৃহৎ গোষ্ঠীগুলি সম্মিলিত হইয়াও তাহাদিগের গতিরোধে সমর্থ হয় না।

যুদ্ধে যেরূপ অপ্রতিহতপ্রভাব, বাণিজ্য ব্যাপারেও ইউরোপীয়েরা তদ্রূপ। তাহাদের সার্থবাহ বণিক্ এবং বাণিজ্যপোত ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, এবং যেখানে যাইতেছে সেই দেশেই প্রভুত্বলাভ করিতেছে। ইউরোপের এক একটী বণিক সম্প্রদায় অপরাপর দেশে রাজচক্রবর্ত্তী। ইহার উদাহরণ, এক ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের আধিপত্য শুদ্ধ অপরাপর মানুষের উপরেই হয়, এমন নহে। উহারা বাণিজ্যের সৌকর্য্যার্থে যেন ভূতলকে নূতন করিয়াই গড়িতেছে। সুয়েজ প্রণালী দ্বারা আফ্রিকা খণ্ডকে একটী দ্বীপে পরিণত করিয়াছে, পাণেমা প্রণালীর দ্বারা উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকাকে দ্বিভাজিত করিতেছে, সেনিসের সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া অল্পস্ পর্ব্বতের বক্ষ বিদারণ করিয়াছে, আর সাহারা মরুতে একটী অভিনব সাগরের প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া ঐ বালুকাময় ভূভাগের প্রকৃতি পরিবর্ত্ত করিবার উদ্যম করিতেছে। বাষ্পীয় তরী, বাষ্পীয় শকট, এবং তাড়িতবার্ত্তাবহ দ্বারা দূরত্ব এবং কালের ব্যবধানও অনেক পরিমাণে তিরোহিত করিয়াছে।

কিন্তু ইউরোপের বাহিরে ইউরোপীয় মহিমা যে উৎকটভাব ধারণ করে, ইউরোপের অভ্যন্তরে উহার ভাব তেমন বিস্ময়ব্যঞ্জক নহে। ইউরোপের বহির্ভাগে জনকয়েক ইউরোপীয় সম্মিলিত হইলেই এক একটী জাতিকে পদদলিত করিতে পারে। কিন্তু ইউরোপের ভিতরে কোন এক জাতীয় লোক অপর জাতীয় লোক অপেক্ষা তেমন প্রবল হইতে পারে না। সেখানে যদি কোন দেশ দুইখানি রণতরী অথবা দুই পাঁচ সহস্র সৈনিকের বৃদ্ধি করিয়া তুলে, অমনি অপর সকল দেশকে সাবধান হইয়া অপনাপন বলবৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। তুরস্কও যদি কিছু সেনার বৃদ্ধি করে, রুসিয়

ও অষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যকে তজ্জন্য সতর্ক হইতে হয়। আর আজি কালি দৃষ্ট হইতেছে যে, ইউরোপের বহির্ভাগেও যদি কোন জাতি ইউরোপীয় যুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে, ইউরোপীয়েরা তাহাকেও কিছু ভয়, ভক্তি, এবং সম্মান করেন। চীন ফরাসী যুদ্ধে বিলক্ষণ সপ্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, ইউরোপীয়েতর জাতিরাও ইউরোপের শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সংগ্রামস্থলে ইউরোপীয়ের সমকক্ষ হইয়া উঠে। চীনেরা ফরাসি সৈন্যের পরাভব করিয়াছে। ইংরাজকর্ত্তৃক শিক্ষিত সিপাহীরাও পূর্ব্বে ফরাসী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। ইউরোপীয়দিগের কল আনাইয়া বোম্বাইয়ের পারসি এবং হিন্দু বণিকেরা চীন, জাপান, মোজাম্বিক প্রভৃতি দেশে ইংরাজ বণিকদিগের অপেক্ষাও সস্তাদরে কাপড় বিক্রয় করিতেছে।

ফলতঃ ইউরোপের শিক্ষা এবং কলকৌশল হইতেই ইউরোপের প্রাধান্য। সেই শিক্ষা এবং কলকৌশল সমস্তই বিজ্ঞানমূলক, সুতরাং বিজ্ঞান অতিশয় আদরের এবং গৌরবের বস্তু। যত্নপূর্ব্বক উহার প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক, যদি ইংরাজের সংস্রবে আমাদিগের বিজ্ঞানবিদ্যালাভ হইয়া থাকে, এমন হয়, তবে অনেক লাভই হইয়াছে, স্বীকার করা যায়।

প্রথমে দেখা যাউক, বিজ্ঞানটা কি, পরে দেখিব উহা আমরা পাইতেছি কি না।

মনুষ্য আপন হৃদয়ে যে পরাৎপর আদর্শ পুরুষের অনুভব করে, তাহাকে সর্ব্বজ্ঞতার আধার বলিয়াও ভাবে। বস্তুতঃ মানুষের জ্ঞাতব্য বিষয় 'সর্ব্ব'। যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু ছিল, এবং যাহা কিছু হইবে, মানুষ তৎসমুদায়ই জানিতে চায়। জানিবার উপায়ের নাম প্রমাণ। জ্ঞাতব্য বিষয়ের ভেদ অনুসারে প্রমাণেরও একটা স্থূল ভেদ হয়। যাহা আছে, তাহার প্রমাণ একরূপ, যাহা হইয়াছিল, তাহার অন্যরূপ, এবং যাহা হইবে, তাহার প্রমাণও ভিন্নরূপ হয়। কিন্তু প্রমাণের ত্রিবিধতা এইরূপে মনোগত হইলেও প্রমাণ বস্তুতঃ ত্রিবিধ নহে। যে প্রমাণ অতীত বিষয়ে খাটে তাহা অপর দুই স্থলেও খাটে—যাহা বর্ত্তমানে খাটে, তাহাও অপর দুই স্থলে খাটে,

এবং যাহা ভবিষ্যতে খাটে, তাহাও অপর দুই স্থলে খাটে। শুদ্ধ তাহাই নয়, সকল প্রমাণ গুলিরই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা পরম্পরা সম্বন্ধে একমাত্র মূল, এবং ভূত, বর্ত্তমান, এবং ভবিষ্য সকলই একমাত্র সূত্রে গ্রথিত। সর্ব্ব প্রকার প্রমাণের মূল এবং উপজীব্য এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের সহিত অতি বিশিষ্টরূপে সম্বন্ধ যে প্রমাণ তাহার নাম প্রত্যক্ষ।

শরীরের পোষণ যেমন ভক্ষ্যগ্রহণের দ্বারা হয়, তেমনি জ্ঞানের পোষণও প্রত্যক্ষের দ্বারা হয়। সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষকে ছাড়িয়া জ্ঞানের উপায়ান্তর কিছুই নাই। প্রত্যুত অনুমানাদি অপর যে সকল প্রমাণ বা জ্ঞান-সাধনোপায়ের নাম, শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়া থাকে, তাহার একটীও বিনা প্রত্যক্ষে কার্য্যকারী নহে। প্রমাণের সংখ্যা দর্শন এবং শাস্ত্রকারেরা জনগণের বোধসৌকর্য্যার্থে বিস্তৃত করিয়াছেন, প্রত্যুত সকলগুলিরই ভিত্তি প্রত্যক্ষ এবং সকলগুলিরই নির্ভর এক মাত্র প্রত্যক্ষের উপর।

যেমন রেখাগণিতের প্রতিজ্ঞাগুলি পূর্ব্বেরটীর উপরে পরেরটী ব্যবস্থিত, যেমন একতলার উপরে দোতলা, তাহার উপর তিনতলা, উপর্য্যুপরি প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সকলগুলির চাপই ভিত্তি মূলের উপর, সেইরূপ অনুমান. শাব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সাম্ভবিক, ঐতিহ্য প্রভৃতি যতগুলি বিভিন্ন প্রকার প্রমাণের নাম হইয়া থাকে, তাহারা কেহই স্বতন্ত্র নয়—প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত তাহাদিগের কাহার অন্য কোন ভিত্তি নাই। এই জন্যই কোন দর্শনকার উহার মধ্যে কোন কোনটীকে ছাড়িয়া দিয়াও আপনার শাস্ত্রীয় মতবাদ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন। রেখাগণিতের মধ্যে যদি কোন একটী বা দুইটী বা ততোধিক প্রতিজ্ঞাকে উঠাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলেও মূল হইতে ধরিয়া লইয়া তাহাদিগের পরবর্ত্তী প্রতিজ্ঞাগুলির প্রমাণ হইতে পারে, এখানেও সেইরূপ হইয়া থাকে। অতএব যখন দেখা

যায় যে, কোন শাস্ত্রকার অষ্টপ্রমাণবাদী,* কেহ বা তিন প্রমাণবাদী, কেহ বা দুই কেহ বা একমাত্র প্রমাণবাদী, তখন ইহাই বুঝিতে হয় যে, উঁহারা সকলেই সকল প্রমাণই মানেন, তবে কেহবা কোন গুলিকে অপরের অন্তর্নিবিষ্ট মনে করায় অধিক সুবিধা বোধ করেন মাত্র। এস্থলে সংক্ষেপতঃ একটীমাত্র উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। সাংখ্যদর্শন, প্রত্যক্ষ অনুমান, এবং শাব্দ এই তিন প্রমাণ স্বীকার করেন; তিনি ন্যায় দর্শনের স্বীকৃত উপমান নামক প্রমাণটীকে অনুমানেরই অন্তর্ভূত করিয়া ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু শাব্দ প্রমাণও যে, অনুমানেরই অন্তর্গত তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। শাব্দ প্রমাণের তাৎপর্য্য আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস। কিন্তু কোন্ বাক্য বিশ্বাস-যোগ্য আর কোন্ বাক্য বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ বা ভূয়োদর্শন বই আর কিছুই নাই। অতএব প্রত্যক্ষ দ্বারাই প্রথমে আপ্ত-বাক্যতা সিদ্ধ হয়, তাহার পর একটী অনুমান এইরূপ হয় যে, যে বাক্য সর্ব্বস্থলে বিশ্বাস যোগ্য, সে এই বিশেষ স্থলেও বিশ্বাসযোগ্য। এইরূপে দেখা যায়, প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের উপরেই শাব্দ প্রমাণ সর্ব্বতো-ভাবে সংস্থাপিত। সুতরাং উহার স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করিলে যে, বিচারে দোষ হয়, এমত নহে। আবার দেখা যায় যে, অনুমান প্রমা-ণও ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ এবং ব্যাপ্তিজ্ঞান ভূয়োদর্শন বা প্রত্যক্ষ জনিত। অতএব অনুমানও প্রত্যক্ষ হইতে স্বতন্ত্র নহে। ফলকথা সকল প্রকার প্রমাণের প্রত্যক্ষতন্ত্রতা অতি বিস্পষ্ট এবং তাহা আর্য্য দার্শনিকেরাও স্বীকার করিতেন। শুদ্ধ তাহাই স্বীকার করিতেন এমত নহে, তাঁহারা

---

* প্রত্যক্ষ মিতি চার্বাকাঃ, অনুমিতি রপীতি কাণাদবৌদ্ধৌ, উপ-মিতি রপীতি নৈয়ায়িকৈকদেশিনঃ, শব্দো পীতি নৈয়ায়িকাঃ, অর্থাপত্তি রপীতি প্রাভাকরাঃ, অনুপলব্ধি রপীতি ভাট্টবেদান্তিনৌ, সম্ভবৈতিহ্যাব-পীতি পৌরাণিকাঃ, চেষ্টাপীতি তান্ত্রিকাঃ।

ইহাও মনে করিতেন যে, যে প্রমাণটী প্রত্যক্ষ হইতে যত দূরবর্ত্তী সেটী তত অল্পবল, এবং তাহা বিষয়বিশেষেই নিবদ্ধ। সকল প্রকার প্রমাণ সমপরিমাণে সবল নহে।

উল্লিখিত বিভিন্ন প্রমাণগুলি অষ্টম সংখ্যা পর্য্যন্ত যে ভাবে পর পর উক্ত হইয়াছে, তাহাতে উহারা যে ক্রমশঃ হীনবলরূপেই এবং বিষয় ভেদেই গ্রাহ্য এইরূপে শাস্ত্রকারদিগের প্রতীত হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা করে না। নবম প্রমাণ "চেষ্টা" বা স্পন্দন সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে উহা প্রথম প্রমাণ প্রত্যক্ষেরই অন্তর্ভূত। *

কিন্তু যদিও মূল দার্শনিকদিগের বিবেচনা এইরূপ যথাযথ হইয়াছিল বোধ হয়, তথাপি তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী টীকাকার এবং নব্য ব্যাখ্যাতৃগণ যেন বিভিন্নসংজ্ঞক প্রমাণগুলিকে পরস্পর স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যক্ষের বিরোধী প্রমাণকেও গ্রহণ করিতে তেমন সঙ্কুচিত হয়েন নাই।

সাধারণতঃ ইউরোপীয় দার্শনিকেরা ওরূপ করেন না। প্রকৃতরূপ প্রত্যক্ষের বিরোধী কোন প্রমাণই তাঁহারা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। অপর একটী রূপেও ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ প্রত্যক্ষের প্রতি সমাদর প্রদর্শন করেন। তাঁহারা সামান্য ইন্দ্রিয়বোধকেই প্রত্যক্ষ বলিয়া

---

* পূর্ব্বকালে পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়রূপে ইহার গণনা হয় নাই। এইজন্য প্রত্যক্ষের মধ্যে গ্রহণ না হওয়াতেই উহা তান্ত্রিক মতবাদিগণ কর্ত্তৃক স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া সর্ব্বশেষে উক্ত হইয়াছে, বোধ হয়। ফলতঃ আকাশ, কাল, শক্তি, অহং, এই চারিটী বোধ ইন্দ্রিয়াতীত বলিয়া যে গোলযোগ হইয়া আছে, যদি শারীর চেষ্টা সম্পাদনকে পূর্ব্বাবধি পঞ্চেন্দ্রিয়ের ন্যায় বোধের একটি স্বতন্ত্রপথ বলিয়া ধরা হইত, তাহা হইলে সেরূপ গোলযোগ হইত না। ঐ গুলি লইয়া কি এদেশে কি ইউরোপে অসাধারণ কষ্ট কল্পনা এবং অদ্ভুত কল্পনা সকল হইয়াছে।

গ্রাহ্য করেন না *। যেমন মোকদ্দমায় সর্ব্বপ্রধান সাক্ষীর একটীমাত্র কথা শুনিয়াই মীমাংসা করিলে অর্থাৎ তাহাকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা না করিলে এবং অন্য সাক্ষীর কথার সহিত মিলাইয়া না বুঝিলে বিচার ঠিক হয় না, সেইরূপ জ্ঞানের মৌলিক এবং সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ যে প্রত্যক্ষ, তাহাকেও বিশিষ্টরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং পূর্ব্ব সিদ্ধান্তের সহিত মিলাইয়া লওয়া আবশ্যক।

ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা এই কার্য্যে অতিশয় পটু। উঁহারা সর্ব্বদা সমূহ যত্নে প্রত্যক্ষরূপ সর্ব্বপ্রধান সাক্ষীর স্থানে তৎকর্ত্তৃক বক্তব্য সমস্ত কথা শুনিয়া লয়েন, এবং বহুপ্রকারে তাহার প্রতি জেরা করেন। এই কার্য্যপ্রণালীকে পরীক্ষা-বিধান বলে। ইহাতেই প্রত্যক্ষের স্থানে প্রকৃত সদুত্তর প্রাপ্তি হয়, এবং ইহা হইতেই বৈজ্ঞানিকতা জন্মে। ভারতবর্ষীয়েরা বাহ্য জাগতিক ব্যাপারে ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা স্বল্পতর পরীক্ষা বিধান করিয়াছেন, কিন্তু আন্তর্জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে তাঁহাদের পরীক্ষা বিধান অধিকতর হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তাদৃশ পরীক্ষাবিধান হইতেই হঠযোগ এবং রাজযোগের সূত্র সকল আবিষ্কৃত হইয়াছিল। যাঁহারা ওগুলিকে কাল্পনিক বলিয়া অশ্রদ্ধা করেন তাঁহারা অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণতা প্রদর্শন করেন মাত্র। যোগ সাধনাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই অনুশীলন হয়।

প্রকৃত বৈজ্ঞানিকতার অভ্যন্তরে আর একটী সূক্ষ্মতর বিষয় আছে। সেটীও প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রকৃতিনিষ্ঠ। প্রত্যক্ষ কার্য্যটী নিতান্ত অবিমিশ্র সরল ব্যাপার নহে। যেমন ভক্ষ্য গ্রহণ হইতে ভক্ষিত পদার্থের

---

* আমাদিগের দর্শনশাস্ত্রেও সামান্য ইন্দ্রিয়বোধে এবং প্রকৃত প্রত্যক্ষে ভেদ করা আছে। কিন্তু তাহা দুইটী বিশেষণ দ্বারা করা হইয়াছে। সামান্য প্রত্যক্ষকে "নির্ব্বিকল্প প্রত্যক্ষ" এবং প্রকৃত প্রত্যক্ষকে "সবিকল্প প্রত্যক্ষ" বলা হইয়াছে।

শোণিতে পরিণতি পর্য্যন্ত বহুবিধ শারীর কার্য্য হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রত্যক্ষের প্রারম্ভ হইতে তজ্জনিত ভাবাদির উদ্বোধ পর্য্যন্ত বহুপ্রকার মানসিক ক্রিয়ার সাধন হয়। খাদ্যদ্রব্য মুখবিবরস্থ হইলেই খাওয়া হয় না। উহার চর্ব্বণ, লালামিশ্রণ এবং উদরস্থ হওয়া আবশ্যক। বস্তুও ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হইলেই প্রত্যক্ষীভূত হয় না। উহার ইন্দ্রিয়গোচরত্ব এবং উহার দেশকালাদি সম্বন্ধে অবস্থান, পরিমাণ প্রভৃতির অনুভব সহকৃত চিত্তগামিত্ব সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। এই চিত্তগামিত্বের কার্য্যগুলিকেই মনোযোগ বলে; কারণ, ঐ কার্য্যগুলির দ্বারা ইন্দ্রিয়-বোধের সহিত মানসিককার্য্যের সংযোগ বুঝায়। তাহার পর, যেমন খাদ্য-দ্রব্য পাকস্থলী এবং অন্ত্রের মধ্যদিয়া যাইতে যাইতে উহাতে শরীরস্থ নানা প্রকার রসের সংযোগ হয় এবং উহা ক্রমশঃ কাহার সহিত সম্মিলিত কাহার হইতে পৃথক্‌কৃত হইয়া সর্ব্বশেষে শোণিতরূপে নিঃসৃত হয়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়লব্ধ বিষয় চিত্তস্থ হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি প্রভৃতির যোগে সমষ্টীকৃত এবং ব্যষ্টীকৃত হইতে থাকে এবং পরিণামে ভাবরূপ (বৌদ্ধেরা ইহাকে বিজ্ঞান বলেন) ধারণ করে। শারীর কার্য্যটীর নাম পরিপাক, মানস কার্য্যটীর নাম জ্ঞান-লাভ বা ভাব-গ্রহ। এইরূপে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, শোণিতও যেমন ভক্ষিত দ্রব্য হইতে পৃথক্‌ভূত, সেইরূপ ভাবগুলিও তাহাদিগের উদ্বোধক বাহ্য বস্তু হইতে পৃথকভূত। শোণিতেও যেমন শরীরজ রস অনেক মিলিত, সেইরূপ মনোভাবেও মানস ধর্ম্মের যথেষ্ট বিমিশ্রণ। প্রত্যক্ষ ব্যাপারটী ভাবের উদ্বোধক মাত্র, উহা স্বয়ং ভাব নহে। ভক্ষিত দ্রব্যও শোণিত জননের উপযোগী, উহা স্বয়ং শোণিত নয়।

এইরূপে প্রত্যক্ষীভূত বস্তুতে এবং তৎকর্ত্তৃক উদ্বুদ্ধ মনোভাবে যে পার্থক্য, তাহা ইদানীন্তনকালে ভারতবর্ষে সুপরিস্ফুটরূপে বিবেচিত না হওয়ায়, পদার্থবোধ সম্বন্ধে একপ্রকার দোষ জন্মিয়াছে—যেন ভাবের সহিত দ্রব্যের গোল বাধিয়া গিয়াছে। ইউরোপেও অন্তরূপে গোল বাধিয়া মনোভাব সংঘটনে মনের যে কার্য্যকারিতা আছে, সমুদায়ই যে ইন্দ্রিয়-গোচরত্ব মাত্রই

নহে, এই তথ্যের অনেকটা বিস্মৃতি হইয়াছে। শেষের দোষটী আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের ব্যাঘাতক হইলেও উহা বাহ্য বৈজ্ঞানিকতার তত হানিকর হইতে পারে না। প্রথম দোষটী বাহ্য বিজ্ঞানের হানিকর। শেষোক্ত ভ্রমসত্ত্বেও বাহ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যের আবিষ্করণে সামর্থ্য থাকিতে পারে; কারণ উহা দ্রব্যের স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাতক হয় না। প্রথম দোষে দ্রব্যের স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত হইয়া মনোমধ্যে যেন স্বপ্নময়তার একটা ছায়া পড়িয়া যায়।

এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তিতে বক্তব্য এই যে, বৈজ্ঞানিকতা বলিলে মনের এমন ভাবটী বুঝিতে হয়, যাহাতে—

(১) প্রত্যক্ষ সকল প্রমাণের মূল বলিয়া স্বীকৃত।

(২) প্রত্যক্ষের সহিত মিলাইয়া প্রমাণান্তর গৃহীত।

(৩) প্রত্যক্ষ প্রমাণ সমগ্রভাবে গ্রহণের জন্য পরীক্ষা-বিধানের আবশ্যকতা স্বীকৃত।

(৪) ব্যবহারিক বিষয়ে যেরূপ হওয়া আবশ্যক সেইরূপ বৈজ্ঞানিক বিচারে ভাবপদার্থে এবং দ্রব্য পদার্থে বিবেক সংরক্ষিত।

এইরূপ মনের ভাব এতদ্দেশীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে সংরক্ষিত না হওয়ায় আমাদিগের বাহ্যবিজ্ঞান শাস্ত্রের অধিকাংশেরই উন্নতি বহুকাল হইতে স্থগিত হইয়া গিয়াছে এবং উল্লিখিতরূপ বৈজ্ঞানিকভাব উদ্রিক্ত হওয়াতেই নব্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে বাহ্যবিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধন হইতেছে।

পাশ্চাত্যভাব—বৈজ্ঞানিকতা।

(২)

প্রত্যক্ষের এবং তাহারই অঙ্গীভূত পরীক্ষা-বিধানের সহিত নিরন্তর ঘনিষ্ঠ সংস্রবাধীন বৈজ্ঞানিকদিগের বুদ্ধিবৃত্তির সাধারণতঃ কয়েকটী লক্ষণ জন্মিয়া থাকে। তাহার দুই একটীর উল্লেখ করা আবশ্যক।

(১) প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান অতি সুস্পষ্ট হয়। উহা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের

আলোকে দৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অপচ্ছায়াবিহীন হইয়া থাকে। প্রত্যক্ষ দ্বারা যাহার অবগতি হয়, তাহাতে সন্দেহের স্থল নাই বলিয়াই ধারণা হয়, অর্থাৎ সমুদায়ই পরিষ্কার এবং পরিস্ফুট ভাবে বুঝিলাম বলিয়া মনে হয়, সুতরাং কল্পনাবলে বুঝিবার প্রয়োজন থাকে না। এইরূপ অভ্যাসবশতঃ বৈজ্ঞানিক ভাবাপন্ন পুরুষ যাহা বুঝেন, তাহা পরিষ্কার এবং পরিস্ফুটরূপেই বুঝিবার চেষ্টা করেন। একটা কিছু যেন জানিলাম মনে করিয়া তাঁহার মনের তৃপ্তি হয় না।

(২) প্রত্যক্ষ প্রমাণে বিশেষতঃ তাহার অন্তর্গত পরীক্ষাবিধানে বস্তুর সহিত সম্বন্ধটা অতি ঘনিষ্ঠ হয়—উহার অন্তর্ভাগে দৃষ্টি সঞ্চালিত হয়, উহার গায়ে হাত দিয়া নাড়া চাড়া হয়। তাহাতে যে শুদ্ধ বস্তুগ্রহই উত্তমরূপ হয়, এমত নহে, উহার অভ্যন্তরে কোন কিছু লুক্কায়িত ভাবে রহিল, এরূপ ভাবনারও অবসর হয় না। সুতরাং কল্পনাশক্তি-সংযত হইয়া পড়ে।

(৩) প্রত্যক্ষ প্রমাণটী মূলতঃ বর্ত্তমান লইয়া থাকে। বর্ত্তমানের, ভূত এবং ভাবীকে আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে। ইহা হইতেই মূলতঃ প্রাকৃতিক নিয়মের বোধ জন্মিয়া যায়। যাহা এখন দেখিতেছি, পূর্ব্বে এবং পরেও তাহাই ছিল এবং থাকিবে—এইরূপ সাদৃশ্যোপলব্ধি হইতে কার্য্য-জগত যে নিয়মের অন্তর্ভূত এই জ্ঞানটি জন্মে। এই জন্য নিয়মাবধারণ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রকৃতি।

(৪) নিয়মাবধারণ প্রবণতা হইতে আর একটী শুভময় ফল জন্মে। প্রকৃতির শক্তিগুলির সহিত সমধিকপরিচয় হয়। তাহাতে ভীতির ন্যূনতা হয়, এবং পরিণামে এমন একটী বিশ্বাস জন্মিয়া আইসে যে, মানুষ আপনিই আপনার সুখ দুঃখের কর্ত্তা হইতে পারেন।

কথার অধিক বাহুল্য না করিয়া উল্লিখিত কয়েকটীকেই বৈজ্ঞানিকতার লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করা যাউক। অর্থাৎ সামান্যতঃ মনে করা যাউক যে, বিজ্ঞানের প্রকৃত শিক্ষায় বস্তুগ্রহ পরিস্ফুট না হইলে সন্তোষ হয় না;

কল্পনাশক্তি সংযত হয়; নিয়মাবধারণে বিশিষ্ট প্রবণতা জন্মে এবং চেষ্টাশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

বুদ্ধি বৃত্তির এইরূপ শিক্ষা হইলে চিত্তেরও কতকটা বিশিষ্টতা ঘটে। যাহা তাহাতে বিশ্বাস হয় না, দ্রব্যগুণে হইল অথবা কালমাহাত্ম্যে হইল অথবা দেবাবির্ভাবে হইল এরূপ বন্ধ্য কারণের কল্পনাও হয় না, আর অদ্ভুত রসাস্বাদনের সুখানুভূতিও অতি প্রবলা হইয়া থাকে না, এবং স্বাবলম্বন-জনিত সাহসিকতা বাড়ে। বৈজ্ঞানিক চিত্তের এই গুলি অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ।

বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিত্তবৃত্তির এই সকল লক্ষণের পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, এ পর্য্যন্ত কোন দেশে বা কোন কালে ঐ সকল লক্ষণপূর্ণ কোন জাতিসাধারণ পরিদৃষ্ট হয় নাই। অশিক্ষিত প্রাকৃত লোকেরা চিরকালই এবং সর্ব্বত্রই হুজুকে ভুলে, অযথা স্থলে বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং যাহা কিছু অসাধারণ এবং অদ্ভুত, তাহার চিন্তাতেই বিশেষ দুঃখী, সুখী, ভীত বা আনন্দিত হয়, আর অদৃষ্ট কারণাদির ধ্যানে রত হয়। ভারতবর্ষের ছোট লোকেরা বিশ্বাস করিতে না পারে, এমন আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার ত কিছুই নাই বলিলেই চলে। অনধিক কাল গত হইল, ইংলণ্ডের মধ্যেও প্রিন্স নামা এক ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া প্রচারিত করিয়াছিল যে, সে খৃষ্টীয় ত্রিদেবের মধ্যে পিতৃদেবের সাক্ষাৎ অবতার। ত্রিশ হাজারের অধিক ইংরাজ ঐ কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহার শিষ্য এবং আজ্ঞাবহ হইয়াছিল। ফ্রান্স দেশে প্রতি দশখানি গ্রামের মধ্যে এমন একটী গ্রাম পাওয়া যায়, যেখানে দেবানুগ্রহ নিবন্ধন কোন কুমারী বা অপর ব্যক্তি গায়ে হাত বুলাইয়া অথবা দৃষ্টিমাত্র প্রদান করিয়া রোগীদিগের অত্যুৎকট রোগ শান্তি করেন। জর্ম্মণির মধ্যে এখনও ডাকিনীর নজর দোষে পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে, সুতরাং ঝাড়ান মন্ত্রাদির প্রয়োগও আছে।

এই সকল উদাহরণ প্রদর্শনের তাৎপর্য্য এই যে, কোন দেশে বৈজ্ঞানি-

কতার প্রকৃত আবির্ভাব বুঝিতে হইলে সেই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরই বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া তাহা বুঝিতে হয়—অশিক্ষিত প্রাকৃত জনগণ সকল দেশেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবের বহির্ভূত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায় তিনটী। এক, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-মণ্ডলী, অপর, আরবী ফারসী অভিজ্ঞ মৌলবীর দল, তৃতীয়, ইংরাজী শিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়। প্রথমোক্ত দুইটী সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিকতা আছে কি না, তাহা এস্থলে বিচার্য্য নহে। যদি থাকে, তাহা ইংরাজী শিক্ষা বা ইংরাজ সংস্রবের গুণে হয় নাই।

ভারতবর্ষের ইংরাজী শিক্ষিত দলের লোকেরা কি প্রণালীতে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতেছেন, তাহাই প্রথমে বিচার্য্য। যদি তাঁহাদিগের শিক্ষার রীতি এমত হয় যে, তদ্দ্বারা বস্তুবোধ এবং ভাবসংগ্রহ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে, তবে ঐ শিক্ষা বৈজ্ঞানিকতা জননের অনুকূল বলিয়া গণ্য হইতে পারে। দেখা যাইতেছে যে, এখানকার লোকেরা অতি শৈশবাবধি অতি কঠিন এবং বৈয়াকরণ নিয়মে অসম্বদ্ধপ্রায় বিজাতীয় ইংরাজী ভাষায় সমুদায় শিক্ষালাভ করেন। মাতৃভাষার শিক্ষায় বস্তুজ্ঞান যেমন পরিস্ফুট হয়, বিজাতীয় ভাষার শিক্ষায় কখনই তেমন হইতে পারে না। ভিন্নদেশ প্রণীত গ্রন্থে সর্ব্বদাই এমন সকল পদার্থের নামোল্লেখ থাকে, যাহা পাঠকবর্গের কখনই ইন্দ্রিয়গোচর হয় না। ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্ট কোন সময়ে বলিয়াছিলেন যে, যে সকল ইংরাজী পুস্তক এখানকার বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইবে, সেই গুলি হইতে এতদ্দেশে অপ্রচলিত এবং লোকের অপরিজ্ঞাত বস্তু সমস্তের নাম উঠাইয়া দেওয়া ভাল। কিন্তু শুদ্ধ অপরিজ্ঞাত বস্তুর নামই যে বিদেশীয়ভাষার পুস্তকে থাকে, তাহা নহে। অপ্রচলিত বিজাতীয় ভাবও যথেষ্ট থাকে। সে ভাবগুলির সমগ্ররূপে পরিগ্রহ হইতে পারে না। কারণ পিতৃ মাতৃ প্রভৃতির কথোপকথনাদিতে ঐ সকল ভাবের সংস্রব না থাকায়, সে গুলিও ছাত্রমণ্ডলীর পক্ষে অপরিজ্ঞাতপ্রায় থাকিয়া যায়। পুস্তকে পঠিত ভাবের সহিত বাহিরের কথার মিল দৃষ্ট হয় না। এই জন্য

বঙ্গদেশীয় শিক্ষাবিভাগের কোন কোন কর্ম্মচারী কোন সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, ইংরাজীর শিক্ষা নিতান্ত শৈশবে আরব্ধ না হইয়া প্রথমে মাতৃভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষা হয় এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইবার বয়স হইলেও কিছুকাল ইংরাজীর ভাষা মাত্র শিক্ষিত হয়, অপর সকল বিষয় মাতৃভাষাতেই শিক্ষিত হইতে থাকে। কিন্তু ঐ চেষ্টা সফলা হয় নাই। না হইবার কারণ এই যে, এখনকার ইংরাজী শিক্ষিত অনেকেই ভাবিয়াছিলেন যে, ওরূপ করিলে ইংরাজী শিক্ষা মাত্রার অল্প হইবে এবং ইংরাজীর উচ্চারণ সদোষ হইবে। অতি শৈশবে ইংরাজী না ধরাইলে ছেলের "টং"টী ইংরাজী হইবে না! অতএব ইংরাজী শিক্ষিত নব্যসম্প্রদায়ের লোকগুলির বাল্যাবধিই সুপরিস্ফুটরূপে বস্তু এবং ভাব গ্রহণকরা অনভ্যস্ত। উঁহারা যাহা কিছু শিখেন, তাহার কিয়দ্ভাগ আন্দাজি বুঝিয়াই রাখেন। এইটী বড়ই কুঅভ্যাস এবং ইহা বৈজ্ঞানিকতা প্রাপ্তির পরম অন্তরায়। তাহার পর, বয়োধিক হইলে কালেজগুলিতে যে শিক্ষা হয়, তাহাতেও বৈজ্ঞানিকতার বিশেষ সহায়তা করে না। এখানকার কালেজগুলিতে ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজাদি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আসিয়া যে সকল ব্যক্তি অধ্যাপকতায় নিযুক্ত হয়েন, তাঁহারা অধিকাংশই বিজ্ঞানবিদ্যায় তেমন বিদ্যাবান নহেন। যদিও কেহ কেহ গণিতবিদ্যায় মন্দ না হয়েন, তথাপি পরীক্ষাবিধানকার্য্যে প্রায় কেহই পটু নহেন। পরীক্ষাবিধান ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের শিক্ষা বিড়ম্বনামাত্র। শিক্ষার অবস্থা এইরূপ হওয়াতে অধীত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সূত্রগুলি বার্ষিক পরীক্ষার সময় পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ থাকিতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টি জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ এদেশে বিজ্ঞান-প্রসূত শিল্পাদির কল কারখানাও নাই বলিলেই হয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক তথ্যের এবং সেই তথ্যের প্রয়োগজাত বস্তুর প্রত্যক্ষ কি কালেজে, কি বাহিরে, কোথাও হয় না—পুস্তকে পঠিত বৈজ্ঞানিক কথাগুলি যথাসাধ্য অনুভব করিয়াই বুঝিতে এবং কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতে হয়। ফল কথা, ইউরোপীয় পুস্তক এবং ইউরোপীয় শিক্ষকের বাক্যের উপরেই নির্ভর করিয়া এতদ্দেশীয়দিগের ইউরোপীয় বিজ্ঞান শিক্ষা হইয়া থাকে।

ফলও তদনুরূপ হয়। ইউরোপীয় পুস্তকাদির বাক্যই আপ্তবাক্য বলিয়া পরিগৃহীত, কণ্ঠস্থ, এবং ক্রমে হৃদগতপ্রায় হইয়া যায়। সুতরাং বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তির প্রতি বিজ্ঞানানুশীলনের যে বিশেষ প্রভাব আছে, তাহা অতি অল্পমাত্রাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সামান্যতঃ বিদ্যা চর্চার যে সাধারণ ফল তাহা ইংরাজী শিক্ষাতেও ফলিত হইয়া থাকে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এবং আরবিতে কৃতবিদ্য মৌলবীর, অশিক্ষিত প্রাকৃত জনসমূহ হইতে যে প্রভেদ, ইংরাজী শিক্ষিতদিগেরও তাহা কিয়ৎপরিমাণে হইয়া থাকে; এবং ভূগোল ইতিহাসাদি পাঠ নিবন্ধন একটু কূপমণ্ডুকতাও ন্যূন হয়, কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার বিশেষ কোন ফলই ফলে না। ইউরোপীয় বিজ্ঞান চর্চার যেগুলি ভিত্তি এখানকার ইংরাজী শিক্ষায় সে ভিত্তিগুলির অভাব। বস্তুগ্রহের উপায় নাই, ভাবের পরিস্ফুটতা জন্মাইবার যত্ন নাই, পরীক্ষাবিধান নাই—সংস্কৃত এবং আরবীয় ব্যাকরণের সূত্র এবং পদ সাধন প্রক্রিয়ারই অনুরূপ, কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের নাম এবং তাহাদিগের ব্যাখ্যা শুনা হয় মাত্র। এরূপ শিক্ষায় বৈজ্ঞানিকতা জন্মিবে কেন?

তবে কি ইংরাজীশিক্ষিত এবং স্বদেশীয় বিদ্যায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন প্রভেদ হয় নাই? হইয়াছে। কিন্তু সে প্রভেদ বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে নয়—শাব্দ প্রমাণের ভেদ সম্বন্ধে। পূর্ব্বে ছিল, দেশীয় শাস্ত্রাদি আপ্ত বাক্য, এখন হইয়াছে, ইউরোপীয় শাস্ত্রাদি আপ্তবাক্য। ইউরোপের বাহ্য বিজ্ঞান শাস্ত্রগুলি দেশীয় বাহ্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শাস্ত্র যাহা কিছু আছে, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালীসম্পন্ন। আমরা সেই উৎকৃষ্টতর বাহ্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রের সূত্রগুলি অভ্যাস করিতে পাইয়াছি। অথবা প্রকৃত বাহ্যবিজ্ঞানের কতকগুলি গল্প শিখিয়াছিমাত্র। যদি তাহা হইতেই কোন কালে বৈজ্ঞানিকতা জন্মিবে, এরূপ বলা যায় তাহাতে আপত্তি করিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা জন্মিয়াছে বা জন্মিতেছে এরূপ মনে করা বিষম ভ্রম।

একবার মনে করিয়া দেখা যাউক, আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় কত অতথ্যে তথ্য বোধ করিয়া মধ্যে মধ্যে মাতিয়া থাকেন। ইঁহারা বহুল

সহস্র প্লাঞ্চেট যন্ত্র ক্রয় করিয়া সেই যন্ত্র যোগে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন—ইঁহারা যেখানে পাঁচজন একত্র হইয়াছেন, সেই স্থানেই স্পিরিট নামাইবার জন্য টেবিল ঘেরিয়া বসিয়াছেন—ইঁহারা ইংরাজীভাষায় ব্যুৎপত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের পুত্রবিশেষ বলিয়াও মনে মনে স্বীকার করিয়া কেবল ইংরাজের নিকট লজ্জা পাইবার ভয়ে সেই কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন নাই।—ইঁহারা ইউরোপীয়ের ঘরে লিঙ্গশরীরী তিব্বতীয় মহাত্মাদিগের আবির্ভাবের কথা ইউরোপীয়ের মুখে শুনিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন! ইঁহারা দেশী হাতচালা ছাড়িয়া বিলাতী হাতচালা ধরিয়াছেন, ইঁহারা দেশী ভূত ছাড়িয়া বিলাতী ভূত লইয়াছেন, ইঁহারা দেশী অবতার ত্যাগ করিয়া বিলাতী অবতার গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সকলেই এইরূপ করেন নাই সত্য, কিন্তু দুই জন দশ জন করেন নাই বলিয়া সমস্ত সম্প্রদায়ের মুখ রক্ষা হয় না। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের এবং কৃতবিদ্য মৌলবীদিগের মধ্যে প্রায় কেহই ঐ সকল হুজুকে যোগ দেন নাই।

পাশ্চাত্যভাব—বৈজ্ঞানিকতা।

(৩)

ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে যে, এতদ্দেশে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকতার প্রবেশ হয় নাই, তাহা ইংরাজী শিক্ষাপ্রণালীর এবং ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের গতি মতির পর্য্যালোচনা দ্বারা যেমন সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয়, দেশের কৃষি শিল্পাদির বর্ত্তমান অবস্থা বিচারপূর্ব্বক বুঝিলেও তেমনি বিস্পষ্টরূপে প্রতীত হইয়া থাকে।

কৃষি সম্বন্ধে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, ইউরোপেও কৃষি বিষয়ে বিজ্ঞান-শাস্ত্রের প্রয়োগ শিল্প বিষয়ের অপেক্ষায় অনেক কম। ভূমির কর্ষণ, তাহাতে জল সেচন, যথাকালে তাহার জল নিঃসারণ, ভূমিতে সার যোজন, ভূমিভেদে সারের প্রভেদ সাধন এবং ফসলের পরিবর্ত্তন, এইরূপ কয়েকটী স্থূল স্থূল

কার্য্যেই কৃষি বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হয়; আর হল চালাইবার, শস্য কাটিবার, নিস্তুষ করিবার জন্য কয়েকটা কলের ব্যবহার হয়। প্রথমোক্ত ব্যাপারগুলি ইউরোপেও হয়, এ দেশেও হয়। ইউরোপে যত ভাল রকমে হয়, এখানে তত ভাল হয় না। তথাপি অনেকানেক বিচক্ষণ ইউরোপীয় পর্য্যাটকের মত এইরূপ যে, ভারতবর্ষের কৃষকদিগের পক্ষে ইউরোপীয়ের স্থানে স্বদেশোপযোগী কৃষি সম্বন্ধে নূতন কিছুই শিখিবার নাই। দেশীয় নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং নবাগত ইউরোপীয় নীলকর প্রভৃতির মধ্যে একটু মতান্তর আছে বটে। তাঁহারা মনে করেন যে, এ দেশেও ইংলণ্ডের ব্যবহৃত লাঙ্গলের অনুরূপ লাঙ্গল প্রয়োজনীয়, মনে করেন যে, ইংলণ্ডে মৃত্তিকাদি লইয়া পরীক্ষা করিয়া যেমন বলা হয়, এ মাটিতে অমুক অমুক রাসায়নিক পদার্থ এত এত পরিমাণে আছে, ইহাতে এই এই ফসল ভাল হইবে, ইহাতে ঐরূপ বা ঐরূপ সার দেওয়া আবশ্যক, এখানেও সেইরূপে কৃষকবর্গের পথপ্রদর্শক কৃষি-বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন। কিন্তু শুনা গিয়াছে এবং দেখাও গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের প্রদেশভেদে যেখানে যেখানে মৃত্তিকার প্রকৃতি ভিন্ন, সেই সেই স্থানে বিভিন্নরূপ লাঙ্গলের ব্যবহার চিরপ্রচলিত আছে, আর কৃতকর্ম্মা কৃষকগণ পারম্পর্য্যোপদেশানুবর্ত্তী হইয়া মৃত্তিকার প্রকৃতি বুঝিতে বিলক্ষণ সক্ষম এবং তাহা বুঝিয়া আপনাদিগের সামর্থ্যানুসারে সারের এবং বীজের ভেদ করিয়াও থাকে।

তথাপি মৃত্তিকাদির রাসায়নিক পরীক্ষাবিধান হইলে যে ভাল হয় না, এমত নহে। কিন্তু তাহা ত করা প্রায়ই হয় না, এবং যে যে স্থলে পরীক্ষা বিধানে অকৃতকর্ম্মা ব্যক্তিগণ তাহা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই খানেই ঠকিয়াছে। অনন্তর দেশীয় প্রাচীন কৃষকদিগের স্থানে তাহাদিগকে শিখিতে হইয়াছে, কোন্ জমিতে কোন্ ফসল ভাল হইবে, কোন্ জমিতে কোন্ সার লাগিবে। যিনি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিবেন তিনিই জানিবেন যে, সাধারণতঃ এদেশের কৃষিকার্য্যে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকতা বিন্দুমাত্রও লব্ধপ্রবেশ হয় নাই। উদ্যানশোভাজনক ফুল ফলের চারা

প্রস্তুত করায় এদেশের মালীরা ইংরাজ মর্শির্ব প্রভৃতির স্থানে কিছু কিছু শিক্ষালাভ করিয়াছে মাত্র।

আমাদের বিশেষ প্রয়োজন ইউরোপীয় শিল্প শিক্ষা। আমাদের দুই চারি জন যায় ইংলণ্ডের কৃষি শিক্ষার জন্য। তাহারাও দেশে আসিয়া প্রায়ই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হয়।

বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ প্রভাব কৃষির উপর নহে, শিল্পেরই উপর। শিল্প সম্বন্ধে আদৌ বক্তব্য এই যে, শিল্প অতি বহুবিধ। যাহা কিছু উপভোগযোগ্য, তাহারই সহিত শিল্পের সংস্রব আছে। আমাদিগের শাস্ত্রে শিল্পের নাম কলা। তাহা চতুঃষষ্টি প্রকার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ইউরোপীয়েরা শিল্পের দুইটী স্থূল ভেদ করেন। এক প্রকার শিল্প মনুষ্য শরীরের সাক্ষাৎ উপভোগ্য বস্তুজাত প্রস্তুত করণে নিযুক্ত; অপর প্রকারের শিল্প হইতে মানস সুখপ্রদ দ্রব্যজাত ও কার্য্যকলাপ জন্মে। প্রথম প্রকারের শিল্পকে উপভোগ্য শিল্প এবং দ্বিতীয় প্রকারের শিল্পকে সুকুমার শিল্প * বলা যায়। সুকুমার শিল্পগুলিতে উৎকর্ষ লাভ স-হৃদয়তা এবং ইন্দ্রিয়পটুতা-মূলক। উহাদিগের সহিত বিজ্ঞান শাস্ত্রের ততটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নয়। ঐ সকল শিল্পে ভারতবাসীর অনেক উন্নতি হইয়াছিল, এখনও কতকটা আছে। পূর্ব্বোন্নতির প্রমাণ দেশের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে, বিশেষতঃ যে ভাগে চিত্র ভাস্কর্য্য-বিদ্বেষী মুসলমানদিগের অধিকার অতিপ্রবল হয় নাই, সেই দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন দেবমন্দির প্রভৃতিতে অতি জাজ্জ্বল্যমানরূপেই আছে। উড়িষ্যার কোণার্ক মন্দিরের প্রধ্বস্তাবশেষ হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত, এমন দিব্য গঠন মন্দির, প্রাসাদ এবং ভাস্করীয় মূর্ত্তি,

---

* কাব্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য, বাস্তু এই কলা পাঁচটিকে ইংরাজীতে ফাইন্ আর্টস্ বলে। ঐ কলা পুঞ্জকে সুকুমার শিল্প বলিয়াই অভিহিত করা গেল।

সকল আছে যে, তাহা দেখিয়া অনেকানেক ইংরাজ বলিয়াছেন যে, ও গুলি গ্রীক্ কারিগর ভিন্ন আর কাহার হস্তবিনির্ম্মিত হইতে পারে না*। বাস্তবিক ঐ সকল কীর্ত্তি নব্য ইউরোপীয় কারিগরদিগেরও অনায়াসসাধ্য এবং উৎকর্ষসাধ্য নয়। মথুরা নগরের ত্র্যম্বক নায়কের প্রাসাদ বলিয়া যে সুন্দর ভবনটী বিদ্যমান আছে, তাহার সহিত তুলনায় আধুনিক ইংরাজ এঞ্জিনিয়র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত পুনা সন্নিহিত গণেশখণ্ডের গবর্ণমেণ্ট হোস্ এবং ইন্দোরের নবরাজভবন অপকৃষ্ট রুচির পরিচায়ক বলিয়াই বোধ হয়।

কিন্তু এই সকল উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্যে বিজ্ঞানের প্রভাব তাদৃশ নহে। উপভোগ্যজনক শিল্পের উপরেই বিজ্ঞানের বিশিষ্টরূপ প্রভাব। সেই গুলির প্রতিই যন্ত্রের প্রয়োগ হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল শিল্পজাত সম্বন্ধেও একটী কথা বক্তব্য এই যে, উত্তম কারিগরের হস্তবিনির্ম্মিত শিল্প হইতে যন্ত্রপ্রসূত শিল্প উৎকৃষ্ট হয় না। আজি কালি অনেকানেক ইউরোপীয়েরও ইচ্ছা হইয়াছে যে, তাঁহারা যত দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহার করেন, তাহার সকলগুলিই যন্ত্রপ্রসূত না হইয়া শিল্পিদিগের হস্তপ্রসূত হয়। এ দেশেও যাঁহারা দেশীয় এবং বিলাতী উভয় প্রকার বস্ত্রাদির ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, যন্ত্রপ্রসূত বিলাতী কাপড় অপেক্ষা হস্তপ্রসূত দেশীয় ভাল কাপড় শতগুণে উৎকৃষ্ট। স্থূল কথা, যন্ত্রপ্রসূত শিল্পজাত অল্পমূল্য বলিয়াই এত সমাদৃত।

---

* কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজ আমার কাছে ঐ কথা বলিলে, আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, কুমারসম্ভবাদি যে সকল কাব্য গ্রন্থ সংস্কৃতে বিদ্যমান আছে, সে গুলি কোন্ কোন্ গ্রীক কবি কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছিল, তাহা জানিতে বড়ই কৌতূহল হয়। কারণ ও গুলিরও নির্ম্মাণ প্রণালী অতিশয় পরিপাটী এবং সমীচীন সহৃদয়তার ও সুরুচির ব্যঞ্জক। যাজপুর নগরের শৈলস্তম্ভটীর সম্বন্ধেই কথা উঠিয়াছিল।

যন্ত্রপ্রসূত দ্রব্য অল্পমূল্য হয় কলের গুণে। কল উৎকৃষ্ট হউক, অপকৃষ্ট হউক, যেরূপ শিল্পোপাদান প্রদত্ত হউক, যন্ত্রের প্রভূত বলে উহা কার্য্যোপযোগী হইয়া উঠে। অপকৃষ্ট উপাদানের মূল্য কম হয়, এই জন্য তজ্জাত দ্রব্যেরও মূল্য কম হয়। মূল্য ন্যূন হইবার অপর কারণ এই, কলের প্রয়োগে মনুষ্যের বল অল্প লাগে, সুতরাং মজুরির খরচ কম হয়। এই দুই কারণে খরচের লাঘব হয় বলিয়া যন্ত্রপ্রসূত শিল্পজাত স্বল্পমূল্য হয়।—আমাদের দেশে যন্ত্রের বহুল প্রচার হইলে মজুরদার লোকের কর্ম্ম কমিয়া যাইবে বলিয়া এখন আর শঙ্কা করিবার কারণ নাই। যেহেতু এ দেশের লোকেরা বিলাতী শিল্পজাতের আমদানিতে নিষ্কর্ম্মা এবং নিরন্ন হইয়া একমাত্র কৃষিকার্য্যের উপর গিয়া পড়িতেছে। অতএব এদেশে কল চলিলে কতক পরিমাণে কৃষিবৃত্তির উপর চাপ কমিয়া যাইতে পারে। সুতরাং এ দেশে কলকারখানা হইয়া যন্ত্রপ্রসূত শিল্পের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার কোন দোষই হইতে পারে না। কিন্তু কলকারখানা কয়টী বসিয়াছে?

দেশে বৈজ্ঞানিকতার সত্তা সত্যই প্রবেশ হইলে, এত দিনে কলকারখানার সংখ্যা এত ন্যূন এবং যে কয়েকটী আছে তন্মধ্যে দেশীয়ের সংখ্যা এত কম থাকিত না।

জাপানীয়েরা ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং শিল্প শিখিতেছে। বর্ষে বর্ষে তাহাদের শতাধিকসংখ্যক লোক ইউরোপের নানা দেশে এবং আমেরিকায় গিয়া ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা করে, এবং স্বদেশে আসিয়া স্বাধীনভাবে কলকারখানা চালায়। ইহারই মধ্যে উহারা দুই তিনটী ইউরোপীয় কলের সংস্কার এবং উৎকর্ষ সাধন করিয়া তুলিয়াছে। ইউরোপীয় শিল্পীর প্রতিযোগিতা করিয়া উহারা ভারতবর্ষে আপনাদিগের দিয়াশলাই বিক্রয় আরম্ভ করিয়াছে। আমরা যখন জাপানীয়দিগের ন্যায় ইউরোপে গিয়া শিল্পবিজ্ঞান শিখিয়া আসিতে পারিব, তখনই আমাদিগের মধ্যে দেশ হিতকর বৈজ্ঞানিকতার সঞ্চার আরম্ভ

হইবে। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, জাপানের কৃষিকার্য্য ভারতবর্ষের কৃষিকার্য্য হইতে বিশেষ উৎকর্ষলাভ করে নাই। জাপানীয়েরা কেহই কৃষিবিদ্যা শিখিবার নিমিত্ত ইউরোপে যায় না—শিল্প শিখিতেই যায়।

ইংরাজ সংসর্গে আমাদিগের যদি কোন বিজ্ঞান যথারীতি শিক্ষা হইতেছে এমন হয়, তবে সেটী চিকিৎসা-বিজ্ঞান। উহার অবস্থা কিরূপ তাহা দেখিলেই আমাদিগের মধ্যে যে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার দোষে অথবা অন্য কারণে প্রকৃত বৈজ্ঞানিকতার সঞ্চার হইতে পারে নাই, তাহা অতি সুস্পষ্টরূপেই অনুভূত হইবে। ভারতবর্ষে আয়ুর্ব্বেদীয়, হাকিমি এবং ডাক্তারি এই তিন প্রকার চিকিৎসা চলিতেছে। তন্মধ্যে প্রথম দুই প্রকার চিকিৎসার কথা এস্থলে বিচার্য্য নহে। তৃতীয় প্রকারের চিকিৎসাকেই বিজ্ঞান-মূলক বলা হইয়া থাকে। এবং উহাতেই উন্নতির সম্ভাবনা শংসিত হয়। কিন্তু আমাদের ইংরাজী-শিক্ষিত ডাক্তরেরা এ পর্য্যন্ত উহার কিছুমাত্র উৎকর্ষসাধন করিতে পারিয়াছেন কি? দেশে অপর দুই প্রকার চিকিৎসাপ্রণালী চলিতেছে। তদ্দ্বারা শত শত স্থলে তাঁহাদিগের অসাধ্য রোগেরও প্রতীকার হইতেছে। দেশ মধ্যে অসংখ্য ভৈষজ্য আছে, যাহাদিগের গুণ ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হয় নাই। তথাপি কোন একটী স্থলেও কি তাঁহারা ঐ গুলির গুণাগুণ প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টা করেন? ডাক্তার টোয়াইনিং, ওসাগনেসী, ওয়াইজ, এবং তাদৃশ দুই চারি জন কিছু করিয়াছিলেন, দেশীয় কেহই ভৈষজ্যাদির গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। কিন্তু মার্কিণদেশীয় ডাক্তরেরা স্বদেশের আদিম নিবাসী বর্ব্বর ইণ্ডিয়ানদিগেরও ব্যবহৃত ঔষধাদি হইতে বহুসংখ্যক ঔষধের আবিষ্কার করিয়া ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতিসাধন করিয়াছেন। অতএব অন্যান্য বিজ্ঞানেরও যেমন সুশিক্ষা হয় না, চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও সেই দশা হইয়া আছে।—অর্থাৎ উহা দ্বারাও এখানকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বুদ্ধি এবং চিত্তবৃত্তির বৈজ্ঞানিক ভাব প্রাপ্তি হয় না। যেমন অন্যান্য বিজ্ঞানেরসূত্র প্রথমে মুখস্থমাত্র হইয়া পরে তাহার স্মৃতি অল্প-

মাত্রাতেই পরিণত হইয়া থাকে, চিকিৎসা বিজ্ঞানও তেমনি ক্রমশঃ যৎসামান্য ব্যবসায় চালাইবার উপযোগী হইয়াই থাকে। উহাও বৈজ্ঞানিক ভাবের জনক হইতে পারে নাই।

কয়েকটী প্রকৃত ঘটনার কথা বলিতেছি তাহাতে কি চিকিৎসা বিজ্ঞানে, কি অপরাপর বিজ্ঞানে, ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কতটা অনভিজ্ঞতা আছে, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

(১) কোন গৃহস্থের একটী বালিকা আপনার নাকের নোলক মাকড়ি শুদ্ধ গিলিয়াছিল। বাটীর ডাক্তারকে ডাকা হইল এবং কি করা উচিত জিজ্ঞাসা করা হইল। ডাক্তারটী কালেজের পূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত এবং চিকিৎসাকার্য্যে সুপ্রতিপন্ন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর দিলেন যে, বালিকাটীকে কিছু নাইট্রোমুরিয়াটিক দ্রাবক পান করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। বাটীর কর্ত্তা বলিলেন, উহার পেটটী কি কাচের বোতল যে, ঐ দ্রাবকে তাহা নষ্ট হইবে না। বালিকাটীর পরমায়ু ছিল।

(২) একজন শিক্ষক আপন ছাত্রদিগকে বস্তুমাত্রের সচ্ছিদ্রতা বুঝাইবার সময় বলিলেন,—"তোমরা দেখ নাই, ঘরের শার্শির বাহির পিঠে বৃষ্টির জল লাগিলে ভিতর পিঠেও কিছু কিছু জল জমা হয়। শার্শির গ্লাস সচ্ছিদ্র না হইলে কি তাহা হইত ?"

(৩) এতদ্দেশীয় কতকগুলি বড় লোক ইলবার্ট বিলের গোলোযোগের সময় কেসউইক্ প্রমুখ ইংরাজদিগের সহিত মিলিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বক্তৃতা করিয়েন, "যেমন নৌকা হইতে আকর্ষী দিয়া টানিলে জাহাজটা সরিয়া আইসে, আমরা তেমনি ইংরাজদলকে স্বদলে টানিয়া লইতেছি।" উপমাটী ব্যঙ্গচ্ছলে বলিলেই প্রকৃত কথা হইত।

(৪) "শীতকালের দিন ছোট হয় কেন ?" "শীতকালে পৃথিবীর গতি দ্রুত হইয়া উঠে, তাই দিন ছোট হইয়া পড়ে।" "গতি দ্রুত হয় কেন ?" "কেপ্লরের তৃতীয় নিয়মানুসারে।"

(৫) কোন খ্যাতনামা ব্রাহ্ম বলিয়াছেন "পৃথিবী স্তরে স্তরে বিন্যস্ত—ঠিক পিঁয়াজের খোসার মত। যেখানে মাঁটি খুঁড়িবে সেই স্থানেই সকল স্তর পাওয়া যাইবে। পৃথিবী যে কাহার গঠিত ভূতত্ত্বেই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।"

(৬) পিতা সংস্কৃতজ্ঞ, পুত্র ইংরাজী নবিস। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—" বাবা! চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণেই জোয়ার হয় সত্য—জোয়ার দিন রাত্রির মধ্যে দুইবার হয় কেন?" পুত্র উত্তর করিলেন "পৃথিবী ঘোরে কি না, তাই ঐরূপ হয়, জোয়ারটাও ঘুরিয়া আইসে। পৃথিবী যে ঘুরে জোয়ার ভাটাই তাহার একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ।" পুত্রটী তাহারই পূর্ব্ববর্ষে বিজ্ঞানের পরীক্ষায় খুব নম্বর পাইয়া পাস হইয়াছিলেন!

(৭) একটী সুকুমারী বালিকার বুকে সর্দ্দি বসিয়াছিল; ডাক্তর আসিয়া তাহাকে খানিকটা তুঁতে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। কেহ বলিল, "তুঁতে যে বিষ।" ডাক্তার বলিলেন "বমি করাইবার জন্য তুঁতে দিলাম, উহা পেটে থাকিলে ত বিষ হইবে।"

(৮) আর একদিন পিতা পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা! চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণ বলে সমুদ্রের জল ফাঁপিয়া উঠিয়া জোয়ার হয়, বায়ু মণ্ডলেও কি ঐরূপ হয় না?" পুত্র বলিলেন "না, তাহা হয় না" "কেন?" পুত্র বলিলেন "কোন পুস্তকে ঐ কথা লেখা নাই!"

সত্য কথা, আমাদিগের যে, বিজ্ঞানবিদ্যা তাহা পুস্তকেই আছে, উহা দ্বারা বুদ্ধি এবং চিত্তের কোন সংস্কার হয় নাই। দেশের উপভোগ্য শিল্পজাতও সম্বর্দ্ধিত এবং স্বল্পমূল্য হইয়া উঠে নাই। আমরা তৎসমুদায় অন্য দেশ হইতে পাইতেছি, এবং সকল লোকেই ক্রমশঃ একমাত্র চাকুরি এবং কৃষিব্যবসায়ের উপর নির্ভর-প্রবণ হইতেছি।

পাশ্চাত্যভাব—রাজার সমাজ-প্রতিভূত্ব।

ভারতবর্ষীয় এবং ইউরোপীয় সমাজগুলির উপাদান ভিন্নরূপ। ইউরোপে যদিও কোন অতি বহুপূর্ব্বকালে এস্কুইমোদিগের সদৃশ নিকৃষ্ট জাতীয় মনুষ্যের আবাস ছিল এরূপ প্রমাণ হয়, তথাপি ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে তথায় ককেসীয় ভিন্ন অপর কোন জাতীয় মনুষ্যের আধিক্য দৃষ্ট হয় না। রোমীয়েরা যে সকল বর্ব্বর জাতীয়দিগকে পরাজিত করিয়া ইউরোপে আপনাদিগের সাম্রাজ্য বিস্তার করে, তাহারা সকলেই ককেসীয় বর্ণের মধ্যে কেহ বা কেল্‌টীয়, কেহ বা টিউটোনীয় লোক ছিল। রোমীয়েরা নিজে কেল্‌টীয় আর তাহাদের সাম্রাজ্য বিধ্বংসকারী বর্ব্বরেরা অধিক পরিমাণেই টিউটোনীয় ছিল। অতএব ইউরোপের রাজ্যগুলি অধিকাংশই মূলতঃ এক জাতীয় লোকের আবাস ভূমি।

সকল দেশেরই সমাজ সংঘটনে বিভিন্ন স্তরের বিনিবেশ দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভরেতবর্ষীয় সমাজের সংঘটনে ইউরোপের ন্যায় সমুদায় স্তরের একজাতীয়তা দৃষ্ট হয় না। এখানে দ্রাবিড়ী, কোলেয়ীয়, মোঙ্গলীয় প্রভৃতি মূলতঃ ভিন্ন জাতীয় লোকেরা ককেসীয় বর্ণসম্ভূক্ত আর্য্য জাতির নিম্নভাগে অবস্থিত। সেই আর্য্য জনগণের প্রদত্ত শিক্ষার প্রভাবে ঐ মূলতঃ বিভিন্ন বর্ণের লোক সকল ক্রমশঃ সম্মিলনের এবং একতার দিকে পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে; এবং অনেক পরিমাণে ধর্ম্ম-সামঞ্জস্য, ভাষা-সামঞ্জস্য এবং ব্যবহার-সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইউরোপের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষীয় সমাজের উপাদান যেমন ভিন্ন প্রকৃতিক ঐ উপাদানগুলির উপর্য্যুপরি বিনিবেশও তেমনি ভিন্নরূপ। নব্য ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যগুলি এক রোম সাম্রাজ্যের সুপ্রশস্ত ভিত্তির উপরে সংস্থাপিত। নব্য ইউরোপীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদের কর্ত্তৃক বিজিত রোমীয়দিগের স্থানে শিক্ষা গ্রহণ করে, এবং রোমের ধর্ম্ম-শাস্ত্র, রোমের ব্যবস্থা-শাস্ত্র এবং রোমের সাহিত্য শিল্পাদি প্রাপ্ত

হইয়া সভ্য হইতে আরম্ভ করে। ভারতবর্ষে ওরূপ কোন সুসভ্য সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য বিজয় করিয়া আর্য্য পুরুষেরা এখানে বাস করেন নাই। তাঁহারা নানা ভাষাভাষী, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, দস্যুদৈত্যাদির দলকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগের শাসন, পালন এবং শিক্ষা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অতএব ইউরোপীয় রাজ্যগুলির তলভাগের স্তরে একতা এবং সভ্যতার নিবেশ, উপরের স্তরে অনৈক্য এবং বর্ব্বরতার স্থান; ভারতবর্ষের তলভাগে অনৈক্য এবং বর্ব্বরতা, উপরি স্তরে জ্ঞান এবং সভ্যতার আশ্রয়। এই মৌলিক পার্থক্য হইতে অনেক বিষয়ের অনেক পার্থক্য জন্মিয়াছে এবং সেই গুলির বিশেষ বিচার না করিয়া যাঁহারা ইউরোপীয় ইতিহাস হইতে সূত্র সঙ্কলনপূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় সমাজতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করেন তাঁহারা সুবহু স্থলেই অকৃত কার্য্য হইয়া থাকেন।

নব্য ইউরোপীয় জাতিগুলি রোম সাম্রাজ্যের নানা খণ্ড জয় করিয়া সাম্রাজ্য প্রচলিত ধর্ম্মপ্রণালী গ্রহণপূর্ব্বক খৃষ্টান হয়। অতএব তাহারা বিজিত লোকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেয় নাই, তাহাদিগেরই স্থানে ধর্ম্মশাস্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই জন্য ইউরোপে ধর্ম্মশাসনের গৌরব ন্যূন। শুদ্ধ ধর্ম্মশাসনের গৌরব ন্যূন এমত নহে, ইউরোপে ধর্ম্মোপদেষ্টৃগণকে রাজ্যপালের অধীন হইয়াই চলিতে হইয়াছে। ইউরোপীয় ইতিহাসে ধর্ম্মশাস্তৃগণের সহিত রাজ্যপালদিগের বিবাদ বিষম্বাদের ভূয়োঃভূয়ঃ উল্লেখ থাকিলেও রাজ্যপালেরাই যে অধিক স্থলে এবং ক্রমে ক্রমে সর্ব্বস্থলেই লব্ধ-বিজয় হইয়াছেন, তাহা অতি সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত হইয়া আছে। কাথলিক ধর্ম্মশাস্তা পোপের উৎকট প্রাবল্যের সময়েও ইউরোপীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরে রাজ্যপালেরা স্ব স্ব দেশীয় ধর্ম্মশাস্তৃগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টায় সম্যক বিরত হয়েন নাই, এবং বহু স্থলে তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। রোমান কাথলিকেরা যাহাদিগকে সাধু বলিয়া উল্লেখ করেন, তাঁহাদিগের বার আনা বিজিত জাতীয়, সিকি মাত্র বিজেতৃজাতীয় পুরুষ ছিলেন।

ভারতবর্ষে ওরূপ হইতে পারেনাই। এখানে রাজ্যশাসন এবং ধর্ম্মশাসন উভয় শক্তিই আর্য্য পুরুষদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল। এখানে ধর্ম্মশাসন, রাজ্যশাসন অপেক্ষা অল্প গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে হয় নাই। প্রত্যুত ধর্ম্মশাসনকার্য্যে অধিকতর বিদ্যাবত্তা এবং জ্ঞানের এবং পবিত্রতার প্রয়োজন বলিয়া উহাই সমধিক গৌরবান্বিত হইয়াছিল। এখানে ধর্ম্মশাসন রাজশাসনের অধীন হইয়া পড়া দূরে থাকুক, উহাই প্রবলতর এবং রাজশক্তির অযথা বৃদ্ধির নিবারণে সক্ষম হইয়াছিল।

ইউরোপে ধর্ম্মশাসন রাজশাসনের অধীন হওয়াতে রাজশক্তির অযথা বৃদ্ধি হইয়া উঠিল এবং ধর্ম্মযাজক প্রমুখ গ্রন্থকর্ত্তৃগণ সকলেই এক বাক্য হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, রাজার শক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বর প্রদত্ত, উহার প্রতি কোন বাধা প্রদানে মনুষ্যের অধিকার নাই।

ভারতবর্ষে ঠিক ওরূপ মতবাদ প্রচারিত হয় নাই। এখানকার শাস্ত্রে রাজশরীর যদিও দেবশরীর বলিয়া বর্ণিত, তথাপি রাজা কর্ত্তৃক পরিচালিত যে শাস্ত্রীয় দণ্ড তাহাই প্রকৃত রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছিল—

স রাজা পুরুষো দণ্ডঃ স নেতা শাসিতাচ সঃ।
চতুর্ণামাশ্রমানাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূস্মৃতঃ।

সেই দণ্ডই রাজা, পুরুষ, নেতা, এবং শাসিতা, তিনিই চতুরাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিভূ।

ইউরোপীয় সমাজে রাজশাসন ধর্ম্ম-শাসনকে আত্মসাৎ করিয়া নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সমাজের মধ্যে কোন একটী শক্তি একান্ত প্রবল হইলে তাহার দমনের এবং খর্ব্বতাসাধনের প্রয়োজন হয়। এইজন্য ইউরোপীয় সমাজের অন্তর্ভূত অপরাপর দলের, যথা ভূম্যধিকারী এবং প্রজাসাধারণের, বল বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সাধারণ জনগণের মধ্যে তাদৃশ শক্তির উদ্রেক হওয়াতে রাজার বিরুদ্ধে প্রজাবর্গের অভ্যুত্থান হইতে থাকিল, রাজাদিগের পদচ্যুতি ঘটিল এবং তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারিগণের সহিত বিশেষ বিশেষ নিয়মাবধারণ হইল। কিন্তু সামান্য

নিয়মে অত্যাচার বন্ধ হইয়া থাকে না। আবার অত্যাচার, আবার অভ্যুত্থান, আবার নিয়ম বন্ধন হইল। কোথাও কোথাও প্রজাগণ প্রকাশ্য সভাস্থলে রাজার দোষের বিচার করিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত করিল। ঐ সময়ে একটি মতবাদ বাহির হয়, তাহাকে সামাজিক চুক্তিবাদ বলিয়া অভিহিত করা যায়। উহার তাৎপর্য্য এই যে, রাজা প্রজার মধ্যে কোন কালে যেন এইরূপ একটা চুক্তি হইয়া আছে যে, রাজা যথানিয়মে প্রজাপালন করিলেই প্রজাকর্ত্তৃক সম্মানিত হইবেন, তাহার অন্যথাচরণ করিলে তিনি পদচ্যুত হইবেন।

ভারতবর্ষে ওরূপ কোন চুক্তির কল্পনা হয় নাই। না হইবার কারণ, এখানে রাজশক্তিকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত প্রবলতর ধর্ম্মশাসন বিদ্যমান ছিল। সেই ধর্ম্মশাসন বলিয়াছিল—

"দণ্ডোহি সুমহত্তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবং॥"

দণ্ড সুমহৎ তেজবিশিষ্ট, অকৃতাত্মাকর্ত্তৃক তাহা চালিত হইতে পারে না; ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে বন্ধুবর্গ সহিত রাজাও দণ্ডদ্বারা হত হয়েন।

"তং রাজা প্রণয়ন্ সম্যক্ ত্রিবর্গেণাভিবর্দ্ধতে।
কামাত্মাবিষমঃ ক্ষুদ্রোদণ্ডেনৈব নিহন্যতে॥"

রাজা তাহার সমুচিত প্রণয়ন করিলে ত্রিবর্গ ফল লাভ করেন; কিন্তু কামাত্মা, বিষয়বাসনাশীল এবং ক্ষুদ্রাত্মা হইলে দণ্ডদ্বারাই স্বয়ং হত হয়েন। রাজার প্রতি দণ্ড প্রণয়ন যে কথার কথা মাত্র ছিল তাহা নহে। মনুসংহিতাতেই ইহার অনেকগুলি দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে—

বেণোবিনষ্টোঽ বিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাঃপৈজবনশ্চৈব সুমুখোনিমিরেবচ॥

নীতিভঙ্গ দোষে বেণ রাজা, নহুষ রাজা, পিজবন পুত্র সুদা রাজা; সুমুখ রাজা এবং নিমিরাজা বিনষ্ট হইয়াছিলেন। পুরাণ এবং নাটকাদি হইতেও ঐরূপ অনেকানেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই স্থলে নির্দ্দেশ করা আবশ্যক যে, ভারতবর্ষীয় জনগণ হইতে ইউরোপীয়দিগের মনের গতি কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ হইয়া আছে। ইউরোপীয়-দিগের মনে চুক্তির ভাবটা কিছু শীঘ্র এবং সহজে সমুদিত হইয়া থাকে। উহাঁরা স্বভাবজাত সম্বন্ধগুলিরও মূলে একটা চুক্তির ক্রিয়া দেখিতে ইচ্ছা করেন। ইহার প্রকৃত কারণ, উহাঁদিগের প্রকৃতিগত স্বৈরভাবের প্রাবল্যও হইতে পারে, আর কার্য্যকলাপে বণিকবৃত্তির বাহুল্যও হইতে পারে। কিন্তু যাহাই হউক, ভারতবর্ষীয়েরা বিধি প্রতিপালনকেই যেমন ধর্ম্ম্য ব্যবহারের নিদানভূত জ্ঞান করেন, ইউরোপীয়েরা চুক্তির অনুসরণ করাকেও প্রায় সেই চক্ষে দেখেন। এই জন্যই রাজা এবং প্রজার মধ্যে চুক্তির কল্পনা ইউরোপীয়-দিগের মনে উদিত হইয়াছিল। ঐ কাল্পনিক মতবাদ স্থায়ী হয় নাই বটে; কিন্তু ইউরোপীয় রাজ্যগুলিতে যে ক্রমে ক্রমে রাজ্যের শারীরক বিধির সুস্পষ্ট ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে এবং রাজগণ সেই ব্যবস্থানুযায়ী হইয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ঐ চুক্তিসম্বন্ধীয় মতের বহুল প্রচার হইয়াছিল। ফলতঃ পূর্ব্বের কল্পনাটীই প্রকৃত কার্য্যে পরিণত হইয়া গিয়াছে এবং রাজা সমাজের প্রতিভূমাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন —তাঁহার সর্ব্বময় অধিকারের ভাব তিরোহিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষেও ধর্ম্মশাসনের স্বতন্ত্রতা থাকায়, প্রকৃত প্রস্তাবে রাজার সমাজ প্রতিভূত্ব সংস্থাপিত হইয়াছিল; তবে ইউরোপের ন্যায় এখানে সামাজিক চুক্তির কল্পনার অথবা পুনঃপুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লবান্তে নূতন নূতন করিয়া শারীরক-ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজন হয় নাই। এখানকার প্রাচীন সংহিতাতেই লিখিত হইয়াছে যে, শিলোঞ্ছ বৃত্তির দ্বারা যে রাজা জীবন ধারণ করেন তাঁহার যশ অতি বিস্তৃত হয়। রাজা শিলোঞ্ছবৃত্তির দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারেন, ইহা মনে করিতে গেলেই বুঝা যায় যে, রাজা আপনাকে নিজ ধনাগারাদির অধিকারী বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না, আপনাকে সমাজকর্তৃক ন্যস্ত ধনেরই রক্ষিতা বলিয়া মনে করিতেন।

"স্বে স্বে ধর্ম্মে নিবিষ্টানাং সর্ব্বেষামনুপূর্ব্বশঃ
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ রাজা সৃষ্টোভিরক্ষিতা।"

আপনাপন ধর্ম্মে নিবিষ্ট সকল বর্ণের এবং সকল আশ্রমের অভিরক্ষিতা-রূপেই রাজা সৃষ্ট হইয়াছেন।

"শরীর কর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথারাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ॥"

শরীরের প্রতি পীড়া প্রদানে যেমন প্রাণ ক্ষীণ হয়, সেইরূপ রাজ্যের পীড়নে রাজার প্রাণ ক্ষীণ হয়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত একটী মনু বচনে এক স্থানে দণ্ড বা রাজার প্রতি প্রতিভূ শব্দেরও স্পষ্ট প্রয়োগ আছে—

"চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ ধর্ম্মস্য প্রতিভূঃ স্মৃতঃ।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য ইউরোপে নানা বিবাদ বিসম্বাদ এবং রক্তারক্তি কাণ্ডের পর কালক্রমে চুক্তির কাল্পনিক মূলে রাজার সমাজ প্রতিভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে; আর ভারতবর্ষে ধর্ম্মশাসনের স্বতন্ত্রতা নিবন্ধন বিধি প্রতিপালনের অবশ্য কর্ত্তব্যতারূপ ভিত্তির উপর রাজার প্রতিভূত্ব সংঘটিত হইয়াছে।

যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, চুক্তিরক্ষা এবং বিধিপালন এই দুইটীর মধ্যে কোন ভিত্তিটী দৃঢ়তর, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় যে, বিধি প্রতিপালন ভিত্তিটীই অধিকতর দৃঢ় এবং প্রশস্ত—কারণ চুক্তিরক্ষা বা প্রতিশ্রুত প্রতিপালন ধর্ম্মটীও বিধি প্রতিপালনের উপরেই সংস্থাপিত। অগষ্ট কোমটী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াই বলিয়া গিয়াছেন যে সমাজ মধ্যে ধর্ম্ম-শাসনের প্রাধান্য সংস্থাপিত হওয়া বিধেয়। ভারতবর্ষে তাহাই হইয়াছিল। এখানে রাজশাসন, ধর্ম্মশাসনের বশীভূত ছিল। অতএব ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে যে, ভারতবর্ষে রাজার সমাজ-প্রতিভূত্বের ভাবটী নূতন সঞ্চারিত হইয়াছে, এ কথা প্রকৃত নহে। তবে রাজাকে কোথাও লুপ্তশক্তি কোথাও বা হ্রস্বশক্তি করিয়া বিস্পষ্টরূপে প্রজাসাধারণের অভি-

মতি গ্রহণ পূর্ব্বক সংগঠিত প্রতিভূ সমিতিদ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করা ইউরোপীয় রীতি। উহার সর্ব্বাবয়ব এদেশে কখনই পরিস্ফুট হয় নাই। ইউরোপীয় প্রণালী কাল্পনিক চুক্তি মূলক বলিয়া উহার অভ্যন্তরে এই অতথ্যটীর সঞ্চার হইয়াছে যে কি প্রাকৃত কি অপ্রাকৃত লোক মাত্রেই অতি গরিষ্ঠ রাজকার্য্য পরিচালনেও মতামত প্রদান করিতে সক্ষম এবং অধিকারী। এই অতথ্য ইউরোপের সকল দেশেই অল্প বা অধিক পরিমাণে সংক্রামিত হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রণালীতে এই মৌলিক দোষ থাকায় উহা অতিশয় বিপ্লব-প্রবণ হইয়াছে। সেই জন্যই ইউরোপে সোশিয়ালিষ্ট, আনারকিষ্ট, নিহিলিষ্ট প্রভৃতি সমাজ বিপ্লবকারীদিগের উৎপাত এবং আমেরিকায় বিচার কার্য্যেও হঠকারী প্রাকৃত লোকের হস্তক্ষেপে লিঞ্চ-ল এর উৎপত্তি। এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সুদূরদর্শী কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত প্রতিভূ নির্ব্বাচন প্রণালীর সঙ্কোচ ও সমিতি গঠন রীতির পরিবর্ত্ত করিতে চাহিতেছেন।

অপর একটী কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। ইংরাজী হইতে যে সকল ইতিহাসাদি গ্রন্থ সাধারণতঃ অধ্যয়ন করা হয়, সে গুলি প্রায়ই প্রটেষ্টাণ্ট মতাবলম্বীদিগের প্রণীত। প্রটেষ্টাণ্টেরা ধর্ম্ম-শাসনের পরম বিদ্বেষ্টা। তাঁহারা ধর্ম্মশাসনের প্রাধান্যকে যাজকতন্ত্রতা বলেন, এবং ঐ শাসনকে রাজার শাসন অপেক্ষা কঠিনতর এবং সর্ব্বপ্রকারে নিকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করেন।

কিন্তু তাঁহাদের কথা প্রকৃত কথা নহে। বিশেষতঃ প্রটেষ্টাণ্টদিগের পুস্তকাদিতে যাজক তন্ত্রতার যে সকল দোষের উল্লেখ হইয়া থাকে, তাহার কিছুই ভারতবর্ষীয় সমাজ সম্বন্ধে খাটে না। এখানকার ধর্ম্ম শাসনের যে যে বিশিষ্টতা আছে, তাহার উল্লেখ মাত্রই যথেষ্ট হইবে।

(১) অন্যান্য সমাজে, যথা রোমানকাথলিক এবং বৌদ্ধদিগের মধ্যে, যাজকেরা গৃহস্থ লোক নহেন। তাঁহারা বিবাহ করিয়া গার্হস্থাশ্রম অবলম্বন করেন না। সুতরাং প্রজাসাধারণের সহিত তাঁহাদিগের সহানুভূতি অল্প হয়। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থ লোক।

(২) অন্যান্য সমাজের যাজকেরা এক একটী দলপতির অধীন। রোমানকাথলিকেরা পোপের অধীন, বৌদ্ধযতিরা দেশভেদে ধর্ম্মরাজের অথবা লামার কিম্বা প্রধান ফুঙ্গীর অধীন। ব্রাহ্মণেরা ওরূপ কোন দলপতির অধীন নহেন। সুতরাং তাঁহারা সাধারণ সমাজ হইতে কোন ভিন্ন সূত্রে সম্বদ্ধ না হওয়াতে সেই সাধারণ সমাজেরই প্রতি সম্পূর্ণ মমতাসম্পন্ন।

(৩) অন্যান্য সমাজে, যথা প্রটেষ্টাণ্ট এবং গ্রীক সাম্প্রদায়িক খৃষ্টান-দিগের মধ্যে, যাজকদল রাজার ভৃতিভুক; সুতরাং পরাধীন। ব্রাহ্মণেরা সেরূপ নহেন। ইহাঁরা যে নিষ্কর ভূমি অধিকার করিতেন, তাহা পৈত্রিক সম্পত্তির ন্যায় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিতেন—রাজা তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণদিগের অপরাপর জীবনোপায়ও গৃহস্থের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানাদি হইতে হইত। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বতো-ভাবে স্বাধীন এবং সত্ত্ব-গুণ-প্রধান থাকিয়াই ধর্ম্মাধিকরণে এবং শাস্ত্রশিক্ষা-প্রদানে সমীচীনরূপে যোগ্য হইতে পারিতেন।

(৪) অন্যান্য সমাজে, যথা খৃষ্টান এবং মুসলমানদিগের মধ্যে, ধর্ম্মশাস্তৃগণকে যতটা সাক্ষাৎসম্বন্ধে রাজসাহায্য লইয়া আপনাদিগের ধর্ম্মশাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, ভারতবর্ষের সমাজ-প্রণালীতে অন্তঃশাসনের আধিক্য নিবন্ধন তত করিতে হয় নাই। শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার দেখিয়া সেই দৃষ্টান্তানুসরণ করিবার উপদেশই বহুলপরিমাণে আছে। প্রায়শ্চিত্তের বিধি রাজদণ্ডের বিধি নয় এবং অন্যান্য সকল সমাজ অপেক্ষা হিন্দু সমাজেই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই অধিকতর পরিমাণে ধর্ম্মশাসন নির্ব্বাহিত হইবার ব্যবস্থা আছে।

অতএব ভারতবর্ষের এবং অপরাপর সমাজের ধর্ম্মশাসনে আকাশ পাতাল ভেদ। অন্যান্য সমাজের ন্যায় এখানকার ধর্ম্মশাসনকে যাজক-তন্ত্রতা মনে করা এবং তাহার প্রতিকূল মতবাদ গ্রহণ করা অতি প্রকাণ্ড ভ্রম।

পাশ্চাত্যভাব—তাহার উপসংহার।

ভারতবর্ষে ইংরাজ সমাগমে যে পাশ্চাত্যভাবগুলির প্রবেশ হইয়াছে বলা হয়, সে গুলির বিচার করিয়া দেখা হইল যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন কোনটী আদবেই ভাল বস্তু নয়—আর কোন কোনটী নূতন বস্তু নয়—অপর যাহা ভাল এবং কতক নূতন তাহার যথাযথ প্রবেশ হয় নাই। পূর্ব্ব গত কয়েক প্রবন্ধে দেখা গিয়াছে যে (১) একান্ত স্বার্থপরতা ভারতবর্ষীয়দিগের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং (২) উন্নতিশীলতার প্রকৃতপথ যে চিত্তাদর্শের উৎকর্ষ সাধন তাহা ইংরাজ সংশ্রবে সাধিত হইতে পারে না। দৃষ্ট হইয়াছে যে (৩) ইউরোপীয় সাম্যবাদটা নিতান্ত মৌখিকও বটে এবং মিথ্যাও বটে, আর ভারতবর্ষে উহার পর্য্যাপ্ত স্থানও নাই। দৃষ্ট হইয়াছে যে (৪) ঐহিকতা যে পরিমাণে এবং যে ভাবে এ দেশে দমিত হইয়া আছে, তাহা থাকাই ভাল। দৃষ্ট হইয়াছে যে (৫) স্বাতন্ত্রিকতার যে পথ খুলিয়াছে তাহা প্রকৃত স্বাতন্ত্রিকতার পথ নহে, অতি মারাত্মক উচ্ছৃঙ্খলতারই পথ। দৃষ্ট হইয়াছে যে (৬) এদেশে বৈজ্ঞানিকতার প্রকৃত প্রস্তাবে সঞ্চারহয় নাই। পরিশেষে দেখা গিয়াছে যে (৭) রাজার সমাজ প্রতিভূত্ব সংস্থাপনের যে উপায় ভারতবর্ষে ছিল, তাহা বর্ত্তমান রাজশাসন দেশীয় ধর্ম্ম শাসনের নিরপেক্ষ হওয়ার একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, আমি যেরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সেইরূপেই হউক বা অন্য কোন প্রকৃতরূপেই হউক, যিনিই উল্লিখিত পাশ্চাত্যভাব গুলির অভ্যন্তর পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, তিনিই বুঝিবেন যে, উহাদিগের কতকগুলি আসলেই ভুয়া এবং মেকি আর অপর কতকগুলি ভাঙ্গা এবং বেকেজো হইয়াই এখানে আসিতেছে। কিন্তু উহারা যতই ভুয়া বা বেকেজো হউক, উহাদিগের চলন ক্রমশঃই বাড়িতেছে।

যে ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তারা উহাদিগের প্রচালনে বিশেষ তৎপর, তাঁহারা হয় ত ওগুলিকে মেকি বলিয়াই জানেন না, এবং হয়ত মনে করেন যে, ঐ

সকল ভাবের প্রাবল্যেই তাঁহাদিগের নিজ জাতির উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাস তাহা বলে না। ইংলণ্ডের ইতিহাস হইতে সপ্রমাণ হয় যে, যে সময়ে ইংরাজদিগের মধ্যে ঐহিকতার, ক্রমোন্নতির এবং স্বাতন্ত্রিকতার ভাব অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ছিল, সেই পিউরিটানদিগের প্রাবল্যের সময়েই ইংলণ্ডের চরম উন্নতির সূত্রপাত হয়। সেই সময়ের সঞ্চিত বল হইতেই বাণিজ্যের বিপুল বিস্তার, উপনিবেশের প্রসার এবং অধিকারের আধিক্য হইয়াছে। দেশে ধনাগমনের পথ অতি প্রশস্ত হইয়া উঠিলে, ইংরাজের হৃদয়ে ক্রমশঃ সুখলালসার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং যেমন তাহা হইতেছে সেই পরিমাণে উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মনে ধর্ম্মসূত্রলব্ধ পূর্ব্ব বল ন্যূন হইয়া স্বার্থবাদ, হিতবাদ, ঐহিকতা, সাম্যবাদ প্রভৃতির উদয় হইতেছে। এক শত দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপখণ্ডের মধ্যে যে কোন বিষয় লইয়া রাজ্যে রাজ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইত, ইংলণ্ড তাহার মধ্যে একজন হইতেন, এখন 'ধরি মাছ না ছুঁই পাণির' ভাব উদ্রিক্ত হইয়াছে। ইটালীর স্বাধীনতা-সাধন ফ্রান্স সম্রাট করিলেন, ইংলণ্ড বসিয়া দেখিলেন। প্রুসিয়া এবং অষ্ট্রীয়া মিলিয়া ডেনমার্ককে ভাঙ্গিয়া ফেলিল—ইংলণ্ড আপনার প্রতিশ্রুত পালন করিতেও ভুলিয়া গেলেন। প্রুসিয়া অষ্ট্রীয়ার প্রতি লগুড় প্রহার করিলেন এবং ফ্রান্সের মস্তক চূর্ণ করিলেন—ইংলণ্ডের মুখ হইতে একটী কথাও বাহির হইল না। এই ইংলণ্ড কি সেই ইংলণ্ড, যে প্রথম নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ সমুদায় ইউরোপখণ্ডকে জাগ্রৎ করিয়াছিল এবং ইউরোপের অর্দ্ধ পরিমিত সেনার খরচ যোগাইয়াছিল? কিন্তু ইংরাজ গ্রন্থকর্তৃগণ উন্নতিশীলতার ভাবে একান্ত মুগ্ধ বলিয়া এরূপ হওয়াকেও উন্নতি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং এখনকার কালে তাঁহাদিগের মনে যে সকল ভাবের আবির্ভাব হইয়া উঠিতেছে, তাহাই ভাল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের সাধারণ লোকের মধ্যে এখনও ঐহিকতাদি নব্য ভাব সকলের সম্যক প্রবেশ হয় নাই এবং তাহা হয় নাই বলিয়াই এখনও ইংলণ্ডের প্রতাপ সম্পূর্ণরূপে শীতল হইয়া পড়ে নাই।

আমি এমন কথা বলি না যে, ইংলণ্ড পূর্ব্বকালে যেমন ছিলেন, তাহাই ভাল ছিল। ডিস্‌রেলি বলিয়া গিয়াছেন যে, এখনকার দিনে ইংলণ্ড যতটা আসিয়িক সাম্রাজ্য, ততটা ইউরোপীয় রাজ্য মধ্যে গণ্য নয়—যদি এটা প্রকৃত কথা হইত, অর্থাৎ যদি ইংলণ্ড আসিয়িক সাম্রাজ্যগুলির ন্যায় শান্তি-প্রবণ এবং পর রাজ্যের প্রতি সম্যক লোভ শূন্য হইতে পারিতেন, তাহা হইলে ভালই হইত। কিন্তু ইংলণ্ড তাহা পারেন নাই; আজি আসান্টি, কালি সাইপ্রস্, পর দিন মিসর, তাহার পর ব্রহ্ম, এইরূপে দুর্ব্বল পররাজ্য-গুলি কুড়াইয়া বেড়াইতেছেন, কিন্তু ইউরোপের আভ্যন্তরিক প্রবল যুদ্ধাদিতে ঔদাসীন্য অবলম্বন করিতেছেন। ইহা লোভ দমনের লক্ষণ নয়, শক্তি-সঙ্কীর্ণতারই লক্ষণ।

ফলতঃ ঐহিকতাদির প্রাবল্যে দেশের বলবৃদ্ধি হয় না। স্বার্থপরতার দৃষ্টি সহজেই সঙ্কীর্ণ। উহার সহিত বিদ্যা বিবেকাদির মিশ্রন থাকিলে কিছু দিন কতকটা দূরদর্শন থাকিতে পারে, এবং দূরদৃষ্টির গুণে একেবারে অধঃ-পাত হয় না। কিন্তু পরিণামদর্শিতা সকল সময়ে সকল দিক বজায় করিতে পারে না, স্বার্থপরতাদি দোষে বুদ্ধিও বিকৃত হইয়া যায়। সুতরাং স্বার্থপরতা দূষিত বুদ্ধিমত্তাতেও অধিক দিন চলিতে পারে না। ইংলণ্ডের মন্ত্রিদল সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন পাছে তাঁহারা প্রজার উপর করভার বৃদ্ধি করিলে প্রজার অসন্তোষ জন্মে এবং তাঁহারা পদচ্যুত হয়েন। এই ভয়ে তাঁহারা কর বৃদ্ধি করিয়া সৈনিক বল কিম্বা পোতবল বিশিষ্টরূপে বর্দ্ধিত করিতে পারেন না। কিন্তু ইউরোপের অপরাপর দেশীয়েরা আপনাপন পোত বলের নিরন্তর বৃদ্ধি করি-তেছে এবং কেহ কেহ পোতবলেও ইংলণ্ডের সমকক্ষ প্রায় হইয়া উঠিতেছে। ইংলণ্ডের বণিক দ্রব্যে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক পরিমাণে ভেজাল চলিতেছে। ইংলণ্ডের কণ্ট্রাক্টরেরা স্বজাতীয় সেনার ব্যবহারার্থ অস্ত্র শস্ত্রাদিতেও ভেল করিয়া দিতেছে। ঐহিকতাদিভাবের বৃদ্ধিতে এইরূপ অশুভময় ফল ফলিত হয়।

ইউরোপীয় সমাজগুলির মধ্যে যেটী আপনাকে সর্ব্বোচ্চ বলিয়া গর্ব্ব

করিত, সেই ফ্রান্সেই ঐহিকতা, স্বাতন্ত্রিকতা, উন্নতিশীলতা এবং সাম্যাদি ভাবের জন্ম না হউক, ঐ দেশেই উহাদিগের আত্যন্তিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টি হইয়াছে। সেই বৃদ্ধির এবং পুষ্টির ফলে, প্রুস ফরাসির যুদ্ধের সময় ফরাসি-দিগের বারুদের পিপায় বালি এবং কয়লা, ময়দার সিন্ধুকে খড়ি এবং করাতের গুঁড়া, এবং জুতার চামড়ার তলে পেষ্ট বোর্ড বাহির হইয়াছিল।

অতএব ইউরোপীয় ইতিহাসও বলে না যে, স্বার্থপরতা, স্বাতন্ত্রিকতা, ঐহিকতাদি গুণে কাহারও কখন ভাল হইয়াছে। আমাদিগের পক্ষে ঐ সকল ভাবের গ্রহণ রোগীব্যক্তির কুপথ্য সেবনের ন্যায় অতি সাংঘাতিক।

ভারতবর্ষে ঐ সকল ভাবের প্রবেশ রুদ্ধহওয়াই আবশ্যক। সমাজ যেন তাহা বুঝিয়াই ঐ গুলির প্রবেশ রোধ করিবার নিমিত্ত কাকুক্তি করিতেছে। দেশময় আর্য্য সভা, হরিসভা, ধর্ম্মসভা প্রভৃতির উত্থান হইতেছে —সংস্কৃত শাস্ত্রের সমাদর বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে—এবং ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যেও প্রথম দল যতটা আত্মসমাজ বিদ্বেষ্টা হইয়াছিলেন এখনকার ইংরাজী শিক্ষিতেরা ততটা আপন সমাজের প্রতিকূলতা করিতেছেন না।

কিন্তু প্রতিকূলতা না করুন, তাঁহাদিগের ইংরাজী ভক্তিটা অদ্যাপি অতি বিসদৃশ হইয়াই আছে। যাহা ইংরাজীতে নাই তাহাতে তাঁহাদের শ্রদ্ধা হয় না। আর ইংরাজকৃত নিন্দা এবং ইংরাজকৃত প্রশংসা তাঁহাদিগকে বড়ই অধিক লাগে। এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। মানুষের স্বভাবই এই, যাহা কিছুর নিমিত্ত অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয়, সেটাকে অকিঞ্চিৎকর সামান্য বস্তু বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজী শিখিতে আমাদের অতিশয় পরিশ্রম হয়। সেই ইংরাজী হইতে আর কিছুই পাই নাই, কেবল সামান্য জীবিকা উপার্জ্জনের অতি সামান্য উপায় মাত্র পাইয়াছি, এরূপ মনে করিতে বড়ই ক্লেশ জন্মে। অতএব ইংরাজী হইতে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইতেছে, আপনাদের উন্নতির পথ মুক্ত হইতেছে, এরূপ মনে করিতে না পারিলে হৃদয়ের সন্তাপ ঘুচে না। সেইজন্য আমরা ইংরাজী হইতে অনেক প্রকারে অনেক লাভ করিতেছি, এরূপ মনে করিতে

চাই এবং মনে করিতে চাই বলিয়া তাঁহাই মনে করিয়া থাকি। সুতরাং ইংরাজ গ্রন্থকর্ত্তৃবর্গের প্রদত্ত বস্তু সকল পরীক্ষা করিয়া লইতে প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহাদের মেকিগুলিও চালাইতে দেই।

আলস্য মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। ইংরাজী হইতে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা প্রকৃত কি অপ্রকৃত, তাহার কতটা মিথ্যা, কোন্ ভাগ আমাদের উপযোগী, কোন্ ভাগ অনুপযোগী, এ সকল কথা নিপুণ হইয়া বুঝিতে গেলে অনেকটা পরিশ্রম, অনেকটা অধ্যয়ন এবং অনেকটা চিন্তার প্রয়োজন হয়। স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইতে পারিলে বড় উপাদেয় ভোজন হয় বটে, কিন্তু স্বপাকে খাইবার অবসর, সুবিধা এবং প্রবৃত্তি সকলের হয় না। এই আলস্যের সহিত নৈসর্গিক আশার সংযোগে মনে হয় যে, আমাদিগকে আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল ইংরাজী হইতে যে সকল ভাব পাইতেছি মনে মনে সেইগুলির সঞ্চয় করিয়া রাখিলেই আমরা ফাঁপিয়া উঠিব এবং কাল স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া গিয়া উন্নতির ক্রোড়ে উঠিব। এই মনোভাবটী অনুকৃতির এবং নিশ্চেষ্টতার পোষক। আমরা সেই জন্যই অনুকৃতি-পরায়ণ এবং প্রকৃতপক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছি।

কিন্তু নিশ্চেষ্টতা ভাল নয়। উহা মৃত্যুর লক্ষণ। অতএব উহা ত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক এবং সেইজন্য শুদ্ধ ইংরাজী পুস্তক এবং বাগ্মিদের মুখ হইতে মেকি এবং ভাঙ্গা পাশ্চাত্যভাব না লইয়া ইংরাজ সংস্রবে আমাদের কি হইতেছে, তাহা নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া বুঝা আবশ্যক। কারণ তাহা না করিলে ভাল, মন্দ, সত্য, মিথ্যা, আসল, মেকি চিনিতে পারা যায় না, এবং চিনিতে না পারিলেও ভাল পাইবার জন্য এবং মন্দত্যাগের জন্য চেষ্টা হইতে পারে না।

কিন্তু উল্লিখিতরূপে ইংরাজসংস্রবের ফল বুঝিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে না, ভারতবর্ষে ইংরাজ অধিকারের ফল কিরূপ (১) হইয়াছে এবং (২) হইবার সম্ভাবনা তাহাও নিবিষ্ট মনে বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইংরাজাধিকার—ইংরাজের বণিকভাব।

ভারতবর্ষে ইংরাজের আধিপত্য একটী অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। ভারতবর্ষের পরিমাণফল ১৭ লক্ষ বর্গ মাইল, সমস্ত ব্রিটিস দ্বীপপুঞ্জের পরিমাণফল ৮৮,হাজার বর্গমাইল মাত্র; ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা প্রায় ২৮ কোটি, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা ৩,০ কোটির অনধিক; আর ভারতবর্ষ ইংলণ্ড হইতে ১৫,হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। এমন ক্ষুদ্র দেশের এত অল্পসংখ্যক লোক এত দূরে এমন অতি বিস্তৃত সাম্রাজ্য আর কখন অধিকার করিতে পারে নাই।

এইরূপে অতি স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলেও ইংরাজের ভারতসাম্রাজ্য যথেষ্ট বিস্ময়কর বোধ হয়। কিন্তু যদি মনে করা যায় যে, এই সাম্রাজ্য সংস্থাপনে ইংলণ্ডকে আপনার সমুদায় বল প্রয়োগ করিতে হয় নাই—সমুদায় বলের কথা কি, ইংলণ্ডের রাজশক্তিও এই সাম্রাজ্য গ্রহণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয় নাই—এক সম্প্রদায় ইংরাজবণিক্ কর্তৃকই এক শত বর্ষের মধ্যে এই কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে আর বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

কোন ফরাসী রাজনৈতিক বলিয়াছেন, যে ইংলণ্ড যদি ভারতবর্ষ অধিকার না করিতেন, তবে এখন ইউরোপীয় রাজ্য সকলের মধ্যে উঁহার যে উচ্চ আসন তাহা পাইতেন না—ইংলণ্ড প্রথম শ্রেণীর রাজ্য না হইয়া পোর্ত্তুগালের ন্যায় একটী সামান্য রাজ্য বলিয়াই গণ্য হইতেন। ফরাসী রাজনৈতিকের উক্তিটী সর্ব্বতোভাবে সত্য বলিয়া স্বীকার করা

যায় না। ইংলণ্ডের ভারতবর্ষ অধিকার তাহার মহিমার অন্যতম প্রমাণ মাত্র। ইহাতেই ইংলণ্ডের মহিমার পর্য্যবসান হয় নাই। ইংলণ্ডের অপরাপর অধিকারও অতি প্রশস্ত। ইংলণ্ডের অধিকার কি আমেরিকা খণ্ডে, কি আফ্রিকা খণ্ডে, কি সামুদ্রিকা খণ্ডে, কোন খণ্ডেই কম নয়। ঐ সকল খণ্ডে ইংলণ্ড যে সকল উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন, সে গুলিও প্রত্যেকে এক একটী সুবৃহৎ সাম্রাজ্য হইয়া উঠিতেছে।

পূর্ব্বকালে রোম সাম্রাজ্য পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ হইয়াছিল। উহা ভূমণ্ডলের সমস্ত স্থলভাগের বিংশতিতম অংশ ব্যাপিয়া বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। নব্য রুসীয় রাজ্য পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগের সপ্তমাংশ ব্যাপক; কিন্তু ইংরাজ রাজ্য (ভারত লইয়া) সমুদায় স্থলভাগের প্রায় ষষ্ঠাংশ অধিকার করিয়া আছে। তদ্ভিন্ন, রোম এবং রুসীয় সাম্রাজ্য উভয়েই মূলতঃ কৃষি-সূত্রক এবং একচক্র, অর্থাৎ উহারা কৃষি বিস্তারের প্রয়োজনে সঞ্জাত এবং এক একটী রাজধানীর চতুর্দ্দিকব্যাপী, বিভিন্নাংশে বিচ্ছিন্ন নয়। ইংরাজসাম্রাজ্য বাণিজ্যসূত্রক এবং বহু-চক্র, অর্থাৎ পরস্পর অসংলগ্ন রূপেই অবস্থিত। এক-চক্র রাজ্যের সংস্থাপন, পরিবর্দ্ধন, সংরক্ষণ এবং সুপালন বহু-চক্র রাজ্যের পালনাদি অপেক্ষা সহজ এবং স্বল্প ক্ষমতার ব্যঞ্জক। ইংরাজ শুদ্ধ বৃহত্তর সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াই আপনার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন এমত নহে, সেই রাজ্য বহু চক্র হওয়াতে ঐ সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্টরূপেই প্রকট করিয়াছেন। *

অতএব ভারতরাজ্যের অধিকারই ইংরাজের ক্ষমতার সর্ব্ব প্রধান প্রমাণ নয়। প্রত্যুত ভারতরাজ্য অধিকারের জন্য ইংরাজকে স্বীয় প্রভূত বলের অতি অল্প মাত্রই প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। ভারতরাজ্য যেন

---

* প্রথম নেপোলিয়ন বলিতেন কৃষিসূত্রক সাম্রাজ্য বাণিজ্যসূত্রক সাম্রাজ্য অপেক্ষা সহজে সংস্থাপিত এবং স্বতঃই দৃঢ়তর হয়।

স্বয়ং ইচ্ছা করিয়াই ইংরাজকে আপনার সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন। বিচক্ষণ ইংরাজেরা ইহা বুঝেন এবং হয় (অধ্যাপক শিলি প্রভৃতির ন্যায়) ইহা স্পষ্ট কথায় স্বীকার করেন, অথবা (লর্ড লরেন্স প্রভৃতির ন্যায়) ভারত রাজ্য ইংরাজকে জগদীশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত বলেন; আপনাদের বাহুবলে উপার্জ্জন করিয়াছেন এ কথা (নিতান্ত গোঁয়ার ভিন্ন আর কোন ইংরাজ) বলেন না। বস্তুতঃ নিবিষ্ট মনে ভাবিয়া দেখিলেই প্রতীত হয় যে, ভারতবর্ষ আপনাতে পূর্ব্বনিহিত শক্তি সকলের প্রভাবে যে দিকে অভিমুখ হইয়াছিল, ইংরাজ ইহাকে সেই দিকে লইয়া গিয়াছেন, এবং সেই জন্যই তাঁহার কার্য্যটী এত সত্বরে এবং সহজে সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রথমতঃ। ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীনে একচ্ছত্র হইয়া উঠিয়াছে। ইতিহাসও বলে যে, ভারতবর্ষ যদিও বিভিন্নভাগে বিভক্ত তথাপি বহুপূর্ব্বকাল হইতে ইহার মধ্যে একটী সম্মিলনপ্রবণতাও জন্মিয়া আছে। সেই সম্মিলনপ্রবণতা হইতেই হিন্দু রাজাদিগের প্রতি দিগ্বিজয় দ্বারা রাজসূয় অশ্বমেধাদি যজ্ঞ করিবার বিধি, সেই সম্মিলনপ্রবণতা হইতেই শ্রীরামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, যযাতি এবং অশোকাদির সময়ে কতকটা একচ্ছত্রতা সাধন, এবং সেই জন্যই আফগান এবং মোগল সম্রাটদিগের দ্বারা দাক্ষিণাত্যের প্রতি ভূয়োভূয়ঃ আক্রমণ হইয়াছিল। ইংরাজ কর্তৃক দেশের ঐ সম্মিলনপ্রবণতা সম্যক্ প্রকারেই সিদ্ধ হইয়াছে। দেশটী যেমন এক হইতে চাহিতেছিল, তাহাই হইতে পাইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ। ইংরাজের আধিপত্যে ভারতবর্ষের মধ্যে শান্তির পূর্ণতা জন্মিয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রকারেরা ভারত সমাজকে শান্তিপ্রকৃতিক করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু স্থায়ীরূপে একচ্ছত্রতা সংস্থাপিত না হওয়ায় তাঁহাদের মনস্কামনা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতে পারে নাই। ইংরাজ হইতেই তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোন স্থলেই আর দেশীয় রাজাদিগের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইতে পারে না। বিচ্ছিন্ন রাজগণ

ইংরাজের একান্ত বশীভূত হইয়া পরস্পর বিবাদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং ক্রমে ক্রমে পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন হইতেছেন।

তৃতীয়তঃ। ইংরাজের অধিকারে দেশে শান্তি-সংস্থাপিত এবং বর্ম্মাদির বাহুল্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের বৃদ্ধি হওয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্নপ্রদেশীয় জনগণের মধ্যে পরস্পর আলাপ পরিচয় এবং সম্মিলন জন্মিতেছে। আর্য্য-শাস্ত্রকারেরা যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য নানা স্থানে তীর্থের এবং মেলাদির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইংরাজকর্ত্তৃক শান্তিস্থাপনে তাহা শতগুণে এবং অতি উৎকৃষ্টরূপেই নির্ব্বাহিত হইতেছে।

চতুর্থতঃ। ইংরাজ-মাহাত্ম্যে ভারতবর্ষের প্রতি অপরাপর বিজিগীষু জাতির আক্রমণ নিবারিত হইয়াছে। এই মহাদেশের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া হূনেরা এবং যবনেরা, উত্তর পূর্ব্বদিক হইতে খসেরা, কোলেরীয়েরা এবং আহমেরা, পূর্ব্বোপকূলভাগে দ্রাবিড়ীয় নানা জাতি, এবং পশ্চিম উপকূলে শক পারসিকাদি জাতি বহুপূর্ব্বকাল হইতে ইহার প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়াছে, এবং সময়ে সময়ে বহুদূর পর্য্যন্ত ইহার অভ্যন্তরে লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। ঐ সকল জাতীয়ের সংস্রব আর্য্য শাস্ত্রকৃদ্বর্গের বড়ই উদ্বেগের কারণ ছিল, এবং উহাদিগের দমনার্থ তাঁহারা ক্ষত্রিয় রাজকুলকে সময়ে সময়ে প্রোৎসাহিত করিতেন। এখন ইংরাজ সেনা কি উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, কি উত্তর পূর্ব্বভাগে, যেখানে কিছুমাত্র দৌরাত্ম্যের সূত্রপাত হয়, সেই খানেই গিয়া দৌরাত্ম্যকারীদিগকে দমন করিয়া আইসে, এবং ভারতবর্ষের সমস্ত উপকূলভাগে ইংরাজ-রণতরী সর্ব্বদাই প্রহরী স্বরূপে ভ্রমণ করিতেছে। কোন দিক হইতে কিছুমাত্র শঙ্কার কারণ উপস্থিত হইতে পারে না।

অতএব ভারতবর্ষ যে দিকে যাইতে উন্মুখ ছিল, যে ভাবাপন্ন হইতে চাহিতেছিল, ইংরাজ সেই দিকেই ভারতকে লইয়া গিয়াছেন, এবং সেই ভাবাপন্ন করিয়াছেন। সেই জন্যই ভারত আপনাকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

তদ্ভিন্ন, ইংরাজ বণিকবেশেই আসিয়াছিলেন এবং বণিকবেশেই ভারত লাভ করিয়াছেন। বণিক অতি সাবধান পুরুষ। তিনি আপনার লাভের দিকে স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া অতি সতর্ক হইয়া চলিয়া থাকেন। ইংরাজ বড় সাবধানেই চলিয়াছেন। বাস্তবিক, উপনিবেশ সংস্থাপন অথবা দূর দেশে অধিকার গ্রহণ সম্বন্ধে একটী নিয়ম এই যে, ঐ সকল কার্য্যে রাজ-শক্তির সাক্ষাৎ প্রয়োগে অধিকতর বিঘ্ন উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে স্পেনীয় এবং পর্ত্তুগীজেরা স্ব স্ব দেশের রাজগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া আমেরিকা খণ্ডে এবং অনেকানেক দ্বীপাবলীতে উপনিবেশাদি স্থাপন করিতে যায়। উহারাও বিলক্ষণ সাহসিক, ক্লেশসহিষ্ণু, অধ্যবসায়শীল, বীরপ্রকৃতিক লোক ছিল। কিন্তু তাহাদিগের মনোমধ্যে কেমন একটা গর্ব্বের ভাব থাকিত, উহারা তাহা গোপন বা দমন করিয়া চলিতে পারিত না। এই জন্য যে যে দেশে যাইত, সেই সেই দেশীয় লোকদিগের সহিত উহাদের বিবাদ হইত। ইংরাজবণিক সেই সকল লোক অপেক্ষা বিশেষ ধীরতা-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি যেন আর্য্য পণ্ডিতবর্গের প্রদর্শিত ন্যায্য পথের অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছিলেন। আর্য্য শাস্ত্র পররাজ্য বিজয় সম্বন্ধে বিধান করেন—

সর্ব্বেষাং তু বিদিত্বৈষাং সমাসেন চিকীর্ষিতম্।
স্থাপয়েত্তত্র তদ্বংশ্যং কুর্য্যাচ্চ সময়ক্রিয়াম্॥

প্রজাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান লোক সকলের অভিমতি সংক্ষেপে বুঝিয়া বিজিত রাজার বংশীয় কোন ব্যক্তিকে সেই রাজ্যে স্থাপন পূর্ব্বক তাহার সহিত (করাদি গ্রহণ বিষয়ে) নিয়ম করিবে।

ইংরাজ সমুদায় ভারতে এই নিয়মে চলিয়াছেন। যে রাজাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছেন, তাহারই বংশীয় বা সম্পর্কীয় কাহাকেও প্রথমে কৎ সিংহাসনে বসাইয়াছেন। তবে এইরূপে দুইবার চারিবার করিয়া ক্রমে রাজ্যটীকে স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন।

আর্য্যশাস্ত্রের আরও একটী বিধান এই—

প্রমাণানিচ কুর্ব্বীত তেষাং ধর্ম্মান্ যথোদিতান্।
রত্নৈশ্চ পূজয়েদেনং প্রধান পুরুষৈঃ সহ॥

বিজিত রাজ্যের প্রজাদিগের প্রচলিত ধর্ম্মাদি প্রমাণ করিবে এবং প্রধান পুরুষদিগের সহিত রত্নাদি প্রদান করিয়া প্রতিষ্ঠিত রাজার পূজা করিবে।

ইংরাজ ভারতবর্ষের যে প্রদেশ যখন গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, তিনি প্রজাদিগের ধর্ম্মের প্রতি বা আচার ব্যবহারের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইংরাজের প্রথম প্রতিযোগী পোর্তুগীজেরা ওরূপ কথা মুখে আনে নাই, দ্বিতীয় প্রতিযোগী ফরাসিরা যদি কখন কখন মুখে ঐ কথা আনিয়াছিল, তথাপি মধ্যে মধ্যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ দোষে দুষ্ট হইত।

কোম্পানির আমলের প্রথম ভাগে ইংরাজেরা এতদ্দেশীয় জনগণের ধর্ম্মাচারের প্রতি অনেকটা ভক্তি শ্রদ্ধাও খ্যাপন করিয়া চলিতেন। খৃষ্টান মিশনরীরা এতদ্দেশীয় জনগণের ধর্ম্মাচারে নিন্দা করিবেন ভাবিয়া তাহাদিগকে স্থান দেন নাই। অসম্পৃক্ত আগন্তুক ইংরাজদিগকেও রাজ্য মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দেন নাই, এবং স্বজাতীয় কাহাকেও এখানকার ভূসম্পত্তি গ্রহণ করিতে দেন নাই। প্রথম গবর্ণর জেনরেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস কালীঘাটের ৺কালীদেবীর পূজা দিতেন বলিয়া যে কিম্বদন্তী আছে, তাহা অমূলক নয়। দাক্ষিণাত্যের অনেক প্রসিদ্ধ দেবালয়ে গবর্ণর হইতে কালেক্টর সাহেব পর্য্যন্ত ইংরাজের প্রদত্ত বহুমূল্য রত্নাভরণ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

কোম্পানির আমলের শেষ পর্য্যন্ত দেশীয়দিগের আচারের প্রতিও ইংরাজের কোন অযথাচরণ হয় নাই। রাজপুতানার অন্তর্গত আবু পর্ব্বতে একটী গোরা পল্টনের ছাউনি ছিল। আবু পর্ব্বত জৈনদিগের একটী তীর্থস্থান এবং জৈনেরা পশুহিংসাপরাঙ্মুখ। কিন্তু

গোরা সৈনিকদিগের গোমাংস ভক্ষণে অত্যন্ত অভ্যাস। তাহারা উহা না পাইলে বড়ই কাতর হয়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আবু পর্ব্বত হইতে গোরা ফৌজের ছাউনি উঠাইয়া তথায় হিন্দু সিপাহির পল্টন রাখিয়াছিলেন, আপনার জিদ বজায়ের প্রয়াস পান নাই। ৺ কাশীধামেও ঐ রূপ করা হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট আপনার জিদ ছাড়িয়াছিলেন।

ইংরাজ ভারতবাসীর আচারের প্রতিও যেমন ব্যাঘাত করেন নাই, তেমনি এখানকার ব্যবহার শাস্ত্রেরও গৌরব রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। হিন্দুর সম্বন্ধে হিন্দুর এবং মুসলমানের সম্বন্ধে মুসলমানের ব্যবহার শাস্ত্র চলিবে বলিয়া প্রথমে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, ইংরাজ আপনাকে সেই প্রতিজ্ঞা দ্বারা বদ্ধ বলিয়াই মনে করেন।

এ পর্য্যন্ত ইংরাজকৃত যে সকল কার্য্যের উল্লেখ হইল, তাহার কতকগুলির দ্বারা ভারতবর্ষের চিরাভিলষিত বস্তু সাধিত হইয়াছে, এবং তাহার সাধন প্রণালীও যেন আর্য্য শাস্ত্রের অনুমোদিত পথেই চলিয়াছে। অতএব মুক্তকণ্ঠে বলা যায় যে, ইংরাজ ভারতকে তাহার গন্তব্য পথে লইয়া আসিয়াছেন—ইংরাজ অতি বিচক্ষণতা এবং ধীরতা সহকারে প্রজাবৃন্দের প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন—ইংরাজ ভারতে যে কাজ করিয়াছেন, তাহা ইংরাজ ভিন্ন অপর কেহ করিতে পারেন নাই, এবং পারিতেন না—এই জন্য ইংরাজ ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার, শ্রদ্ধার এবং ভক্তির ভাজন হইয়াছেন।

ইংরাজাধিকার—ইংরাজের রাজভাব।

বণিক-বীর ইংরাজ শতার্দ্ধ বর্ষমধ্যে ভারতবর্ষ দেশে যে সুবিস্তৃত রাজ্যাধিকার স্থাপন করিলেন, তাহা তাঁহার জন্মভূমি ইংলণ্ডের অপেক্ষা চতুর্গুণ বৃহত্তর, এবং প্রজা সংখ্যায় তাহার আট গুণ অধিকতর হইল। তাঁহার

কর্ম্মচারীরাও বার্ষিক তিন চারি হাজার টাকামাত্র বেতনে নিযুক্ত হইয়া, আট দশ বৎসরের মধ্যে, এত প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যাইতে লাগিল যে, তাঁহাদের বিভব লোকের বিস্ময়কর হইয়া উঠিল। তখন ইংলণ্ডে কল-কারখানা এখনকার ন্যায় অত্যধিক হয় নাই—তখন শিল্পের অথবা বাণিজ্যের কিম্বা কণ্ট্রাক্টের দ্বারা এখনকার ন্যায় অতি প্রভূত সম্পত্তির সৃষ্টি হয় নাই—এবং তখন ভূসম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধি হইয়া ভূম্যধিকারিবর্গের সমূহ বিভবশালিতা জন্মে নাই। সুতরাং তখন কোম্পানির স্বদেশপ্রতিগত কর্ম্মকরেরাই ইংলণ্ডের মধ্যে অতি বিভবশালী বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এরূপ হওয়াতে ইংলণ্ডীয় জনগণের মনে কোম্পানির প্রতি অত্যধিক মৎসরতা জন্মিয়া গেল এবং রাজমন্ত্রীদিগেরও ইচ্ছা হইল যে, ভারতরাজ্যটী কোম্পানির অধিকৃত না থাকিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজার অধীন হয়। সেই অবধি ক্রমশঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বণিকভাব ন্যূন হইতে লাগিল, তাঁহাকে সজাতীয়ের অনুমোদিত রাজভাব ধারণ করিতে হইল, অনন্তর সিপাহী-বিদ্রোহের পরিসমাপ্তিতে সমস্ত ভারতবর্ষ ইংলণ্ডেশ্বরীর খাস দখলে আসিল।

ইংরাজের অনুমোদিত রাজ ভাব ভারতবর্ষের চিরপ্রতিষ্ঠিত রাজ-ভাব হইতে কয়েকটী বিষয়ে মূলতঃই ভিন্ন। ইংরাজ জানেন যে, রাজ-শক্তি ত্রিধা বিভাজিত। তাহার একটী শক্তি ব্যবস্থা প্রণয়নে নিযুক্ত, দ্বিতীয়টী ধর্ম্মাধিকরণে ন্যস্ত, এবং তৃতীয়টী বিশেষ বিশেষ রক্ষণ কার্য্যে নিবদ্ধ। প্রাচীন ভারতে ব্যবস্থাপ্রণয়নের অধিকার রাজার হস্তে ছিল না। তৎ-কালজীবী ব্রাহ্মণেরাও সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা প্রণয়ন করিতে পারিতেন না। ব্যবস্থা প্রণয়ন যাহা হইবার তাহা প্রাচীন সংহিতা সকলেই হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা সেই সকল সংহিতানিবদ্ধ বচনের মীমাংসাপূর্ব্বক ধর্ম্মাধিকরণে আপনাদিগের অভিমতি খ্যাপন করিতেন মাত্র। রাজা সেই অভিমতির অনুরূপ কার্য্য করিলে যশোভাগী হইতেন নচেৎ তাঁহার প্রতি প্রকৃতিপুঞ্জের বিরাগ জন্মিত। ফলতঃ প্রাচীন হিন্দু-রাজাদিগের রাজশক্তি

ব্যবস্থার প্রণয়নে প্রসারিত ছিল না, ধর্ম্মাধিকরণেও ঐ শক্তি অতি খর্ব্ব হইয়াছিল। তাঁহাদিগের রাজ-নিয়ম একমাত্র রক্ষণ-কার্য্যেই একান্ত পর্য্যবসিত ছিল। ইহাকেই ভারতবর্ষীয় শাসনপ্রণালীর শারীরিক ব্যবস্থা বলিয়া ধরা যায়। এইরূপেই এই মহাদেশে সামাজিক শক্তিসামঞ্জস্যের বিধান চিরস্থায়ীরূপে অবধারিত হইয়াছিল।

উল্লিখিত বিধান হইতেই ইউরোপীয়-রাজনীতিশাস্ত্রে এবং ভারতবর্ষীয় রাজনীতিশাস্ত্রে একটী প্রকাণ্ড ভেদ জন্মিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় রাজনীতি শাস্ত্র সামাজিক-শক্তি সামঞ্জস্যের বিচার লইয়াই নিরন্তর বিব্রত। রাজার হস্তে কতটা শক্তি থাকিবে, এবং প্রকৃতি বা প্রধান পুরুষদিগের হস্তে কত থাকিবে, আর প্রজা সাধারণের হস্তেই বা কতটা থাকিবে, ইহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়াই সকল ইউরোপীয় রাজনৈতিক শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য যে সম্যক্‌রূপে সাধিত হয়, অর্থাৎ সকল সময়ে সামাজিক-শক্তি-সামঞ্জস্যের নিয়মগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা রাজনৈতিকদিগের পরস্পর মতভেদ এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রকৃতি দর্শনে বোধ হয় না—প্রত্যুত তাহার বিপরীতভাবই অভিব্যক্ত হয়।

ভারতবর্ষীয় রাজনীতিশাস্ত্রে শক্তি-সামঞ্জস্যের কোন কথাই নাই—ইহাতে কেবল প্রজাপালনার্থ রাজার করণীয় ব্যাপারগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত হইয়া আছে। সেই সকল বিবরণ পাঠে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষীয় রাজগণের রাজ্যপালন ব্যাপার ধর্ম্মনীতি হইতে অভিন্নপ্রায় থাকিয়া অতি সুশৃঙ্খলতা সহকারেই নির্ব্বাহিত হইত। ইংরাজরাজের রাজনীতিটী ধর্ম্মনীতির সহিত ততটা অবিরুদ্ধভাবে চলিতে পারে নাই। ইংরাজের রাজনীতিতে দূরদর্শিতার অবলম্বনে কিয়ৎপরিমাণে ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় রাজনীতিতে বৈধশাসনের প্রভাবে ধর্ম্মের অধিষ্ঠান ছিল।

ইংরাজরাজের উল্লিখিত ভাব তাঁহার বৈদেশিকতামূলক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু উহা শুদ্ধ বৈদেশিকতাহেতুক নহে। উহা

তাঁহার রাজনীতির প্রকৃতি হইতেই সমুদ্ভূত। বৈদেশিকতা উহার মূল হইলে, ইংরাজের নিজের দেশেও ঐ দোষ দেখা যাইত না। কিন্তু ইংরাজের নিজের দেশেও বিভিন্ন সম্প্রদায় সর্ব্বদাই অন্যোন্যের বল-হানির জন্য চেষ্টা করে—বিশুদ্ধ ধর্ম্মনীতির অনুযায়ী হইয়া কোন সম্প্রদায়ই রাজনীতির পরিচালনা করিতে পারে না। অতএব এক পক্ষে, রাজশক্তি খর্ব্ব করিয়া রাখিবার জন্য যে চেষ্টা করিতে হয়, এই ইউরোপীয় নীতি ভারতবাসী জানে না; আর পক্ষান্তরে ইংরাজ-রাজ জানেন যে, প্রজাকর্তৃক নিবারিত না হইলে যথেচ্ছ শক্তি প্রসারণে তাঁহার সম্যক্ অধিকার আছে। এইরূপে ইংরাজাধিকারে ভারতবর্ষ মধ্যে রাজা প্রজায় একটী গূঢ় মতান্তরতা জন্মিয়া রহিয়াছে।

ইংরাজ জাতির ঐতিহাসিক ঘটনাবিশেষ হইতে সম্ভূত তাঁহার রাজস্ব-নীতিও ভারতবর্ষে রাজার প্রতি প্রজাকুলের সন্দিগ্ধচিত্ততা জন্মিয়া দিয়াছে। ইংলণ্ড দেশ যে শাক্‌সন জাতীয় জনগণ কর্তৃক অধ্যুষিত হয়, তাহারা দেশের ভূমিতে প্রজার স্বত্বস্বীকার করিত। কিন্তু নর্ম্মাণ জাতীয়েরা ইংলণ্ড দেশটীকে জয়লব্ধ করিয়া দেশের সমস্ত ভূ-সম্পত্তিতে বিজেতা রাজার নির্ব্যূঢ় স্বত্ব জন্মিয়াছে, এবং রাজার স্থানে প্রাপ্ত হইয়া ভূম্যধিকারিবর্গের সেই নির্ব্যূঢ় সত্ত্বে অধিকার স্থাপিত হইয়াছে, এইরূপ বুঝিয়াছিল। ইংলণ্ডে সেই ভাব অদ্যাপি বলবৎ রহিয়াছে। ইংরাজ-রাজ ভারতবর্ষেও সেইরূপ হইয়াছে ভাবিয়া আপনাকেই সমুদায় ভারতভূমিতে স্বত্ববান জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু রাজার এরূপ নির্ব্যূঢ় স্বত্বের কথা ভারতবাসীর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভারতবাসীর শাস্ত্রে বলে—

"স্থাণুচ্ছেদস্য কেদারমাহুঃশল্যবতো মৃগং।"

যে ব্যক্তি বন কাটিয়া আবাদ করে, ভূমি তাহারই হয়; যেমন যে শিকারীর অস্ত্রবেধ যে পশুতে থাকে, সে পশু সেই শিকারীরই হয়।

ইংরাজ তাহা বুঝিলেন না; তিনি বলিলেন ভারতের ভূমিতে আমারই

স্বত্ব। তাঁহার স্বদেশীয় জমিদারীনীতিতে যেরূপ প্রজার খোরাকিমাত্র বাদে সমস্ত উৎপন্নকেই ন্যায্য খাজনা বলিয়া ধরা হয়, যেন কতকটা সেইরূপ মনে তিনি ভারতভূমির অধিকাংশ ভাগেই প্রজার সহিত খাজনার বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। রাজার ভাগধেয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রদেশ ভিন্ন কোথাও কোন প্রকার নির্দ্দিষ্ট সীমা বদ্ধ রহিল না। প্রজারা ইংরাজরাজের অনুগ্রহ ভোগ করিতে পায়, কিন্তু আপনাদের স্বত্ব দেখিতে পায় না। ইংরাজরাজ কোথাও দশ বৎসরান্তে, কোথাও বা বর্ষে বর্ষে প্রজাদিগের সহিত রাজস্বের নূতন নূতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক উদ্বেগ জন্মাইয়া থাকেন। পক্ষান্তরে ভারতবাসীর শাস্ত্রে বলে—

সর্ব্বতো ধর্ম্মষড়্ভাগো রাজ্ঞো ভবতি রক্ষতঃ।
অধর্ম্মাদপি ষড়্ভাগো ভবত্যস্যহ্যরক্ষতঃ॥
যোঽরক্ষণবলিমাদত্তে করং শুল্কঞ্চ পার্থিবঃ।
প্রতিভাগঞ্চ দণ্ডঞ্চ স সদ্যো নরকং ব্রজেৎ॥
অরক্ষিতারং রাজানং বলিষড়্ভাগহারিণং।
তমাহুঃ সর্ব্বলোকস্য সমগ্রমলহারকং॥

যে রাজা প্রজার রক্ষা করেন, তিনি প্রজাকৃত ধর্ম্মকার্য্যের ষড়্ভাগ পুণ্যভাগী হয়েন; যে রাজা না করেন, তিনি পাপকার্য্যের ষষ্ঠাংশ ফলভাগী হয়েন।

যে রাজা প্রজার রক্ষা না করিয়া করাদি গ্রহণ করে, সে রাজা নিরয়গামী হয়।

যে রাজা রক্ষা না করিয়া কর গ্রহণ করে, সে সকল লোকের মল গ্রহণ করে।

অতএব ভারতবাসীর শাস্ত্রানুসারে প্রজারক্ষণের ভৃতিস্বরূপই রাজকর। কিন্তু বিজেতা ইংরাজ সে পথে গেলেন না। তিনি বলিলেন, ভারতবর্ষের সমস্ত ভূমিতে আমি স্বত্ববান হইয়াছি—আমি সেই জন্য করাদান করিব।

ইংরাজরাজ এতদ্দেশের ভূমিকরটীকে তাঁহার ভূ-স্বামিত্ব সম্বন্ধে প্রাপ্য মনে করায়, তাঁহাকে প্রজার জন্য যাহা কিছু করিতে হয়, তজ্জন্য নূতন নূতন করের দাওয়া হইয়াছে। এমন কি, ধর্ম্মাধিকরণ ব্যাপারেও তিনি ষ্টাম্পের আইন প্রসারিত করিয়া রাজার অবশ্যকরণীয় নির্ব্বাহের জন্যও একটী স্বতন্ত্র কর লইয়া থাকেন। ইংরাজরাজের ধর্ম্মাধিকরণও অতি ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। ফলতঃ এই সকল এবং অন্যান্য কারণে তিনি প্রজাদিগের চক্ষে শোষক বলিয়াই অবধারিত হইয়াছেন। (অতএব ব্যবস্থাপ্রণয়ন কার্য্যে প্রজার অভিমতির অপেক্ষা ব্যতিরেকে সাক্ষাৎ হস্তার্পণ করিয়া এবং আপনার ক্ষমতা বিস্তারের সীমা একমাত্র প্রজার প্রতিবন্ধকতা ভিন্ন অপর কিছুই না মানিয়া এবং প্রজাব্যূহের জন্মভূমিতে আপনার স্বত্ব আরোপ করিয়া এবং বিবিধ প্রকারে করাদানের মুখ-বিস্তৃত করিয়া ইংরাজ-রাজ ভারতবাসীর হৃদয়ে এমন একটী ভাবের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন, যে স্বয়ং অনেক শ্রেষ্ঠগুণে বিভূষিত এবং প্রজারক্ষণে কৃতকার্য্য হইলেও তাহার ভাবান্তর হইতে পারে নাই। তিনি গৌরবের আস্পদ হইয়া আছেন কিন্তু প্রীতিভাজন হইতে পারেন নাই।) ভারতবাসীর শাস্ত্রে বলে—

"পরাক্রমো বলংবুদ্ধিঃ শৌর্য্যমেতে বরাগুণাঃ।
এভির্হীনোঽন্যগুণযুক্ মহীভুক্ সধনোপি ন॥

পরাক্রম, বল বুদ্ধি এবং শৌর্য্য এইগুলি অতি শ্রেষ্ঠগুণ। এই সকল গুণশূন্য ব্যক্তি অন্যান্য গুণযুক্ত হইয়া সধন হইলেও ভূমিপতি হইতে পারেন না।

অতএব শূরসিংহ ইংরাজ রাজা হওয়ায় যোগ্যব্যক্তিরই রাজ্যাধিকার হইল মনে করিয়া ভারতবাসী তাঁহার গৌরব করিতেছে। তিনি যে বিদেশী সেজন্য ভারতবাসী তাঁহার প্রতি দ্বেষভাব সম্পন্ন হয় নাই। কেবল শোষক এবং স্বৈরস্বভাব এবং ভূস্বত্বাপহারক মনে করিয়া কুণ্ঠিত হইয়া আছে।

ইংরাজ-রাজের প্রজাপালন ভাব কেমন, তাহা সকলেই দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন। ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রতাপ দোর্দ্দণ্ড, তাঁহার শাসনরীতি দৃঢ়-শৃঙ্খলাবদ্ধ, তাঁহার কার্য্যপ্রণালীতে হঠকারিতা, অন্যায়কারিতা, পক্ষপাতিতাদি দোষ নাই বলিলেও চলে; অথবা যাহা কিছু আছে, তাহা বিশেষ যত্নসহকারেই সমাচ্ছাদিত। ইংরাজের রাজত্বে ভারতবর্ষের প্রতি বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ নাই, ইহার আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বিগ্রহাদি নাই, চৌর্য্য দস্যুতাদির প্রাদুর্ভাব নাই, সমস্তদেশ সর্ব্বতোভাবে উপশান্ত। ইংরাজের রাজত্বে বহির্ব্বাণিজ্যের বিস্তৃতি হইতেছে, অন্তর্ব্বাণিজ্যের সৌকর্য্য বাড়িতেছে, বিচার কার্য্যে ন্যায়পরতা রক্ষিত হইতেছে, মুদ্রাযন্ত্র স্বাধীনভাবে চলিতেছে, বিষয়জ্ঞতা বর্দ্ধিত হইতেছে, এবং ইউরোপীয়দিগের অনুমোদিত লেখা পড়ার প্রসার হওয়ায় দেশীয়দিগের কোন কোন বিষয়ে চক্ষু ফুটিতেছে —ফলকথা, ইংরাজের রাজত্ব একটী অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার; অপরাপর জাতির বৈদেশিক শাসনের সহিত তুলনা করিয়া না বুঝিলে ইহার উৎকর্ষ যথোচিতরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

রোমীয়েরা পূর্ব্বকালে অতি সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য সংস্থাপন এবং পালন করিয়াছিল। ইংরাজের ভারত শাসন-রীতি কতকটা তাহাদিগের প্রদেশ শাসনরীতির সদৃশ, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে তাহার অনুরূপ নয়। রোমীয়েরা বিজিত প্রদেশের শাসনকার্য্যে তত্তদ্দেশীয় লোকদিগকে নিযুক্ত করিত না। ইংরাজেরাও তাহা করেন না বলা যায়। কিন্তু রোমীয়েরা এক প্রদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া প্রদেশান্তরে প্রেরণ করিত, ইংরাজেরা তাহা না করিয়া ভারতবর্ষে সংগৃহীত সৈন্যদ্বারাই ভারতবর্ষ রক্ষা করিতেছেন। রোমীয়েরা বিজিত প্রদেশগুলি হইতে করসংগ্রহ করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিত, ইংরাজেরাও ভারতবর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে অনেক টাকা ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন বটে; কিন্তু সেই টাকা কর বলিয়া প্রেরিত হয় না। রোমীয়েরা প্রদেশ শাসনের ভার স্বজাতীয় এক এক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করিত, ইংরাজেরাও ভারতরাজ্য শাসনের ভার স্বজাতীয় কর্ম্মচারীদিগের

হস্তে রাখেন। রোমীয়েরা প্রদেশ শাস্তৃগণকে আপনাদিগের সেনেট সভার নিকট দায়ী করিয়া রাখিয়াছিল, ইংরাজেরাও ভারতবর্ষীয় গবর্ণর জেনরেল এবং গবর্ণরদিগকে আপনাদের পার্লিয়ামেণ্টের অধীন করিয়া রাখিয়াছেন। রোমীয়েরা আপনাদের লাটিন ভাষা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত প্রদেশগুলিতে বিদ্যালয় খুলিত, ইংরাজেরাও ভারতবর্ষে ইংরাজী শিখাইবার বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু রোমীয়েরা বিভিন্ন প্রদেশের প্রচলিত ভাষা শিখাইবার দিকে মন দিত না, ইংরাজেরা তাহাও দেন। রোমীয়েরা যে প্রদেশ জয় করিত, সে প্রদেশের পূজিত দেবতাদিকে আপনাদিগের দেবতা শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইত। একেশ্বরবাদী ইংরাজেরা তাহা করেন না বটে, কিন্তু ভারতবাসীদিগের ধর্ম্মপ্রণালী বিনষ্ট করিবার জন্যও কোন সাক্ষাৎ চেষ্টা করেন না। রোমীয়েরা বিজিতপ্রদেশ সকলে আপনাদিগের ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রচালিত করিত, ইংরাজেরা ভারতবর্ষের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা সকলের প্রণয়ন করেন; তবে সেই ব্যবস্থাগুলি তাঁহাদের স্বদেশ-প্রচলিত ব্যবস্থারই অনুরূপ হইয়া থাকে।

ফলকথা, ইংরাজের ভারত-শাসন রোমীয়দিগের প্রদেশ শাসন প্রণালীর সহিত যত মিলে, অপর কোন জাতির বৈদেশিক অধিকার শাসনের সহিত তত মিলে না। মুসলমান এবং স্পেনীয় এবং পোর্তুগীজদিগের বিদেশ শাসনের ত কথাই নাই—তাহারা অধিকৃতদেশবাসীদিগের ধর্ম্ম-প্রণালীর উচ্ছেদ চেষ্টা করিত। ওলন্দাজদিগের যবদ্বীপ শাসন এবং রুসীয়দিগের মধ্য-এসিয়া শাসন, আর ফরাসীদিগের আলজিরিয়া এবং টুনিস শাসনও ইংরাজের ভারতবর্ষ শাসন হইতে অনেকাংশে ভিন্নরূপ।

ওলন্দাজেরা যবদ্বীপের অধিবাসিগণকে আপনাদিগের সাধারণ সৈন্য-শ্রেণীসম্ভূক্ত করেন, তাঁহারা কালা ফৌজে এবং গোরা ফৌজে মিলাইয়া পল্টন বাঁধেন—উহাদিগের মধ্যে অধিক ইতরবিশেষ করেন না। ওলন্দাজেরা আদিম অধিবাসীদিগকে [illegible]

কিন্তু ওলন্দাজেরা যবদ্বীপের অনেক কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্য গবর্ণমেণ্টের এক-চেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। অর্থাৎ ভারতবর্ষে এক অহিফেণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের যে ব্যবস্থা, যবদ্বীপে কাফি, চা, চিনি, দারুচিনি প্রভৃতি অনেকগুলি পণ্য দ্রব্যে সেই ব্যবস্থা এবং তাহার অপেক্ষা কঠিনতর বেগার খাটাইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া আছে।

রুসীয়েরা মধ্য-এসিয়াতে প্রবিষ্ট হইয়া তথাকার বিবাদ বিসম্বাদ মিটাইয়া দিয়া সমস্ত দেশটিকে সর্ব্বতোভাবে উপশান্ত করিয়াছে। কিন্তু রুসীয়েরা দেশটীকে বিবিধ প্রকার করভারে আক্রান্ত করিয়াছে, স্ব-জাতীয় রাজকর্ম্মচারী এবং বণিকগণকে পালে পালে উহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়াছে, এবং স্বজাতীয় জনগণের সুবিধার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া দেশীয় ব্যক্তিব্যূহের প্রতি যৎপরোনাস্তি অনাস্থা প্রদর্শন করি-তেছে। রুসীয়েরা যেমন তুর্কিস্থানের পশ্চিম ভাগটী বহুশত বর্ষ অধি-কার করিয়াও তথাকার লোক সকলকে আপনাদিগের প্রতি ভক্তি-মান করিতে পারে নাই, নবাধিকৃত পূর্ব্বাঞ্চলেও যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ফল লাভ করিতে পারিবে, তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।

ফরাসী গবর্ণমেণ্ট আলজিরিয়া প্রভৃতি তাঁহাদের অধিকৃত প্রদেশে তত্তৎ প্রদেশের আদিম অধিবাসিগণের স্ব স্ব জাতীয় ভাব একেবারেই বিলুপ্ত করিতে চাহেন। তাঁহারা বিধান করিয়াছেন যে, প্রদেশীয় কোন ব্যক্তি যদি সর্ব্বতোভাবে ফরাসি ব্যবস্থা-শাস্ত্র গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে প্রকৃত ফরাসি হইতে অভিন্ন জ্ঞান করা যাইবে—নচেৎ প্রকৃত ফরাসির সমস্ত অধিকার তাঁহাকে দেওয়া হইবে না।

ইংরাজদিগের ঔপনিবেশিক নিয়মে শাসিত কয়েকটী স্থানে ইংরাজী ব্যবস্থার প্রসারণ চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু কোথাও কোন ভিন্নজাতীয় ব্যক্তিকে ইংরাজের প্রকৃত অধিকার প্রদত্ত হইবার কথা উঠে নাই। সিংহলদ্বীপে, ষ্ট্রেটস্ সেটল্‌মেণ্টে, মরিস্যসে এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিসে, ইংরাজ

সমধিক পরিমাণেই আপনার ব্যবস্থাশাস্ত্র প্রচালিত করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষে সে প্রণালীর অনুসরণ করেন নাই। ভারতবাসীর জাতীয় ভাব বজায় রাখিয়া চলিতেই ইংরাজ-রাজের অভিগতি আছে বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু তাহা হইলেও লর্ড ডফরিণ সাহেব সে দিন লণ্ডনের ভোজে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে—ভারতবাসীর ইংরাজ রাজের প্রতি অনুরাগটী যতটা বিচার-মূলক, ততটা ভক্তি-মূলক নহে। ভারতবাসী সাধারণতঃ অতি মৃদুস্বভাব, ভক্তি-পরায়ণ এবং রাজানুরক্ত। ভারত-বাসীর রাজবংশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, রাজ্ঞীপুত্রদিগের সমাগম সময়ে এবং মহারাজ্ঞীর জুবিলি মহোৎসবে সম্যক্ প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। অতএব কি জন্য যে, ইংরাজ রাজপুরুষগণের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে তাদৃশ ভক্তির উদ্রেক হয় না, তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক বুঝিবার প্রয়োজন। লর্ড ডফরিণ তাঁহার উল্লিখিত বক্তৃতায় কতকগুলি অতি সামান্য বাহ্য কারণের উল্লেখ করিয়াছিলেন—যথা, ভারতবাসীরা আপনাদিগের স্ত্রীপরিজনকে ইংরাজদিগের সহিত আলাপ করাইয়া দেয় না; ভারতবাসীরা ভিন্ন ধর্ম্মাব-লম্বী এবং ভিন্ন ভাষা ভাষী ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সকল কথা অতি অকিঞ্চিৎকর। ঐ সকল কারণে এতটা অনুরাগশূন্যতা জন্মিতে পারে না। মুসলমান অধিকারের সময়েও ঐ সকল কারণ বিদ্যমান ছিল, অর্থাৎ একত্র পান ভোজন এবং স্ত্রী পরিজন প্রদর্শন ছিল না—আর ভিন্ন-ভাষিতা এবং ভিন্নদেশিকতাও প্রায় এক্ষণকার ন্যায় ছিল। কিন্তু মুসল-মানের সহিত হিন্দুর যতটা মিল হইয়াছিল, ইংরাজের সহিত কি ততটা মিল হইয়াছে? আজি কালি কোন কোন বাঙ্গালী আপনাদিগের স্ত্রী পরিজনের সহিত ইংরাজদিগের দেখা সাক্ষাৎ করাইয়া থাকেন—তাহাদিগের সহিত কি ইংরাজের সহানুভূতি জন্মিয়াছে?

ঐ সকল অকিঞ্চিৎকর কারণের আরোপ করায় প্রকৃত কারণের অনুসন্ধান হয় না, এবং সেই জন্য ইংরাজ রাজত্বের অভ্যন্তরে যে মৌলিক

দোষ থাকায় প্রজারঞ্জনের ব্যাঘাত হইতেছে, তাহায় যথাযথ সংশোধন চেষ্টাও হয় না। ইংরাজ স্বদেশে সামাজিক শক্তি সামঞ্জস্য বিধানে যেরূপে অভ্যস্ত সেই অভ্যাসানুযায়ী হইয়া এদেশেও রাজ শক্তি প্রসারণের সীমা প্রজার প্রতিরোধ সাপেক্ষ এই রূপ মনে করিয়া চলেন। কিন্তু ভারতবাসীর অভ্যাস সেরূপ নয়। এখানকার প্রজা কোনরূপে রাজার প্রতিরোধ করিতে আছে মনে করে না। তাঁহার অসংযত শক্তি প্রসারণ দেখিয়া মর্ম্মাহত হয় মাত্র। ইংরাজ প্রায় শত বর্ষাবধি পৃথিবীতে অতুল্য বিক্রমশালী হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার আত্মনির্ভর এবং আত্মগৌরব অপরিসীম হইয়াছে। তিনি আর আপনার দোষ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত অথবা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। তিনি অন্যের অজ্ঞতা, অবিশুদ্ধতা, অক্ষমতা প্রভৃতি দোষের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সর্ব্বপ্রকার অকার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতবাসী আমাকে তেমন ভাল বাসে না, অতএব আমাতে কোন দোষ আছে, এরূপ ভাব ইংরাজের মনে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ভারতবাসী যে আমাকে তত ভাল বাসে না, তাহা ভারতবাসীরই দোষ—এই ভাবই ইংরাজের মনে বদ্ধমূল। যদি কোন কারণে এই ভাবের অন্যথা না হয়, তাহা হইলে ইংরাজ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আর প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজারঞ্জন চেষ্টা করিতে পারিবেন না, তিনি কেবল আপনার ক্ষমতা এবং বলবৃদ্ধি করিবার জন্যই একান্তমনা হইয়া থাকিবেন।

ইংরাজাধিকার—ইংরাজের বৈদেশিক ভাব।

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা লর্ড ওয়েলেসলী সাহেব কোন সময়ে লিখিয়াছিলেন—"আমি ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিরূঢ় হওয়া অপেক্ষা ইংলণ্ডের ফাঁসি-কাষ্ঠে উদ্বদ্ধ হওয়া শ্রেয়োজ্ঞান করি।"

অতিশয়োক্তি অলঙ্কারে অতিরঞ্জিত হইলেও উহা স্থূলতঃ ইংরাজের স্বদেশানুরাগ এবং বিদেশ বিরাগের ব্যঞ্জক। বস্তুতঃ ইংরাজ ইংলণ্ডকেই মনের সহিত ভাল বাসেন এবং পৃথিবীর অপর সকল দেশকে নিতান্ত হেয়জ্ঞান করেন।

পক্ষান্তরে দেখা যায় যে, অপর সকল জাতি অপেক্ষায় ইংরাজ উপনিবেশ সংস্থাপনে অধিকতর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আর কোন জাতি তাঁহার ন্যায় বিদেশ অধিকার করিয়া তথায় বদ্ধমূল হইতে পারেন নাই। ফ্রান্স বল, স্পেন বল, পোর্তুগাল বল, হলণ্ড বল, আর রুসিয়াই বল, কাহারই বৈদেশিক অধিকার ইংলণ্ডের ন্যায় অতি বিস্তৃত সুদৃঢ় এবং সুসমৃদ্ধ নহে।

অতএব নিপুণ দৃষ্টিতে দেখিলে ইংরাজের প্রকৃতিতে দুইটী বিভিন্নভাব দেখিতে, পাওয়া যায়—এক, তিনি বিদেশ ভাল বাসেন না—অপর তিনি বিদেশকে স্বদেশ করিয়া লইতে পারেন। এই বিরুদ্ধ ভাব দুইটীর মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে প্রতীত হয় যে, ইংরাজ বিদেশ-বিদ্বেষ্টা নহেন. তিনি বৈদেশিক-বিদ্বেষ্টা। যদি কোন বিদেশে তাঁহার সম্যক্ অধিকারের পথ থাকে, অর্থাৎ যদি সেই বিদেশে স্বজাতীয় লোক ভিন্ন অপর কাহার আধিপত্য বা আধিক্য না থাকে, যদি সেখানে তিনি আপনার আইন এবং ভাষা এবং ধর্ম্মপ্রণালী চালাইতে পারেন, যদি সেই স্থানটীকে সর্ব্বতোভাবে ইংলণ্ডের অনুরূপ করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলেই ইংরাজ সেই বিদেশে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন, নচেৎ বিদেশ প্রবাসে তাঁহার যৎপরোনাস্তি কষ্টানুভব হয়—তিনি বিদেশের রাজাসন অপেক্ষা স্বদেশের ফাঁসি কাষ্ঠও ভাল মনে করিতে পারেন।

এই জন্য ইংরাজকর্ত্তৃক যে যে দেশে উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছে, সর্ব্বত্রেই আদিম অধিবাসীদিগের ধ্বংস সাধন হইয়াছে, সর্ব্বত্রেই ইংরাজী ভাষার এবং ইংরাজী ব্যবস্থার প্রচলন হইয়াছে, এবং সর্ব্বত্রেই ইংলণ্ডের

অনুষ্ঠান সমস্ত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অপরাপর লোকেও সেই দেশে বাস করিতে গিয়া ইংরাজের সংস্রবে বিলুপ্ত-জাতীয়ভাব হইয়া গিয়াছে। ইংরাজ কখন কাহার সহিত মিশেন না—অন্যান্য লোককেই তাঁহার সহিত মিশিয়া যাইতে হয়। অন্যের সহিত ইংরাজের মিশ্রণও অধিক পরিমাণে হয় না। অপরাপর ইউরোপীয় লোকের সহিত অল্প মাত্রায় হয়, ইউরোপীয়েতর লোকের সহিত প্রায়ই হয় না।

আমেরিকা খণ্ডের ইউনাইটেড প্রদেশ গুলিই ইংরাজ কর্ত্তৃক বিশিষ্টরূপে অধ্যুষিত হয়। ঐ স্থানে অপরাপর ইউরোপীয় লোকও গিয়া বাস করিয়াছে। কিন্তু ওখানকার ভাষা ব্যবস্থা, রীতি, নীতি সমুদায়ই ইংরাজী হইয়া গিয়াছে। ওখানকার আদিম অধিবাসী ইণ্ডিয়ান জাতিও নিঃশেষিতপ্রায় হইয়াছে। স্পেনীয়েরা, পোর্ত্তুগিজেরা, ইটালীয়েরা এবং কিয়ৎপরিমাণে ফরাসিরাও অপর জাতীয়দিগের সহিত যতটা মিলিতে পারে, ইংরাজেরা, বস্তুতঃ তাঁহাদিগের ন্যায় টিউটন্ বর্ণ-সম্ভূক্ত কোন জাতিই, অন্যের সংস্রব সহিতে পারে না। দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন প্রদেশে স্পেনীয়রা এবং পর্ত্তুগীজেরা তত্তৎপ্রদেশীয় আদিম অধিবাসীদিগের সহিত এতদূর মিলিয়া গিয়াছে যে, মেক্সিকো, পেরু, বোলিভিয়া এবং ব্রেজিল প্রভৃতি দেশের বর্ত্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে গড়ে এক-তৃতীয়াংশ লোক মিশ্রজাতীয় হইয়াছে। এবং প্রায় অর্দ্ধাংশ লোক অবিমিশ্র আদিম অধিবাসীদিগের বংশোদ্ভব। ঐ মিশ্রজাতীয়দিগের মধ্যে অনেক লোক বিশেষ গুণ-শালী, ক্ষমতা-শালী এবং সমাজ মধ্যে মান্য গণ্যও হইয়াছে—এমন কি, মেক্সিকো সাম্রাজ্য সভার সভাপতি 'জুয়ারেজ' ঐ মিশ্রজাতীয় পুরুষ। উত্তর কানেডা প্রদেশ ফরাসিদিগের অধ্যুষিত। ওখানকার আদিম অধিবাসী অনেক বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে—তথাপি ওখানকার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে মিশ্রজাতীয়েরা লোকসমষ্টির দশমাংশের ন্যূন নহে—এবং লুয়ি নামক যে ব্যক্তি কানেডা প্রদেশে রাজনীতির বিশেষ আন্দোলন আরম্ভ করায়, কতকটা রক্তারক্তি কাণ্ডের পর,

ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট, অতুাদার ঔপনিবেশিক শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন, সেই 'লুয়ি' মিশ্র-জাতীয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু ইংরাজের উপনিবেশ-ক্ষেত্র সকল দেখ, সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে আদিম অধিবাসীদিগের সমূলোৎসাদন হইয়া গিয়াছে। ইউনাইটেড রাজ্যের আদিম অধিবাসীরা কোথায় ? ঐ মহাদেশ-নিবাসী বিবিধ ইণ্ডিয়ান জাতীয় লোকের মধ্যে শ্বেতাঙ্গদিগের অধিকারভুক্ত ভূমিতে এক্ষণে ৬৬ হাজার মাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহাদিগের জন্য কিঞ্চিৎ ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে—উহারা সেই ভূমি খণ্ডের বাহিরে যাইতে পারেনা, এবং প্রতি আদমসুমারিতেই তাহাদিগের সংখ্যা কমিতেছে, দেখা যায়। যে সকল ভাগে শ্বেত-পুরুষদিগের পদার্পণ হয় নাই, তথায় আনুমানিক ২॥ লক্ষ ইণ্ডিয়ান এখনও মৃগয়াদি দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছে ফলতঃ ইউনাইটেড প্রদেশের আদিম অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা ·১ মাত্র দাঁড়াইয়াছে। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে কেপকলনি প্রদেশে ওলন্দাজেরা প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করে। ঐ স্থান ইংরাজের অধিকারভুক্ত হইলে, উহার দশা এখনও অবিকল ইউনাইটেড দেশের ন্যায় হয় নাই। এখানে কাফ্রি জাতীয় লোকের সংখ্যা আজিও ইউরোপীয়দিগের তিন গুণ। কিন্তু তাহাদের কোন উন্নতি নাই, সংখ্যা বৃদ্ধিও নাই। নিউজীলণ্ড দ্বীপে মেয়োরি নামে একটী জাতি আছে। ইহারা আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদিগের ন্যায় নিতান্ত বন্যদশাপন্ন নহে; আফ্রিকার হটেণ্টটদিগের ন্যায় নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং অক্ষম নহে। মেয়োরিদিগের ভাষায় সাহিত্য গণিতাদির গ্রন্থ আছে, মেয়োরিদিগকে হৃদয়ে যথেষ্ট সাহস এবং আত্ম-গৌরব আছে। কিন্তু ইংরাজ তাহাদিগের দেশে বাস করিতে গেলেন, আর তাহারা নিঃশেষিত প্রায় হইল। এখন নিউজিলাণ্ডে মাওরির সংখ্যা শতকরা ৮টী মাত্র। ইংরাজ-ঔপনিবেশিকদিগের মধ্যে ২০০ জন মাত্র তদ্দেশবাসী মেওরি জাতীয় কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সকল পত্নীদিগের গর্ভজাত সন্তানদিগকে আপনাদিগের সমাজে গ্রহণ করেন নাই, তাহারাও

নেস্তৰি হইয়া আছে। অষ্ট্রেলিয়া খণ্ডের উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। ওখানকার আদিম অধিবাসীরা বেড়া-আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে, চতুর্দ্দিক হইতে যেমন ইংরাজের উপনিবেশ দেশের অন্তর্ভাগে প্রসারিত হইতেছে, অমনি আদিম অধিবাসীরা ফুরাইয়া যাইতেছে। একজন ইংরাজ পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"ইউরোপীয়ের ঘ্রাণমাত্র পাইলেই অপরাপর ক্ষুদ্র প্রাণ মনুষ্যেরা একেবারে শুকাইতে আরম্ভ করে"। অন্যান্য সকল ইউরোপীয়ের অপেক্ষা ইংরাজের ঘ্রাণ অধিকতর তীব্র, তাহার সন্দেহ নাই।

আর দৃষ্টান্তবাহুল্যের প্রয়োজন নাই। ইংরাজ অপর জাতীয় লোকের সহিত মিশেন না—এটী একটী সিদ্ধান্ত কথা। কোম্‌টী তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে তাঁহার স্বদেশীয় ফরাসিরাই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার মতানুগামী হইয়া 'নরদেব' পূজার প্রবৃত্ত হইবে, এবং সমস্ত নরজাতির প্রতি ভক্তি ও প্রীতি সমন্বিত হইবে। ইটালীয়েরা উহাদিগের পরে এবং স্পেনীয় ও পোর্তুগিজেরা তাহার পরে তৎপথাবলম্বী হইবে; ইংরাজেরা তাহাদিগেরও পরে নরজাতি সাধারণের প্রতি প্রেমিক হইয়া উঠিবে। কোম্‌টি যেরূপেই বুঝিয়া ঐ কথা বলুন, (তিনি প্রথম পুস্তক প্রচারে জর্ম্মণদিগকেও ইংরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী করিয়াছিলেন,) ইংরাজের নরজাতি প্রেম যে, অনেক দূরবর্ত্তী ব্যাপার, অতি স্থূল স্থূল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিই তাহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ-প্রদর্শন করিতেছে।

কিন্তু ইংরাজাধিকৃত দেশ সকলে তত্রত্য আদিম নিবাসীদিগের নিঃশেষতা এবং অপর জাতির সহিত মিশ্রণের অল্পতা দেখিয়া ইংরাজকে অধিক পরিমাণে নৃশংস মনে করায় ভ্রম হয়। বস্তুতঃ অপরাপর ইউরোপীয় জাতিদিগের সহিত তুলনায় ইংরাজকেই স্বল্প নিষ্ঠুর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্পেনীয়েরা মেক্সিকো এবং পেরুতে এবং ওয়েষ্ট ইণ্ডিস দ্বীপাবলীতে যেরূপ নৃশংস ব্যবহার করিয়াছে, পোর্ত্তুগিজেরা ব্রেজিলে এবং কিয়ৎকাল ভারতবর্ষে যেরূপ পিশাচবৎ আচরণ করিয়াছে, এবং ফরাসিরাও কানেডা এবং আলজিয়রে এবং আনামে যেরূপ খামখেয়ালি খেলিয়াছে, ইংরাজ

তাঁহার অধ্যুসিত কোন দেশেই সে পরিমাণ নৈষ্ঠুর্য্য, অত্যাচার এবং অব্যবস্থিত চিত্ততা প্রদর্শন করেন নাই—অথচ তাঁহার অধিকারেই আদিম নিবাসীর সমধিক পরিমাণে বিলোপ হয়। ইংরাজের আওতাই বড় আওতা।

এইরূপ হইবার কারণ অনুসন্ধান করিলেই ইংরাজের বৈদেশিক বিদ্বেষের বিশিষ্টতা অতি স্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইতে পারে। অপরাপর ইউরোপীয় জাতির যে বৈদেশিক বিদ্বেষ তাহারও অভ্যন্তরে যেন ঘৃণার কতকটা ন্যূনতা আছে—যেন অপর জাতির প্রতি কতকটা মনুষ্যবুদ্ধি আছে। স্পেনীয় কিম্বা ফরাসি অথবা অন্য লাটিন জাতীয় কাথলিক খৃষ্টান যেন অপর জাতীয় লোককে বলেন—"তোরা কেন আমাদের মত হইবি না, আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ কর আমাদের পরিচ্ছদ পর, আমাদের ন্যায় খাওয়া দাওয়া কর্ আমাদের মত হইবি।" ইংরাজের ভাব ওরূপ নহে। তাঁহার ভাব—"তুমি ইংরাজ নহ। তুমি আমার ধর্ম্ম, আমার আচার, আমার ব্যবহার, আমার ভাষা, আমার পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করিতে চাও কর, কিন্তু কখনই আমার সমান হইতে পারিবে না। কারণ আমিই ইংরাজ, তুমি ইংরাজ নহ।"

আমরা হিন্দুজাতীয়। আমরাও ঐ ভাব বুঝিতে পারি; আমরাও জানি যে, এক জাতীয় লোক কিছুতেই অপর জাতীয় হইতে পারে না—ভ্রষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিস্থ থাকিয়া জাত্যন্তর হইতে পারে না। আমরা জানি যে, মনুষ্যের দোষ গুণ অনেকটাই তাহার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের হইতে অর্জ্জিত। সুতরাং আমরা যে বংশজাত অপর বংশীয় কোন ব্যক্তি কখনই ঠিক তেমন হইতে পারেন না। কিন্তু হিন্দুর এই ভাবে এবং ইংরাজের উল্লিখিতভাবে পার্থক্য আছে। হিন্দুর আত্মগৌরব দৈবায়ত্ত বিষয় লইয়া। ইংরাজের আত্মগৌরব প্রধানতঃ নিজায়ত্ত বিষয় লইয়া। হিন্দুর আত্মগৌরবে অন্যের প্রতি ঘৃণা জন্মিতে পারে না। ইংরাজের আত্মগৌরবে অন্যের প্রতি অবজ্ঞা জন্মাইয়া দেয়। ভিন্ন জাতির প্রতি

ইংরাজের বিদ্বেষ কিরূপ প্রখর তাহা ইংরাজ সন্তান মার্কিনদিগের মধ্যে প্রচলিত একটী চলিত কথার ভাব বুঝিলেই সুস্পষ্ট হয়। মার্কিনেরা বলে যে, তাহাদের দেশে যত আইরিশ আছে, তাহারা প্রত্যেকে যদি এক একটী নিগ্রোকে খুন করিয়া ফাঁসী যায়, তাহা হইলেই মার্কিন দেশের আপদ বালাই মিটে। আমাদিগের মধ্যে বর্ণভেদ প্রথার প্রচলন থাকায়, আমরা জানি যে, লোকে এক ধর্ম্মাবলম্বী, একদেশবাসী এবং এক ভাষা ভাষী হইয়াও পরস্পর বৈবাহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হইয়া, পানভোজনাদিতে একত্রিত না হইয়া, এমন কি অন্যোন্যের শরীরস্পর্শে অনুরাগী না হইয়া এক সমাজ সম্বদ্ধ, এক মতানুগামী এবং এক শাসনের বশীভূত থাকিতে পারে। সুতরাং আমাদিগের হৃদয়ে ভিন্ন জাতীয় লোকের প্রতি তেমন তীব্র বিদ্বেষভাব জন্মিতে পারে না। অপর সকলের অপেক্ষা বৈদেশিক বিদ্বেষ্টা হইয়াও ইংরাজ বর্ণভেদ মানেন না—সুতরাং তাঁহাকে সামাজিক পার্থক্যগুলি অতি যত্নপূর্ব্বকই রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। এই নিমিত্ত তিনি আপনার জাতীয় গৌরব বজায় রাখিবার জন্য অধিকতর ব্যস্ত থাকেন। এই জন্য তাঁহার পার্থক্য বুদ্ধিটী নিরন্তর ঘর্ষণে অধিকতর তীক্ষ্ণ-ধার হইয়া থাকে।

উপনিবেশ স্থাপনের কথায় হিন্দুজাতির উল্লেখ করিবার একমাত্র প্রয়োজন ইংরাজের প্রকৃতিতে এবং হিন্দুর প্রকৃতিতে বৈদেশিক বিদ্বেষ-সম্বন্ধে যে প্রকার বিভেদ আছে, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলা। নচেৎ আমরা কোথাও উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে যাই না—এবং কোন বিদেশীয়ের উপর অধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতি কোমলই হউক বা কঠোরই হউক, কোন প্রকার ব্যবহারে নিযুক্ত হই না। তবে আমাদিগের জাতীয় প্রকৃতি যে ভিন্ন জাতীয়ের সহিত মিশ্রণ নিরোধ করে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ ভারতবর্ষ হইতে বিদেশপ্রেরিত 'কুলি'দিগের ব্যবহারের উল্লেখ করা যায়। ভারতবর্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে অনেকানেক শ্রমজীবি লোক ইংরাজ এবং অপরাপর জাতির অধিকৃত দেশে নীত হয়। কিন্তু তাহারা শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে চায়—বিদেশে থাকিয়া যাইতে ইচ্ছা করে না।

অতএব দেখা গেল যে, হিন্দু বৈদেশিকের সহিত মিশ্রণে অনিচ্ছু এবং ইংরাজও বৈদেশিক বিদ্বেষ্টা। ভারতবর্ষে এমন দুইটী জাতির একত্র সমাবেশ হওয়ায় ফল কিরূপ হইয়াছে, তাহা যত্নপূর্ব্বক বুঝিতে হয়।

ভারতবর্ষে ভারত-সন্তানের আধিপত্য নাই—কিন্তু আধিক্য আছে। এখানকার লোকসংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ২২৯। সুতরাং এ দেশে লোকের ভিড় হইয়া গিয়াছে। এখানে ইংরাজ আপনার উপনিবেশ স্থাপন করিতে পারেন না। ভারতবর্ষে বহুকাল হইতে প্রচলিত স্বতন্ত্র ধর্ম্ম, ভাষা এবং ব্যবস্থা বিদ্যমান আছে, এবং ভারত-সন্তান সেই ধর্ম্ম, ভাষা এবং ব্যবস্থার প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান—সেই সকলের প্রভাবেই তাঁহার মন এবং হৃদয় গঠিত। সুতরাং এখানে ইংরাজের ধর্ম্মাদিও প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। ভারত-সন্তানদিগের আচার ব্যবহার এবং রীতি নীতিরও অনেক ভাগ ইংরাজদিগের আচার ব্যবহারাদি হইতে ভিন্নরূপ। সুতরাং ব্যক্তি-বিশেষের মনে যাহাই হউক, সাধারণতঃ ইংরাজের মনে ভারতবর্ষের প্রতি প্রকৃত মমতা এবং ভারতবাসীর প্রতি সহানুভূতি একান্ত অসাধ্য। ইংরাজ ভারতবর্ষের সিংহাসন অপেক্ষাও স্বদেশের ফাঁসিকাঠ ভালবাসিবেন।

কিন্তু তেমন মমতা এবং সহানুভূতি না থাকিলেও ইংরাজ ভারতবর্ষের রাজা হইয়াছেন। ভারতবর্ষ তাঁহার অধিকৃত হওয়ায় ইংরাজের ধন, গৌরব এবং প্রতিপত্তির বৃদ্ধি হইয়াছে। ভারতবর্ষ তাঁহার স্বদেশ হইয়া যাইতে পারে না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ তাঁহার অধিকৃত দেশ থাকিয়া তাঁহার লাভবৃদ্ধি, যশোবৃদ্ধি এবং বলবৃদ্ধি করিতে পারে। ভারতবর্ষের জন্য তিনি কোন ক্ষতি স্বীকার করিতেই পারেন না—প্রত্যুত ভারতবর্ষের ধনে লাভ-ভাগী হইতে তাঁহার পূর্ণ দাওয়া আছে। কিন্তু ইংরাজ সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস হইতে জানেন যে, ন্যায়পথে এবং ধর্ম্মপথে না চলিলে কখন কোন রাজার অধিকার চিরস্থায়ী হয় না—প্রজা বিরূপ হইয়া উঠে। এই জন্য তিনি যে ভারতবর্ষে ন্যায়পথে এবং ধর্ম্ম পথেই চলিতেছেন, সকলকে এইরূপ বুঝাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া আছেন। তিনি স্পষ্ট কথাতেই বার বার

বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীর উন্নতিসাধন করাই আমার রাজ্যপালনের এক মাত্র উদ্দেশ্য। এ প্রকার অত্যুচ্চ উদার ভাব ব্যক্ত করিয়া বলা যে, ধর্ম্মরক্ষার অনুকূল তাহা নিঃসন্দেহ। ইংরাজ যত দিন ঐ কথা মুখেও বলিতে পারিবেন, তত দিন তাঁহার প্রজাপালন নিন্দনীয় হইতে পারিবে না, ভারতবাসীর সহিত তাঁহার সহানুভূতি শূন্যতার সমস্ত অশুভ ফল ফলিবেনা, এবং অন্তর্বাহ্য উভয়তঃ না হউক, বাহ্যতঃ ন্যায়পরতা রক্ষিত হইতে থাকিবে।

অল্পদিন গত হইল একজন জর্ম্মণদেশীয় পণ্ডিত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া এখানকার ইংরাজ শাসনের সমূহ গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন যে, ইংরাজের ভারত-শাসনে বৈদেশিক ভাব নাই। সেই গুণ কীর্ত্তনের একটী গূঢ় হেতু আছে। আজি কালি জর্ম্মণেরা ইউরোপ খণ্ডের বহির্ভাগে আপনা-দের অধিকার বৃদ্ধি এবং উপনিবেশ সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা উদ্ধত এবং গর্ব্বিত আচরণের দোষে কোথাও পূর্ণমনোরথ হইতে পারিতেছেন না। ভারতবর্ষে ইংরাজের ব্যবহার তাঁহার স্বদেশীয়দিগের অনুকরণীয় ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ঐ জর্ম্মণ পণ্ডিত এখানকার শাসনকার্য্যে ইংরাজ স্বদেশের এবং স্বজতীয়ের লাভের প্রতি দৃষ্টি করেন না, এই কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ জর্ম্মণ গবর্ণমেণ্ট যে ভাবে উপনিবেশ স্থাপন করিবার কল্পনা করিতেছেন তাহার সহিত তুলনায় ইংরাজের ব্যবহারে ঔদ্ধত্য অল্প এবং ন্যায়ানুগামিতা অধিক।

ইংরাজ বণিকবেশে রাজ্যগ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বণিক প্রকৃতি-সুলভ নম্রতা এবং সতর্কতাগুণে সকল বিষয়েই একান্ত ন্যায়পর হইয়া চলিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং অনেক স্থলেই সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষাও করিয়াছেন। বৈদেশিকবিদ্বেষ যদিওইংরাজের স্বভাবগত তথাপি তাঁহার বুদ্ধি, বিদ্যা এবং আত্মসংযম এত অধিক যে, ঐ স্বভাবের সমগ্র অশুভফল কোথাও ফলিতে পায় নাই। নানা কারণে ভারতবর্ষেই ঐ বৈদেশিকতার অশুভময় ফল স্বল্প পরিমাণে ফলিয়াছে। মানুষ জ্ঞানের

দ্বারা সংস্কার এবং স্বভাবের দোষও অনেক কমাইতে পারেন। ইংরাজ ভারতবর্ষে তাহা কমাইয়া চলিয়াছেন। তথাপি তাঁহার রাজকার্য্যে যে বৈদেশিক ভাবের দোষ স্পর্শ হয় নাই, একথা বলা যায় না। কয়েকটী স্থূল স্থূল বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) ভারতবর্ষের শাসন ভারতবাসীর উন্নতি সাধনার্থ হইবে—এই মূলসূত্রের এক্ষণে একটু পরিবর্ত্ত হইয়াছে। এখন শাসনসূত্র হইয়াছে—ইংলণ্ডের শুভোৎপাদনে কোন ব্যাঘাত না করিয়া যত দূর ভারতবাসীর শুভ হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা যাইবে। অবশ্য এই কথার সহিত বলা হয় যে যাহাতে ইংলণ্ডের ভাল, ভারতেরও তাহাতেই ভাল। কিন্তু যদি সত্য সত্য সকল বিষয়েই তাহা হইত, তবে শাসনসূত্রটীর পরিবর্ত্তের প্রয়োজন হইত না।

(২) আইনের চক্ষে সকল প্রজাই সমান। এই কথাটীও অক্ষুণ্ণ নাই। পুনঃ পুনঃ চেষ্টা সত্বেও শ্বেতকায়দিগের পক্ষে যে আইন ও আদালত কিয়ৎপরিমাণে ভিন্ন রহিয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

(৩) প্রজাদিগের ব্যবহার-শাস্ত্র বজায় থাকিবে। অধিকাংশই বজায় আছে, সত্য। কিন্তু ঐ শাস্ত্রের যেখানে যেখানে ফাঁক পাওয়া যাইতেছে সর্ব্বস্থলেই অসঙ্কুচিতভাবে ইংরাজী ব্যবস্থা-সূত্রের প্রবেশ হইতেছে।

(৪) বিচার কার্য্য—আইন অনুসারে হইবে। কিন্তু বিচারেরপ্রণালী ইংলণ্ডের অনুরূপ অতি জটিল হইতেছে। আর এদেশে অতি কঠিন দণ্ড-দানেই ইংরাজ বিচারকদিগের প্রবৃত্তি বাড়িতেছে।

(৫) প্রজার স্থানে করাদান সম্পূর্ণরূপে নিয়ম নিবদ্ধ। আদান প্রণালীতে যথেচ্ছাচার নাই, কিন্তু কর-নিয়োগে যাহাতে স্বজাতীয়ের উপর উহার ভার অধিক না পড়ে, তজ্জন্য ইংরাজ-রাজকে যেন সতর্ক হইতে হইতেছে।

(৬) শুল্ক বা বণিক্‌কর আদায় সম্বন্ধে বৈদেশিক ভাব এই যে, যাহাতে ইংরাজী শিল্পজাত ভারতে বিক্রীত হয় তদনুকূল ব্যবস্থা প্রণয়ন হওয়াতে দেশীয় শিল্পের বিলোপসাধন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে।

(৭) স্বায়ত্ব শাসন প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু শাসনের ক্ষমতা প্রায় সমুদায়ই ইংরাজ কর্ম্মচারীর হস্তগত।

(৮) সাধারণ হিতকর অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু সকলই ইংরাজী ধরণের, কিছুই দেশীয় ধরণের হয় না।

(৯) ভারতবাসীর ধর্ম্মাকীর্ত্তিতে হস্তার্পণ হয় নাই। কিন্তু রক্ষণ অভাবে সমুদায় বিধ্বংসে সমর্পিত হইয়াছে।

(১০) সাধারণ শিক্ষার ভার ইংরাজ-রাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে নিতান্ত হীনাবস্থ রাখিতেছেন।

এইরূপে যে বিষয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাইবে সর্ব্বত্রেই কতকটা ন্যায়ানুগামিতা সত্ত্বেও প্রজার প্রতি সহানুভূতি না থাকিবার অশুভ লক্ষণ একটী না একটী দেখা যাইবে। যাহা কিছুর সংস্কার, প্রতীকার বা সৎকার করিতে হইবে, ইংরাজ তাহার একমাত্র উপায় দেখিতে পান, তাঁহার স্বজাতীয় লোকের নিয়োগ অথবা তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি। বস্তুতঃ ইংরাজের বৈদেশিক ভাব হইতেই এরূপ হইতেছে—এবং সে ভাব তিনি অধিকতর সূক্ষ্মদর্শনদ্বারা স্বয়ং সঙ্কুচিত করিতে না পারিলে তাঁহার বলবৃদ্ধির সহিত নিয়ত বর্দ্ধনশীল হইয়া চলিবারই সম্ভাবনা।

পঞ্চম অধ্যায়।

ভবিষ্যবিচার—সাধারণ কথা।

মানসদৃষ্টি কার্য্যকারণ সম্বন্ধের প্রতি নিয়ত এবং স্থিরতর রূপে সম্বদ্ধ রাখিলে অনুরাগ বিরাগ, আসক্তি বিদ্বেষ, প্রসাদ এবং গ্লানি প্রভৃতিভাবের ন্যূনতা হইয়া প্রকৃত তথ্যোপলব্ধির পথ পরিষ্কৃত থাকে। কিন্তু সামাজিক ঘটনাবলীর বিচারে মনের ঐ প্রকার ঔদাসীন্য রক্ষা করিয়া চলা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। ঐ সকল ঘটনার সহিত আপনাদের সুখ দুঃখের এত ঘনিষ্ঠ সংস্রব, উহারা বাল্য-সংস্কার রূপে মনের এমন সারভূত হইয়া থাকে, এবং উহাদিগের সহিত ঔচিত্যানৌচিত্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, এবং যোগ্যাযোগ্য প্রভৃতি বোধসকল এমন সূক্ষ্মরূপে অনুস্যূত হইয়া যায় যে, বোধ হয়, কোন ব্যক্তিই একান্ত পক্ষপাত পরিশূন্য হইয়া সমাজতত্ত্বের বিচারে কৃতকার্য্য হইতে পারেন না।

আমি ভারতবর্ষের ইংরাজাধিকার সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিয়াছি, তাহার কোন কথাই আমার অনুরাগ অথবা বিরাগমূলক না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করিয়াছি। কার্য্য কারণ সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ইংরাজের বণিক ভাবে রাজ্য লাভ, তাঁহার জাতীয় প্রকৃতির অনুযায়ী রাজভাব, এবং তাঁহার জ্ঞান ও পরিণাম-দর্শন-মূলক ন্যায়পরতার অভ্যন্তরে বৈদেশিক ভাব প্রদর্শন করিয়াছি, এবং তৎসহ এ কথাও বলিয়াছি যে, এদেশে ইংরাজের বদ্ধমূলতার সহিত তাঁহার বলবৃদ্ধির অভিলাষ বর্দ্ধিত হইবার এবং প্রজাপুঞ্জের সহিত সমানুভূতির ন্যূনতা ঘটিবার সম্ভাবনা।

ঐ কথা বলাতে ভবিষ্যবিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাতের সূচনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক, ভবিষ্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত না করিয়া মানুষ আপনার গন্তব্য পথে পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারে না। লোকে ভূত, ভবিষ্য, বর্ত্তমান বলে। ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্য বলে না। অর্থাৎ কালের পৌর্ব্ব-পরত্বের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অতীতের পর ভাবী, এবং সর্ব্বশেষে বর্ত্তমান কালের উল্লেখ করে। এরূপ করিবার অপর কারণ যাহাই হউক, একটী কারণ এই হইতে পারে যে, ভূত বিষয় গুলির বিচার করিয়াই ভাবী ব্যাপারের অনুভব হয়, এবং সেই অনুভবের উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য অবধারণ করা যায়।

যিনি সমাজ তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনিই অল্প বা অধিক পরিমাণে নরজাতির ভাবী অবস্থা কিরূপ হইতে পারে, তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ঐ সকল অনুমানে কতক বিজ্ঞানের, কতক ধর্ম্মশাস্ত্রের, আর কতক ইতিবৃত্তের এবং মানব-প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণের সহায়তা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু যেরূপেই ও বিষয়ের নির্ণয় চেষ্টা হউক, বিষয়টী কল্পনার লীলাভূমি। এখানে আশা, ভীতি, ইচ্ছা, ঘৃণা প্রভৃতি সহচরদিগের সহিত তিনি যেন নিয়তই নৃত্য শীলা। এখানে মনের একান্ত ঔদাসীন্য রক্ষা করিয়া বিচার করা, অতীতের মধ্যে কার্য্যকারণ সূত্র ধরিয়া চলা অপেক্ষাও বহুপরিমাণে কঠিনতর। যাহা হউক, মনুষ্য সমাজ সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যে সকল মতের প্রচলন হইয়া আছে, তাহার কয়েকটীর উল্লেখ করা আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক বিচার দ্বারা মনুষ্যের বাস-ভূমি পৃথিবীর ভবিষ্যদশা কিরূপ হইবে, তাহার অবধারণ চেষ্টা হইয়াছে। অনেকে নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, পৃথিবী ক্রমশঃ তাপশূন্য হইয়া শীতল হইতে থাকিলে কিছু কাল ইহার সর্ব্বত্র শীতপ্রধান হইবে, কাজেই ইহার সকল ভাগই শীতপ্রধান দেশবাসীদিগের উপযোগী হইয়া উঠিবে—কোন ভাগ গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীদিগের বাসোপযুক্ত থাকিবে না। অনন্তর পৃথিবীর শৈত্য

আরও বৃদ্ধি পাইবে। ইহার জল এবং বায়ুও তারল্য ভাব পরিহার করিবে, সুতরাং জল এবং বায়ুর বিনাভাবে যে সকল প্রাণি বাঁচে না, তেমন প্রাণি একটীও বাঁচিবে না। অতএব সকল মানুষই মরিয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, চন্দ্রমণ্ডলের এক্ষণে যে অবস্থা হইয়াছে, পৃথিবীরও ভাবী দশা তাহাই হইবে।

অতদূরতম কালে দৃষ্টি প্রসারিত না করিয়াও, বিজ্ঞানের নিয়ত উন্নতি দর্শনে কদাচিৎ এরূপও মনে করা হয় যে, দেশভেদে যে উষ্ণানুষ্ণতার প্রভেদ আছে, নরজাতি তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে। এবং তাহা হইলেই পৃথিবীর সকল ভাগে বাস করিতে পারিবে। শুদ্ধ তাহাই পারিবে এমত নহে। বিভিন্ন স্থানের জল বায়ুর বিভিন্নতা বশতঃ এখন যেরূপ মনুষ্যদিগের মধ্যে বর্ণভেদ, আকৃতি ভেদ, এবং প্রকৃতি ভেদ আছে, সেই সকল বিভেদও আর থাকিবে না। সকল মনুষ্যই এক-জাতিত্ব প্রাপ্ত হইবে--এবং অবশ্যই এক-ভাষা-ভাষী এবং এক-শাসন-প্রণালীর বশীভূত হইবে।

উল্লিখিত বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে মনুষ্যের অমরত্ব লাভ এবং জীবের স্বতঃ উৎপত্তি সাধনও অসম্ভবপর ব্যাপার নহে। স্থূল কথায়, ইহাঁরা মনে করেন যে, কালে পৃথিবীই স্বর্গ হইয়া উঠিবে। তাঁহারা বলেন পৃথিবীর ভাবী অবস্থাই স্বর্গের প্রতিরূপ স্বরূপ।

ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর নির্ভর প্রদান করিয়া যাঁহারা নরজাতির ভাবী অবস্থার অবধারণা করেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা একেশ্বরবাদী তাঁহারা বলেন যে, সকল জাতীয় মনুষ্যই কোন সময়ে তাঁহাদেরই ধর্ম্মাবলম্বী হইবে। খৃষ্টানদিগের মতে সকলেই খৃষ্টান হইবে, মুসলমানদিগের মতে সকলেই মুসলমান হইবে; যাহারা না হইবে তাহারা মারা পড়িবে। তাহা হইলেই পৃথিবীর সমস্ত পাপ তাপ দূর হইয়া যাইবে—এবং পৃথিবী স্বর্গ না হউক, স্বর্গতুল্য হইয়া উঠিবে। বৌদ্ধ এবং হিন্দু মত ওরূপ নয়। নিরীশ্বরবাদী এবং সর্ব্বেশ্বরবাদী উভয়েরই মতে পরিবর্ত্ত

মাত্রই অস্থায়ী। যাহা পূর্ব্বে ছিল না, পরে হইয়াছে, তাহাও চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে না। সুতরাং কালের অনন্ত ভাব ধরিয়া বিচার করিলে সকল ব্যাপারেই পূর্ব্বাবস্থা চক্রনেমিক্রমে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। ইহাঁদিগের শাস্ত্রে যদিও ব্যক্তিগত ক্রমোৎকর্ষের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস খ্যাপিত হয়, তথাপি সমাজোন্নতির অশেষতা উপলব্ধ হয় না। ইহাঁদের মতে স্বর্গও অনন্তকাল স্থায়ী বলিয়া স্বীকৃত নহে।

বৈজ্ঞানিক মত এবং ধর্ম্মমত উভয়কেই দৃষ্টিপথে রাখিয়া এবং ইতিবৃত্ত শাস্ত্রের বিশেষ সহায়তা গ্রহণ করিয়া অশেষবিৎ অগষ্ট কোম্‌টি নরজাতির ভবিষ্যদশার বিচার পূর্ব্বক একটী নব্য মতের কল্পনা করিয়াছেন। কোমটির গ্রন্থসমূহে সমাজতত্ত্বের নিগূঢ় বিচার এবং ভবিষ্য ঘটনার বহুল কথা দৃঢ়রূপে ব্যক্ত আছে। তাঁহাকে ইউরোপীয় সমাজতত্ত্বশাস্ত্রের সংস্থাপয়িতা বলিয়াই ধরা যায়। তাঁহার মতের সহিত প্রচলিত হিন্দু এবং বৌদ্ধ-প্রণালীর কতকটা মিল আছে, এবং ইংরাজী শিক্ষিত সুবোধ, এবং সুশীল কতিপয় দেশীয় লোক এক্ষণে কোম্‌টির মতবাদ গ্রহণ পূর্ব্বক উহার প্রচারের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সকল কারণে কোম্‌টির স্থূল স্থূল কথা গুলির সবিশেষ উল্লেখ করা আবশ্যক। কোম্‌টি বলেন, (১) পৃথিবীতে ধর্ম্মভেদ রহিত হইবে (২) বর্ণভেদ রহিত হইবে (৩) যুদ্ধবিগ্রহ উঠিয়া যাইবে (৪) বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা বন্ধ হইবে (৫) শাসন এবং শিক্ষাকার্য্য পবিত্রাত্মা পুরোহিতদিগের মতানুসারে চলিবে (৬) জনগণ সর্ব্বত্রে যাজক, শাস্তা এবং শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকিবে এবং (৭) অভ্যাসগুণে পরার্থপরতা মানবহৃদয়ে স্বার্থপরতার আসন পরিগ্রহ করিবে। কথা গুলি বিচার করিয়া বুঝিতে হয়।

(১) ধর্ম্মভেদ রহিত হইবার সম্বন্ধে কোম্‌টির তাৎপর্য্য এই যে, একজন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোন প্রকারেই বিচারদ্বারা প্রমাণিত হয় না। প্রত্যুত উহা বিচারের বিষয়ই নহে। আর মনুষ্যের ধর্ম্ম-

বুদ্ধির মূল এবং চরম উভয়ই মনুষ্য-সমাজের হিতসাধন। অতএব যখন বিজ্ঞানালোচনার বলে, উপধর্ম্মের প্রয়োজন এবং তাহাতে বিশ্বাস তিরোহিত হইবে, তখন সমস্ত কাল্পনিক ধর্ম্ম্য মতের পরিহার পূর্ব্বক মনুষ্য নিজ সমাজেরই পূজা করিবে—সেই আবহমান কাল ব্যাপক মানব সমাজের প্রতিরূপ স্বরূপ শিশুক্রোড়স্থা একটী নারী-মূর্ত্তি—যথা গণেশ-জননী—অথবা যিশু-মেরী—অথবা হোসেন-ফতেমা। এই নরদেবপূজাই পৃথিবীর ভাবী ধর্ম্ম।

কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বেশ্বর মতবাদে ঈশ্বর প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণের দ্বারাই সুসিদ্ধ; যখন দেখা যাইতেছে যে, কারণের অনুসন্ধানে মনুষ্যমন চির জাগরূক; যখন দেখা যাইতেছে যে, মনুষ্য সমাজের প্রতি সহানুভূতি মূলক যে ধর্ম্ম তাহারও অতিব্যাপক পদার্থ যথা বিশ্বজ্ঞান এবং বিশ্বপ্রীতি এবং বিশ্ব-সৌন্দর্য্য প্রভৃতি অত্যুদার ভাব সকল মনুষ্যহৃদয়ে অধিষ্ঠিত; এবং যখন দেখা যাইতেছে যে, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বব্যাপকত্ব, শর্ব্বশক্তিমত্তা, অপাপবিদ্ধত্ব প্রভৃতি গুণ-লক্ষণে লক্ষিত মনুষ্যের উপাস্য বস্তু সর্ব্বময়রূপেই বিদ্যমান, তখন পরস্পর-হিংসা-বিদ্বেষ-বিদূষিতাঙ্গ, আংশিক এবং কাল্পনিক একটী নরদেব পূজায় মানব বুদ্ধি এবং মানবহৃদয়ের তৃপ্তি হইবার সম্ভাবনা কোথা? আমার বোধ হয় যে, সর্ব্বেশ্বরবাদই পৃথিবীতে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইবে। কোম্‌টির গুরু পর্য্যায়ী এবং শিষ্য পর্য্যায়ী কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরও ঐ ভাব।

(২) বর্ণভেদ রহিত হইবার সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বিবেচ্য। তাহার প্রথম কথা এই যে, বর্ত্তমান বর্ণভেদের হেতু কি শুদ্ধ বিভিন্ন দেশের জল বায়ুর ভেদ, না মৌলিক উৎপত্তিরই ভেদ। কোন কোন বৈজ্ঞানিকের মতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল বায়ুর বিভেদই বর্ণভেদের একমাত্র কারণ। কোম্‌টির মতও তাহাই। কিন্তু যদি তাহাই হয়, তথাপি বিভিন্ন দেশের জল বায়ুর প্রকৃতির ভেদ রহিত করাই কি

বিজ্ঞানের সাধ্যায়ত্ত? ইউরোপীয়দিগের বংশজাত মার্কিনেরা আপনাপন পূর্ব্ব-পুরুষদিগের অপেক্ষা দীর্ঘচ্ছন্দ এবং রক্তবর্ণ হইয়াছে—অর্থাৎ আকারে এবং বর্ণে আমেরিকার পূর্ব্ব অধিবাসীদিগের সমধিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। অতএব এ পর্য্যন্ত যতদূর দেখাগিয়াছে তাহাতে বোধ হয় না যে, জল বায়ুর প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করিবার শক্তি বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন। তবে এ কথা বলা যায় যে, বিভিন্ন বর্ণের লোক সকল পুরুষানুক্রমে একদেশবাসী হইয়া থাকিতে থাকিতে উহাদিগের মধ্যে মিশ্রণ হইয়া যাইবে এবং সেই মিশ্রণের ফলে কোন কালে আকার এবং বর্ণসাম্য জন্মিতে পারিবে। পক্ষান্তরে ইহাও দেখিতে হয় যে, যদিও "মিশ্র নর নারীর সংযোগে বহু পুরুষ ব্যাপিয়া বংশের রক্ষা হয় না", এ কথা সত্য না হয়, তথাপি অনেক জাতীয় লোকেরই দৃঢ় সংস্কার মিশ্রণের বিরুদ্ধ। সেই সংস্কারের বল কোথায় যাইবে? উহা অবশ্যই কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণ নিবারণ করিবে। সুতরাং পৃথিবীতে বর্ণভেদ রহিত হইয়া যাইবে, এ কথা যতই দূরবর্ত্তী কালকে লক্ষ্য করিয়া বলা হউক, উহা কোন নির্দ্দিষ্ট কালকেই লক্ষ্য করিতে পারে না। আর মিশ্রণ-প্রবণতা যতই বলবতী হউক, যে যে কারণে পূর্ব্বে বর্ণভেদ জন্মিয়াছে, সে সকল কারণের মধ্যে অতি প্রবল যে পরিবৃতির ভেদে আকারভেদ এবং যোগ্যতার অনুসারে বংশের রক্ষা, তাহা ত কখনই সম্পূর্ণরূপে যাইবে না।

(৩) যুদ্ধবিগ্রহাদি উঠিয়া যাইবার সম্বন্ধে বিবেচ্য এই যে, পৃথিবী এবং তজ্জাত ভোগ্যবস্তুর সসীমতাই মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বিবাদ বিসম্বাদ, মোকদ্দমা, মামলা যুদ্ধবিগ্রহাদির মূলকারণ। যদি ভোগ্য বস্তুর পরিমাণ এবং সংখ্যা অপরিসীম হইত, তবে মানুষে মানুষে বিবাদের কোন চিরস্থায়ী হেতু থাকিত না। তুমিও যাহা চাও আমিও তাহাই চাই, আর সে বস্তু অনেক নাই—এই জন্যই তোমাতে আমাতে বিবাদ হয়। বিভিন্ন জাতির বা বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে সংগ্রাম হয় তাহারও

মূল কারণ ঐরূপ। তোমায় আমায় বিবাদ না হয় এরূপ করিতে হইলে, হয় তুমি যাহা চাও তাহা আমি না চাই, অথবা উভয়ে যাহা চাই সেই বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া উঠে। মনে হইতে পারে যে, প্রথমটী পরার্থপরতা বুদ্ধির প্রাবল্যে সাধিত হইবে, দ্বিতীটীও বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়ার প্রভাবে সম্পাদিত হইবে। কিন্তু পরার্থপরতাও অসীম হইতে পারে না, আর বিজ্ঞান যতই বিকলন শক্তির আস্ফালন করুন, এ পর্য্যন্ত একটীও প্রকৃত নূতন দ্রব্যের সঙ্কলন করিতে পারেন নাই। সুতরাং যেমন ব্যক্তিগত বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসা রাজব্যবস্থার বলে সাধিত হইয়াছে, জাতিগত বিবাদের মীমাংসাও, যদি কখন বিনা যুদ্ধে সিদ্ধ হয়, তাহা সেইরূপেই হইতে পারিবে। বিভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে অন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত অনেক দিন হইতে হইয়া আছে। গ্রীকদিগের মধ্যে আম্‌ফিক্‌টিয়োনিক্ সভা ছিল, ইউরোপ খণ্ডেও শক্তি-সামঞ্জস্যের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পরস্পর মিলন হইয়া থাকে, আর পোপের কর্ত্তৃত্বেও কখন কখন বিগ্রহাদি মিটিয়া যায়। যদিও ঐ সকল উপায়ে একাল পর্য্যন্ত যুদ্ধকাণ্ডের বিশেষ হ্রাস বা নিবৃত্তি হয় নাই, তথাপি যখন বীজ আছে, তখন কালে ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্নজাতীয় লোকদিগের মধ্যে সকলের মাননীয় এমন একটী সভার সংস্থাপন হইতে পারে, যে সভা বিভিন্ন জাতির বিবাদের হেতু জানিয়া বিনা যুদ্ধে বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিতে পারিবেন। কিন্তু যুদ্ধের মূল কারণ কিছুতেই যাইবার নহে। সুতরাং তাহা একেবারে মিটাইবার কোন ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

(৪) বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা রহিত হইবার সম্বন্ধে বলা যায় যে, এ পর্য্যন্ত ওরূপ চেষ্টার কিছুমাত্র ন্যূনতা লক্ষিত হইতেছে না। তবে এখন সাম্রাজ্য স্থাপনের ভাব একটী বিশেষ পথকেই লক্ষ্য করিতেছে। যে সকল লোক মূলতঃ একজাতীয় তাহাদিগকেই মিলাইয়া এক

একটী সাম্রাজ্য ঘটাইবার জন্য যত্ন হইতেছে। প্রুসিয়া বলেন জর্ম্মণ জাতীয় সকলেই আমার সহিত মিলুক, রুসিয়া বলেন স্লাবোনিক জাতীয় যাবতীয় লোক আমার অধীন হউক, ফ্রান্স লাটিন জাতীয় সকলকে আপনার নেতৃত্ব স্বীকার করাইতে সমুৎসুক, আর ইংরাজ-রাজনৈতিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ সমস্ত আংগ্লোসাকসন জাতিকে ইংলণ্ডের সহিত মিলাইয়া লইবার জন্য যত্নবান। এরূপ সাম্রাজ্য সংঘটিত হইবার অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয় শক্তিই বিদ্যমান আছে। এক এক জাতি এক একটী সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইলে সাম্রাজ্যগুলি অধিকতর দৃঢ় সম্বদ্ধ হয় অতএব তাদৃশ সাম্রাজ্য সংঘটনে লোকের প্রবণতা থাকিতে পারে। কিন্তু বাণিজ্য বিস্তার এবং গমন সৌকর্য্য বৃদ্ধি পাইয়া এক জাতীয় মনুষ্যকে বিভিন্ন দেশবাসী করিয়া তুলিতেছে। মনুষ্যের পরস্পর সংস্রব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আরও বৃদ্ধি পাইবে। তদ্ভিন্ন, একজাতিত্বে যেমন সহানুভূতির বৃদ্ধি, তেমনি দেশভেদে স্বার্থের কতকটা ভেদনিবন্ধন সহানুভূতির হ্রাস হয়। তজ্জন্য জাতিত্বকে মূল করিয়া সাম্রাজ্য সংঘটনের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। ইটালী লাটিন জাতির আবাসভূমি। উহা ফ্রান্সের কৃপায় অষ্ট্রীয়ার কবল হইতে মুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইটালী এখন ফ্রান্সের চিরশত্রু জর্ম্মণির সহিত একমত হইয়া চলিতেছে। বাল্‌কান দেশগুলিতে স্লাভ্ জাতীয় লোকেরাই অধিক পরিমাণে বাস করে। ঐ প্রদেশগুলিতে তুরস্কের যে আধিপত্য ছিল তাহা রুসিয়ার প্রতাপেই খর্ব্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু বালকান প্রদেশীয় অধিকাংশ লোক রুসিয়ার প্রতি নিতান্ত সন্দিহানমনা হইয়াই চলে। ইংলণ্ড আপনার উপনিবেশগুলির জন্য অনেক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু ঔপনিবেশিকেরা ইংলণ্ডের এমনি আদুরে ছেলে হইয়াছে যে, মাতৃভূমির নিমিত্ত তাহারা কোন ক্ষতি স্বীকারে সম্মত হইতে পারে বলিয়া বোধ হয় না। অতএব একজাতিত্বমূলক সাম্রাজ্য বন্ধনও যে সুসম্পন্ন হইয়া উঠিবে, তাহা সর্ব্বতোভাবে অনুভব সিদ্ধ নহে। যদিই বা হয়, সেই

সকল সাম্রাজ্য সত্বরেই প্রাদেশিক সম্মিলিত শাসনের অধীন হইয়া পড়িবে। অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্য কালে বিস্তৃত সাম্রাজ্য কএকটী জাতীয়ভাবে সম্বদ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার সম্মিলিত শাসন-প্রণালী গ্রহণপূর্ব্বক প্রদেশ প্রমাণ হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু মনুষ্যের মধ্যে ক্ষমতাভেদ চিরকালই থাকিবে। সুতরাং ক্ষমতাশীল লোকে আবার বৃহত্তর সাম্রাজ্য গঠন করিয়া তুলিবে। পরার্থপরতার সহস্র বৃদ্ধিতেও ঐ কার্য্যের নিবারণ হইবে না।

(৫) শিক্ষা এবং শাসনের ভার পুরোহিতবর্গের হস্তে থাকিবার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে, এখনও শিক্ষার ভার প্রায় সকল দেশেই যাজকবর্গের হস্তে ন্যস্ত আছে। পূর্ব্বেও ছিল। ইউরোপ খণ্ডের যে যে দেশে প্রটেষ্টাণ্ট মতের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছে, সে সকল দেশে যাজকবর্গ কিছু হীনপ্রভ হইয়াছেন এবং যাজক ভিন্ন অন্যান্য লোকেও শিক্ষকের পদে ব্রতী হইতেছেন। কিন্তু তাহা হইলেও একমাত্র ফ্রান্স দেশ ভিন্ন অপর সকল দেশে, এখনও যাজক দলই স্বদেশের শিক্ষায় নিযুক্ত। ফ্রান্সেও যাজকেতর লোককে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ফল অতি শুভ বলিয়া গণ্য হয় নাই। যাঁহারা ধর্ম্ম শিক্ষা-দিবেন, তাঁহারাই সকল শিখাইবেন, ইহাই স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতি। পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে ঐ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল—ব্রাহ্মণেরাই ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের শিক্ষা প্রদান করিতেন। মুসলমানদিগের মধ্যেও মুল্লা বা যাজকের দলই প্রধানতঃ শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ জাতীয়দিগেরও ঐ রীতি। অতএব যাহা পূর্ব্বে ছিল, এখনও আছে, তাহা পরেও থাকিবার সম্ভাবনা।

কিন্তু শাসন কার্য্যের ভার যাহা কতক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর কতক পরম্পরা সম্বন্ধে যাজকবর্গের হস্তগত ছিল, তাহা উহাঁদিগের হস্ত হইতে ক্রমশঃ অপসারিত হইয়াছে। ইউরোপখণ্ডে পোপের প্রাধান্য কাথলিক রাজ্য গুলিতেও পূর্ব্বাপেক্ষায় ন্যূন হইয়াছে।

এমন কি, এই সে দিন আয়র্লণ্ডের লোকেরাও ল্যাণ্ডলীগ্ সম্বন্ধে পোপের নিবারণ শুনিল না। প্রটেষ্টাণ্টদিগের দেশে ত যাজকদিগের প্রাধান্য কিছুই নাই। তুরক্কের সুলতান আপন যাজকমণ্ডলীর (উলেমার) মত গ্রহণ করিয়া চলেন বটে, কিন্তু ইউরোপীয় রাজাদিগের প্রবলতর অনুরোধের নৈরন্তর্য্যে তাঁহাকে ক্রমশঃ উলেমার মুখাপেক্ষা ন্যূন করিতে হইতেছে। বৌদ্ধদিগের রাজ্য সকলেও পূর্ব্বে এক একটী ধর্ম্মরাজের অধিষ্ঠান ছিল, তাহা হয় একেবারে উঠিয়া যাইতেছে, নতুবা খর্ব্বশক্তি হইতেছে। এই সকল লক্ষণে আপাততঃ মনে করা যাইতে পারে না যে, শাসনকার্য্যে যাজকবর্গের মহিমা পুনর্ব্বার বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু যখন ইতিবৃত্ত শাস্ত্রের বিশেষ পর্য্যালোচনার দ্বারা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, যাজকদিগের হস্ত হইতে শাসনভার অপসৃত হইবার মুখ্যকারণ রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধের আধিক্য এবং জনগণের বৈষয়িক ব্যাপারে অনুরাগের বৃদ্ধি, তখন মনে করা যায় যে, যুদ্ধের ন্যূনতা হইলে এবং বিষয়ানুরাগ ধর্ম্মানুরাগ হইতে অভিন্নরূপে উপলব্ধ হইলে আবার শাসনকার্য্যে যাজকবর্গের আধিপত্য জন্মিতে পারে। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, সর্ব্বেশ্বরবাদ স্বীকৃত হইলে বিষয়-চিন্তা এবং বিষয়ার্থ পরিশ্রম, ধর্ম্মচিন্তা এবং তপশ্চরণ হইতে অপৃথক্‌ভূত হইয়া উঠে। অপর কোন মতবাদে তাহা সর্ব্বাঙ্গীন হয় না।

(৬) রাজ্যের লোক যাজক, শাস্তা এবং শ্রমজীবী এই তিন শ্রেণীতে বিভাজিত হইবার সম্বন্ধে প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, স্থূলতঃ ঐ প্রকার বিভাগই পৃথিবীর সকল দেশে পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল, এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব পরেও ঐ বিভাগ বলবৎ থাকিবারই সম্ভাবনা। ঐ বিভাগ ভারতবর্ষে পুরুষানুক্রমিক হওয়াতেই অতি বিস্পষ্টভাব ধারণ করিয়া আছে এবং যদি উহা অতিপল্লবিত না হইত, তাহা হইলে কোন অশুভ ফলই প্রসব করিত না। যাতায়াত সৌকর্য্যের বৃদ্ধির-সহিত কূপমণ্ডুকতার হ্রাস হইয়া এ দেশেও এক্ষণকার স্থানভেদ-

মূলক জাতীয় অবান্তরভেদগুলি কিয়ৎপরিমাণে তিরোহিত হইতে পারে, এবং মহাদেশটী আপনার প্রকৃত পূর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারে।

(৭) মানবহৃদয়ে পরার্থপরতা সম্যক প্রকারে স্বার্থপরতার অধিকার গ্রহণ করিতে পারে কি না, তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে ইহাই অবধারিত হয় যে, অভ্যাসগুণে যদিও স্বার্থপরতাকে অনেক পরিমাণে খর্ব্ব করা যায়, তথাপি উহা একেবারে নিঃশেষিত হইতে পারে না। যে সহানুভূতি হইতে পরার্থপরতা জন্মিবে, অহং অভিমানটী তাহারও মূলে আছে। সুতরাং স্বার্থবোধ এবং পরার্থবোধ উভয়ে পরস্পর অনুস্যূত। বস্তুতঃ যদি মানব মন একেবারেই স্বার্থবোধশূন্য হয়, তাহা হইলে উহা পরার্থবোধেও অক্ষম হইয়া পড়ে—তখন মানুষ পরের উপকার করিবে কি, উপকার কিসে এবং অনুপকার কিসে, তাহা জানিতেই পারে না। কোমটীও ঐরূপ স্বার্থশূন্যতার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার উদ্দেশ্য এইমাত্র ছিল যে, লোকে, বিশেষতঃ ইউরোপীয়েরা, যেরূপ পরার্থ সম্বন্ধে একেবারে অন্ধ হইয়া স্বার্থের অনুসরণ করে, এবং তাহা করিয়া একান্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং অব্যবস্থিত হয়, ক্রমশঃ সেই ভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক পরার্থের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে অভ্যস্ত হয়।

অতএব উপসংহারে বলা যায় যে, মনুষ্য সমাজের প্রতি আন্তরিক হিতৈষা প্রণোদিত হইয়া পণ্ডিতপ্রবর সুতীক্ষ্ণধী-অগষ্টকোমটী যে রূপে ভবিষ্য গণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা কিয়ৎপরিমাণে তথ্য বলিয়া পরিগৃহীত হইবার যোগ্য। তিনি ইতিবৃত্তশাস্ত্রের সমালোচনা দ্বারা মনুষ্য সমাজের প্রতি যে সকল শক্তির কার্য্যকারিতা উপলব্ধ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কতকগুলির প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া এবং অনেকটা সংযতচিত্ত হইয়াও বিচার করিতে পারিয়াছিলেন। যদি নিতান্ত তাড়াতাড়ি করিয়া একটা নূতন ধর্ম্ম-প্রণালীর উদ্ভাবন করিতে না যাইতেন, অথবা যদি তাহার পূর্ব্বে কখন এই ভারতবর্ষে কিম্বা কোন বৌদ্ধ

দেশে আসিতেন এবং তাঁহার আনুমানিক অনেকানেক ব্যাপারের কতকটা ফল প্রত্যক্ষীভূত করিতেন, কিম্বা অভ্যাস এবং শিক্ষার দ্বারা কতদূর হইতে পারে আর কি হইতে পারে না, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতেন, তাহা হইলে মানুষের পরিবর্ত্তনশীলতার সীমা এবং মানব সমাজে চক্রনেমিরক্রম নির্ণয় করিতে না পারিলেও সমাজ যে বক্ররেখাক্রমে চলে তাহার কিয়দংশ দেখিতে পাইতেন, তাঁহার প্রণীত দর্শন-শাস্ত্র আরও বহুল পরিমাণে সমাদৃত হইত, এবং সমাজ-তত্ত্বশাস্ত্র সংস্থাপনের মুখ্যফলই ফলিত—গ্রহ নক্ষত্রাদির ন্যায় মনুষ্য-সমাজ ও যে কোন বিশেষ কক্ষায় গমন করে তাহা অনুমিত হইতে পারিত।

ভবিষ্যবিচার—ইউরোপের কথা।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এখনও অধিকাংশ লোকেই স্বধর্ম্মপর এবং পরকালে বিশ্বাসবান আছেন। তথাপি নিম্নশ্রেণীর মধ্যে অনেকেই উদরচিন্তায়, অর্থচিন্তায়, এবং সুখলালসায় উদ্বেজিত হইয়া বিষয় ভোগার্থই আয়াসবান হইয়া উঠিয়াছে। ঐ সকল লোক কেবল ঐহিক-সুখস্বাচ্ছন্দ্যই চায়। উহারা ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রদত্ত পারলৌকিক সুখের উৎকোচে ভুলিতে চাহে না। তাহাদের মধ্যে গিয়া যদি বল যে, তোমাদের শাসনপ্রণালীর এই এই দোষেই তোমাদের যত দুঃখ। তাহারা সে কথায় কান দিবে এবং হয়ত শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে। যদি বল, তোমাদের ন্যায্য প্রাপ্য যাহা, তাহা অমুক বা অমুক কর্ত্তৃক অপহৃত হইতেছে, তাহারা সে কথায় বিশ্বাস করিবে এবং সেই অমুক বা অমুকের ঘর বাড়ী লুঠ করিতে যাইবে। কিন্তু ধর্ম্মের কোন কাহিনীতে উহাদের মন যায় না। পরকালকে মাথায় রাখিয়া উহারা ইহকালকেই ভোগ করিতে চায়।

যেখানে অনেক লোকের মন এরূপ ঐহিকতাপ্রবণ হইতেছে, সেখানকার কবি এবং সংস্কারকদিগের মধ্যেও কেহ কেহ যে ঐহিকতার উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়া সমাজসংস্কারের এবং সমাজের ভাবি অবস্থার কল্পনা করিবেন, তাহা সম্ভবপর। ইউরোপে তাহাই হইতেছে। যেমন সর্ব্বদাই রাজাশাসন নীতির এবং অর্থনীতির পরিবর্ত্ত চেষ্টা হইতেছে, তেমনি সমাজ-গঠনের নূতন নূতন শৃঙ্খলার আন্দোলনও চলিতেছে। ঐ সকল সমাজ-কল্পনার কিছু উল্লেখ না করিলে সমাজ সম্বন্ধীয় ভবিষ্য-বিচার সর্ব্বাঙ্গীন হইতে পারে না। এই জন্য সংক্ষেপতঃ তাহাদিগের কিছু উল্লেখ করিব।

ইউরোপ খণ্ডের ইতিবৃত্ত তিনটী স্থূল ভাগে বিভক্ত। তাহার প্রথম ভাগের আরম্ভ যে কোন পূর্ব্বকাল হইতে হউক, উহার পরিসমাপ্তি রোম-সাম্রাজ্যের পতনে; দ্বিতীয় ভাগ, ঐ সময় হইতে আরব্ধ হইয়া ফরাসিদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবে পর্য্যবসিত; আর তৃতীয় ভাগ, ঐ বিপ্লবকাণ্ডের পরবর্ত্তী আজি পর্য্যন্ত সমস্ত সময়কে লইয়া সংঘটিত। ভবিষ্য সমাজ-সংঘটনের যাবতীয় কথা এই শেষভাগেরই অন্তর্নিবিষ্ট। পূর্ব্ব দুই ভাগে সমাজ-কল্পনার যে সকল কথা পাওয়া যায়, সেগুলি কবিকল্পনার ন্যায়, সে সকল কথাকে কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই বলিলেও চলে। অতএব ফরাসি দেশের রাষ্ট্রবিপ্লব ব্যাপার হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে সামাজিক বন্দোবস্তের নূতন মত-বাদগুলি বাহির হইয়াছে বলা যায়।

ফরাসিদিগের রাষ্ট্রবিপ্লবে কয়েকটী কথার ধুয়া উঠিয়া ক্রমে: ইউ-রোপের মধ্যে সিদ্ধান্ত বাক্য বলিয়াই পরিগৃহীত হইয়াছে। কথাগুলি এই (১) মনুষ্য স্বাধীন জীব। (২) মনুষ্যেরা পরস্পর তুল্য। (৩) মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। এই সকল কথা যে কারণে উঠে তাহার প্রভাবে ফরাসিদেশে সমূহ পরিবর্ত্ত ঘটে। তাহার মধ্যে কোনওগুলি অল্প কালের জন্য থাকে, অপর কতকগুলি স্থায়ী হইয়াছে, এবং

অপরাপর দেশেও পরিগৃহীত হইতেছে। ফরাসি-বিপ্লবে (১) যাজক-দিগের তিরস্কার এবং ধর্ম্ম-শাসনের উচ্ছেদ হয়। (২) রাজার শাসন উঠিয়া গিয়া প্রজা-সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিভূদিগের শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। (৩) ভূম্যধিকারীদিগের নির্ব্বাসন হইয়া তাঁহাদিগের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়। (৪) পৈত্রিক সম্পত্তিতে জ্যেষ্ঠাধিকার রহিত হইয়া সকল সন্তানের সমান স্বত্ব সংস্থাপিত হয়। (৫) রাজ্যমধ্যে প্রাদেশিক ব্যবস্থার তিরোধান হইয়া সার্ব্বভৌমিক ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। (৬) ব্যক্তিভেদে ধর্ম্মাধিকরণের বিভিন্ন নিয়ম রহিত হইয়া আইনের চক্ষে সকল প্রজাই সমান হইয়া দাঁড়ায়। (৭) অপরাধীর নির্য্যাতন এবং বিচার কার্য্যের ব্যয়াধিক্য নিবারিত হয়। (৮) আদত্ত কর, শাস্তার ভোগে ব্যয়িত না হইয়া প্রজার হিতার্থই ব্যয়িত হইবার বিধি হয়। (৯) শিক্ষা সম্পাদন, সুনীতি প্রবর্ত্তন, বিদ্যা এবং শিল্পের সম্বর্দ্ধন রথ্যা নির্ম্মাণ, বাণিজ্যের শৃঙ্খলা স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্পাদন প্রভৃতি প্রজার হিতকর ব্যাপার, রাজা বা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা-সম্ভূত বা দয়ার কার্য্য না থাকিয়া শাসনকার্য্যের অঙ্গীভূত হয়। এই সকল পরিবর্ত্তের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেই প্রতীতি হইবে যে, ইউরোপে প্রজাসাধারণের হিতোদ্দেশের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া সমাজের পরিচালনা করাই ফরাসি-বিপ্লব কাণ্ডের প্রদত্ত অতি মহতী শিক্ষা।

পরন্তু ঐ তথ্যশিক্ষার সহিত একটী অতথ্যশিক্ষাও হইয়া গিয়াছে। ইউরোপে ধর্ম্মশিক্ষার প্রভাবে সুশাসনের শিক্ষা হয় নাই—বিপ্লবের বলে হইয়াছে। সেখানে ন্যায়ানুগামিতার শিক্ষা না হইয়া বিদূষিত সাম্যবাদ ধরিয়া বিপ্লব করিতে হইয়াছে। কিন্তু ওরূপ সাম্যের কথাটী প্রকৃত কথা নয়। পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী প্রভৃতিই সধন ছিলেন। কিন্তু শিল্প বাণিজ্যাদির প্রভাবে মধ্যবিধ লোকের মধ্যেও ধনবত্তার এবং বিদ্যা চর্চ্চার বিস্তার হয়। এমন কি, ঐ সকল লোকের মধ্যে অনেকেই ভূম্যধিকারী প্রভৃতি শাস্তৃবর্গের অপেক্ষা ধনে এবং ক্ষমতায় বড় হইয়া-

উঠে। ঐ সকল লোক আত্ম-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া শাস্তৃদলের সহিত আপনাদের সমতা খ্যাপন করে এবং সেই সাম্যবাদের বলে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়। কিন্তু জন্মবৈষম্যের স্থলে ধনবৈষম্য সংস্থাপিত হইয়াছিল মাত্র। বৈষম্য যায় নাই—উহার একটু গতি ফিরিয়াছিল।

যে সময়ে ফরাসি বিপ্লব হইতে অলীক সাম্যবাদের প্রাদুর্ভাব হইল, সেই সময়েই ইউরোপখণ্ডে বাষ্পীয় যন্ত্রাদির আবিষ্কার, উৎকর্ষ সাধন, এবং প্রয়োগ-বাহুল্যে শিল্পজাতের পরিমাণ বৃদ্ধি, বাণিজ্যের বিস্তৃতি এবং মূলধনীদিগের ধনের ঐকান্তিক আধিক্য হইতে থাকিল। তজ্জন্য শ্রমজীবীদিগের কার্য্যহানি, ভক্ষ্য-সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি এবং অস্থি-পেসক পরিশ্রমেরও প্রয়োজন হইল। কলের ব্যবহার বাড়িলেই মজুরের কাজ কমে, কাজ কমিলেই মজুরের দর কমিয়া যায়। মজুরির দর কম হওয়া, আর ভক্ষ্য দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হওয়া, একই কথা। বৈদেশিক শিল্পকরদিগের প্রতিযোগিতা এবং দেশীয় শিল্পকরদিগের পরিশ্রমের আতিশয্য এ দুইটীও এক পদার্থ। কলে জিনিস হয় বেশী, স্বদেশে সমুদায় কাটে না, বহির্বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়, এবং বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা আসিয়া পড়ে। শ্রমজীবী এবং শিল্পকরদিগকে খাটিতে হয় অধিক, এবং যে সমাজে ঐহিকতার প্রাবল্য তথায় শ্রমজীবীরা লাভভাগী হয় না, ধনোপার্জ্জন হয় মূল ধনীদিগের।

অতএব এক পক্ষে ফরাসী-বিপ্লব হইতে লোকের মনে সাম্যভাবের বৃদ্ধি হইল, এবং পক্ষান্তরে কলের প্রভাব হইতে লোকের অবস্থার সমূহ বৈষম্য জন্মিল। এই বাহ্য বৈষম্য নিরাকরণের উদ্দেশেই সুবুদ্ধিগণ কর্ত্তৃক সমাজের বিবিধ রূপ-কল্পনা হইয়াছে।

ঐ কল্পনা অনেক প্রকার হইয়াছে। তাহার এক একটী করিয়া বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। উহাদিগের মূলসূত্র কয়েকটীর উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। সকল কল্পনারই প্রধান সূত্র এক—সম্পত্তির অধিকার ব্যক্তি-নিষ্ঠ না হইয়া সমাজ-নিষ্ঠ হউক"। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি

বিশেষের কিছুমাত্র সম্পত্তি থাকিয়া কাজ নাই, সকল সম্পত্তির অধিকারী একমাত্র সমাজ হইয়া থাকুন। তুমি আমি যে যাহা রোজগার করিব, সকলই সমাজের হাতে দিব; সমাজ আমাদিগকে প্রতিপালন করিবেন। আমরা কাজ করিব ক্ষমতানুসারে, ভোগ করিব প্রয়োজনানুসারে।

ইউরোপীয়েরা ভারতবাসী অপেক্ষা সহস্রগুণে ব্যক্তি-নিষ্ঠস্বত্বের পক্ষপাতী। আমাদের মধ্যে সম্মিলিত-পারিবারিক-প্রণালী প্রচলিত। উহঁাদের মধ্যে তাহা নাই। আমাদের মধ্যে পাঁচ ভাই রোজগার করিয়া বাপের হাতে দেয়, বাপ যাহাকে যাহা দিতে হয়, তাহা দিয়া থাকেন। ইউরোপীয়েরা এরূপ বন্দোবস্তকে আদবেই ভাল বাসেন না। উহঁাদের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক হইয়া যাইবারই বিধি।

এরূপ পারিবারিক অবস্থাপন্ন লোকদিগের মধ্যে একেবারে ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্বের বিলোপ হইয়া সমাজ-নিষ্ঠ স্বত্বের সংস্থাপন হইবার কথা অতি বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে ইহা ততটা বিস্ময়ের বিষয় থাকে না। কোন বস্তুকে নিতান্ত নিজস্ব বোধ করা একটী প্রকাণ্ড ভ্রম। একতঃ এই নশ্বর মর্ত্ত্যলোকে কিছুই কাহার নিজস্ব হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ সম্পত্তির উৎপত্তি বল, তাহার রক্ষা বল, তাহার ভোগ বল, কিছুই কাহার একেলার যত্নে বা সুখসাধনে সম্পাদিত বা পর্য্যবসিত নহে। সুতরাং শ্রমোপার্জ্জিত দ্রব্যে মনুষ্যের যে ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্ব, তাহার অভ্যন্তরে একটী গূঢ় সম্মিলিত স্বত্ব স্বীকার করিবার সম্যক হেতু আছে। ইউরোপীয়েরা রোমীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রে দীক্ষিত হইয়া স্বত্বের ঐ গূঢ় প্রকৃতিটীর প্রতি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। এখন যে, একেবারে সামাজিক-সম্মিলিত স্বত্বের পক্ষপাতী হইতে যাইতেছেন, তাহা সেই পূর্ব্ব ভ্রমেরই ফলমাত্র। এক দিকে অধিক ঝুঁকিলেই আবার তাহার বিপরীত দিকে ঝুঁকিতে হয়।

যদি পূর্ব্বে কখন সম্মিলিত স্বত্বের জ্ঞান থাকিত, যদি ঐ বোধটীকে

অসভ্যতার বা অনুন্নতির চিহ্ন বলিয়া গণনা না করিতেন, তবে আজি ইউরোপের মধ্যে সামাজিক-স্বত্ব সংস্থাপনের জন্য এমন আগ্রহাতিশয্য হইত না।

এখন যে ইউরোপে পরার্থপরতা শিখাইবার জন্য এতটা আগ্রহ বাড়িয়াছে, তাহারও কারণ ঐরূপ। ইউরোপীয়দিগের রাজনীতি, সমাজনীতি, গৃহনীতি সকলই একমাত্র স্বার্থপরতার উপর সংঘটিত হইয়া আছে। ঐ সকলের দোষ ক্রমে ক্রমে আতিশয্য প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে পদে পদে দৃষ্ট হইতেছে। অতএব একেবারে পরার্থপরতার দিকে বেগ বাড়িয়াছে—এখনও কাজে বড় কিছু হয় নাই বটে, কিন্তু ক্রমে কাজেও কতকটা হইতে পারে।

কিন্তু তাহা হইলেও এইরূপ ঝোঁকগুলিকে সমাজের উন্নতির পথানুসরণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। প্রকৃত উন্নতির পথে ওরূপ ঝোঁক ধরে না, পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত তথ্যকে অন্তর্নির্বিষ্ট করিয়াই ব্যাপকতর সত্যের আবির্ভাব হয়, এবং তাহাতে কোন পূর্ব্ব নির্ণীত সত্যের অপলাপও হয় না। কিন্তু ইউরোপীয় সমাজ-কল্পয়িতৃগণ অনেকানেক সত্যের অপলাপ করিয়াই আপনাপন মত প্রচারিত করিয়া থাকেন। প্রথম, তাঁহারা ধর্ম্মবন্ধন মানেন না; দ্বিতীয়, তাঁহারা বৈবাহিক সংস্কার স্বীকার করেন না; তৃতীয়, তাঁহারা প্রজা-সংখ্যার বৃদ্ধি সংকোচ করা আবশ্যক বলেন না; চতুর্থ, তাঁহাদের মধ্যে কোন কোন দল বলেন যে, মানুষের সাহজিক রিপু সকলকে দমন করিবার চেষ্টা করা অবৈধ; পঞ্চম, অপর কোন কোন দলের মতে শারীরিক সুখ-ভোগই পরম পুরুষার্থ।

আমাদিগের শাস্ত্রেও অর্থ সাধনের উপায় কথিত হইয়াছে, যথা—

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্যচ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থান্ * * *

ইন্দ্রিয়গণকে বশে রাখিয়া মনকে সংযত করিয়া সমুদায় অর্থের সাধন করিবে।

ভারতবর্ষের কথা যাহাই হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত সূত্র সকল ধরিয়া ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, জর্ম্মনিতে এবং আমেরিকায় অনেকানেক সম্প্রদায় সংস্থাপিত হইয়াছিল। সে গুলির বন্দোবস্ত এবং কার্য্যনির্ব্বাহের সহায়-তার জন্য কয়েক জন মানবকুল হিতৈষী মহাত্মা ধন-ব্যয় এবং শরীর-ব্যয় করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল সম্প্রদায়ের অনেক গুলিই টিকে নাই। অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে গুলি আছে, তাহা-দিগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অতি কঠিন দণ্ডনীতির প্রবেশ করাইয়াই তাহা-দিগকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। ঐ সম্প্রদায়গুলিতে যেরূপ হইয়াছে এ পর্য্যন্ত কোন প্রচলিত সমাজেই সমাজপতিদিগের হস্তে ততটা প্রভূত ক্ষমতা গ্রহণের প্রয়োজন হয় নাই। একটী মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটী স্পষ্টানুভূত হইবে। স্বেচ্ছাচার প্রবণ ইউরোপীয় সংঘটিত ঐ সকল সম্প্রদায়ে বিধি হইয়াছে যে, সেই সেই সম্প্রদায় সম্ভুক্ত কোন নরনারী স্বেচ্ছাতঃ এবং কর্ত্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে বিবাহসূত্রে সম্বন্ধ হইতে পারিবে না। এটা সকল সম্প্রদায়েরই সাধারণ নিয়ম হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ বিধিও সংস্থাপিত হইয়াছে যে, কোন স্ত্রী-পুরুষের সন্তান সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত হইবে না। আবার কোন সম্প্রদায় বিধান করিয়াছেন যে, প্রত্যহ কে কখন কোথায় কি করিবে, তাহার এক একটী তালিকা কর্ত্তৃপক্ষের মঞ্জুরির নিমিত্ত প্রত্যহ প্রদত্ত হইবে। অতএব ঐ সকল সাম্প্রদায়িকেরা স্বাধীনতা বর্দ্ধনের প্রয়াসে ইউরোপ প্রচলিত সমাজ বন্ধন গুলি ছিন্ন করিতে গিয়া তদ-পেক্ষা বিবিধ কঠিনতর বন্ধন জালেই জড়িত হইয়াছে। বস্তুতঃ সমাজ পদার্থটী কুম্ভকারের প্রতিমাদির ন্যায় হাতে করিয়া গড়িবার বস্তু নহে; উহা প্রাণী বা উদ্ভিজ্জশরীরের ন্যায় জন্মিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হয়।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া এবং সম্প্রদায় গঠনের প্রতি একান্ত বিরক্ত হইয়া আর একটী দল নূতন উঠিয়াছে। ইহাঁরা বলেন যে, স্বাধীনতা এবং সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বের জল্পনা ছাড়িয়া দিয়া, যে এক

মাত্র পরিণামবাদে সকল বিষয়ের তথ্য নিহিত আছে, সেই পরিণামবাদ মানব-সমাজের সম্বন্ধে কি বলেন বা বলিতে পারেন, তাহা মানিয়া চলিতে হইবে।

অতএব পরিণামবাদ বলিলে ইউরোপীয়েরা যাহা বুঝেন, তাহার এ স্থলে কিছু ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। তাঁহাদের মতে পরিণামবাদের মোটামুটি অর্থ জগৎকার্য্যে উন্নতিশীলতার স্বীকার। পরিণামবাদের ভিতরে উন্নতির ভাবটীকে বিভিন্ন প্রকারে প্রবেশিত করা হয়। তাহার একপ্রকার এই—একরূপ কিছু হইতে অপররূপ কিছু হওয়ার নাম পরিবর্ত্তন বা পরিণাম। কিন্তু একরূপ কিছু হইতে অপররূপ কিছু হয় কেন? অবশ্য কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত হয়; সে উদ্দেশ্য কি হইতে পারে? সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাস ভিন্ন আর কি উদ্দেশ্য আছে? তবেই জগতে যাহা কিছু হয়, তাহার দ্বারা সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাস হয়। তাহারই অপর নাম উন্নতি। অপর পরিণামবাদীরা এরূপ উদ্দেশ্য-বাদী নহেন। তাঁহারা বলেন, জগৎকার্য্যের মধ্যে উদ্দেশ্যের কল্পনা মনুষ্যের আত্মত্বারোপসম্ভূত। উহা কোন প্রকৃত বস্তু নহে। অতএব জগৎকার্য্য কিরূপে চলিয়া আসিতেছে তাহাই দেখ এবং তাহা দেখিয়া উহার পথ বুঝিয়া লও। দেখিবে, সেই পথটী সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাসের দিকে যাইতেছে। সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাসের নামই উন্নতি। অপর পরিণামবাদীরা বলেন যে, এই বিচারে যদিও জগৎকার্য্যের প্রতি কোন উদ্দেশ্যের আরোপ নাই বটে, তথাপি সর্ব্বত্রই যে সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের হ্রাস কল্পিত হইয়াছে, তাহা বস্তুতঃ অনুভব-বিরুদ্ধ। প্রকৃত প্রস্তাবে জগৎকার্য্যের মধ্যে ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার কোথাও একটা কিছু রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে অপরাপর ব্যাপারেও তদুপযোগী রূপান্তরতা সংঘটিত হইয়া থাকে। এইরূপ রূপান্তরতার সংঘটন অথবা সাধারণতঃ উপযোগিতার সম্বর্দ্ধন ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু উপযোগিতার বৃদ্ধিতেই সংরক্ষণ হয় এবং যাহাতে রক্ষা হয় তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যায়। অতএব পরিণতি ব্যাপার

ধর্ম্মের অভিমুখে হয় এবং ধর্ম্ম কোথাও সাক্ষাৎসম্বন্ধে আর কোথাও বা পরম্পরা সম্বন্ধে সুখের হেতুভুত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পরিণামবাদের শেষোক্ত ব্যাখ্যাটী সর্ব্বাপেক্ষায় বিচারসহ হইলেও উহা সমীচীন নহে। রক্ষণ বলিলেই বিনাশের একটী প্রতিযোগী শক্তির অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ঐ ব্যাখায় তাহার উল্লেখ নাই। ফলতঃ পরিণামবাদ যেমন জগৎকার্য্যের প্রথম প্রবৃত্তির কোন কথাই বলিতে পারেন না, তেমনি রক্ষণোপযোগী প্রতিযোগিতারও হেতু দেখাইতে পারেন না। এই জন্য (১) অস্তিত্ব এবং পরিবর্ত্ত অর্থাৎ (২) উৎপত্তি ও (৩) বিনাশ বিশ্বব্যাপারে এই ত্রিগুণাত্মিকতা স্বীকৃত হওয়াই যুক্তি সঙ্গত।

পরিণামবাদী দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মতগুলি অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইল। নূতন দলস্থদিগের মধ্যে ব্যক্তিভেদে ইহার অন্যতম ব্যাখ্যা গৃহীত হইয়াছে। তাঁহারা মনুষ্য সমাজের প্রতি পরিণামবাদের প্রয়োগ করিয়া বলেন, মানুষ প্রথমতঃ একান্ত পশুভাবাপন্ন ছিল, অনন্তর দণ্ড-নীতির বশীভূত হইয়া পশুভাব ত্যাগ করিয়াছে, পরে নীতিমান হইয়া অনেকেই দণ্ডের প্রয়োজন অতিক্রম করিতেছে, সুতরাং পরিশেষে সকলেই নীতি সংস্কারপূত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। তখন আর কোন প্রকার শাসন কাণ্ডের প্রয়োজনই থাকিবে না। শাসন মানুষের শিক্ষার জন্য, যখন শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল, তখন শাসনেরও কাজ ফুরাইল। এই বলিয়া তাঁহারা সমস্ত শাসন প্রণালীর বিধ্বংস করিতে চাহেন। সেই জন্য ইহাঁদিগকে ‘নিহিলিষ্ট’ বা বিধ্বস্তা বলা যায়।

বিধ্বস্তৃগণ বলেন যে, প্রকৃত সাধারণ তন্ত্রতাই শাসন-প্রণালীর পরিণাম। কিন্তু নির্ব্বাচন প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক প্রজাপ্রতিভূদিগের দ্বারা শাসনপ্রণালী সংঘটিত হইলে, তাহা বাস্তবিক সাধারণ তন্ত্রতা হয় না। কারণ সে শাসন-প্রণালীও প্রজাসাধারণের সম্পূর্ণ অভিমতানুসারে চলে না। উহাতেও ধনশালী ব্যক্তিবূহের প্রাধান্য থাকে। সম্পত্তিশালী লোকেরাই নির্ব্বাচন করেন, এবং সম্পত্তিশালীরাই নির্ব্বাচিত হয়েন। অতএব নির্ব্বাচিত পার্লি-

য়ামেণ্ট অথবা তাদৃশ সভার দ্বারা যে শাসন কার্য্য চলে, তাহাও ধনীদিগের শাসন এবং ধনহীনদিগের পীড়ন মাত্র। কিন্তু প্রকৃত সাধারণ-তন্ত্রতাই শাসনপ্রণালীর পরিণাম, অর্থাৎ কোন শাসন না থাকাই শাসনপ্রণালীর চরমাবস্থা। অতএব শাসন-কার্য্য একেবারেই উঠিয়া যাউক। ইঁহারা আরও বলেন যে, কোন মনুষ্য প্রভূত ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইয়া সুখভোগ করিবে, আর কেহ বা উদরান্নের নিমিত্ত হাহা করিবে, ইহাও মনুষ্যসমাজের যথোচিত পরিণাম নহে। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ গুলিতে লোকের আর্থিক বৈষম্য অপরিসীম হইয়াছে। সে বৈষম্যের হেতু ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্ব। যদি ভূমিতে, যন্ত্রাদিতে এবং মূলধনে ব্যক্তিনিষ্ঠ স্বত্বের লোপ হইয়া সামাজিক স্বত্বের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে জনগণের মধ্যে যে আর্থিক বৈষম্য জন্মিয়াছে তাহা অবশ্যই তিরোহিত হইবে। অতএব ইঁহাদের মতে সামাজিক পরিণামের ফলে শাসনপ্রণালী একেবারে উঠিয়া যাইবে এবং বক্তিনিষ্ঠ স্বত্বের সম্যক লোপ হইবে।

বিধ্বস্তৃদিগের মতবাদ লইয়া অধিক বিচার করা নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা শাসন কার্য্য একেবারে উঠাইয়া দিবার সম্বন্ধে যাহা বলেন, তদ্বিষয়ে এইমাত্র বক্তব্য যে, শাসনের প্রয়োজন থাকিলেই শাসন থাকে। যদি শিক্ষাগুণে এবং অভ্যাসগুণে মানুষমাত্রেই কখন এমন ধর্ম্মশীল হইয়া উঠে যে, আপনি সর্ব্বতোভাবে আপনাকে শাসন করিতে পারে, তবে বাহির হইতে অপর কোন শাসনের প্রয়োজন হয় না। মানুষ তেমন ধর্ম্মশীল হইতে পারে কি? মানুষ পূর্ব্বাপেক্ষায় এখন ধর্ম্মশীল হইয়াছে কি? এ প্রসঙ্গে অন্যান্য দেশের কোন কথার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। যে ইউরোপে এই সকল কথা উঠিয়াছে, সেখানে ধর্ম্মের যে কিছুমাত্র বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা কেমন করিয়া মনে করিব? অপর কোন কথার উল্লেখ না করিয়াও বলা যায় যে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পররাজ্যগ্রহণ চেষ্টা যেরূপ বলবতী এবং বৃদ্ধিশীলা হইতেছে, এবং ভোগসুখতৃষ্ণার যেরূপ তীক্ষ্ণ ধার জন্মিতেছে, তাহাতে ত ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়াছে বা হইতে পারিবে বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। ইউ-

রোপীয়েরা যত দিন পররাজ্য গ্রহণের ছল, বল, কৌশল না ছাড়িতেছেন, তত দিন তাঁহারা ধর্ম্মোন্নতি করিতেছেন বলিয়া মনে হওয়া অসাধ্য। প্রত্যুত তাঁহাদের সন্তানেরাও ঐ দস্যুপ্রকৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া জন্মিবে, ইহা মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। শাস্ত্রে, শাসনের প্রয়োজন দেখাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে—

যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ডেষ্বতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যান্ দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ॥

যদি রাজা সতর্ক থাকিয়া দণ্ডযোগ্যের প্রতি দণ্ডের প্রয়োগ না করেন, তবে বলবানেরা দুর্ব্বলদিগকে শিকপোড়া মাছের মত করিয়া পাক করে।

ইউরোপীয়রাই কি সেই বলবত্তর নহেন? তাঁহারাই কি পৃথিবীর সকল লোককে শূলে বিদ্ধ মৎস্যের ন্যায় ভাজা ভাজা করিতেছেন না? এমন ইউরোপে যদি শাসনের প্রয়োজন নাই, তবে কোথায় আছে?

আর্থিক বৈষম্য ইউরোপে যতদূর হইয়াছে, তাহা তাঁহাদের সমাজ সংঘটনের দোষে এবং পুরুষানুক্রমে পরার্থপরতা শিক্ষার অভাবে ঘটিয়াছে। অতএব সেই সকল দোষ নিবারণের চেষ্টা করিলে এবং পরার্থপরতা শিক্ষার সাফল্য হইলে, ঐ বৈষম্য কতকটা নিবারিত হইবে। কিন্তু বিধ্বস্তৃগণ আর্থিক বৈষম্যের যে সকল হেতু নির্দ্দেশ করিয়া বিচার করেন, তাহার মধ্যে একটী প্রধান কারণের উল্লেখ করেন না। সে কারণটী মনুষ্যের মধ্যে ক্ষমতার বৈষম্য এবং পরিশ্রমশক্তির এবং পরিশ্রম-প্রবৃত্তির তারতম্য। ঐ নৈসর্গিক বৈষম্যের তিরোধান হইতে পারে না। সুতরাং অর্থোপার্জ্জনের অপর সকল উপাদান সমান করিয়া দিলেও ঐ দুইটী উপাদানের বৈষম্য নিবন্ধন আবার সমাজ মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হইবে। অতএব সমাজমাত্রেই কতকটা বৈষম্য থাকিবার স্বাভাবিক হেতুই বিদ্যমান আছে।

বস্তুতঃ বিধ্বস্তৃ প্রভৃতি লোকের যে সকল মতবাদ উঠিয়াছে, তাহার অধিক কথাই অভিলাষমূলক, বিচারমূলক নহে। প্রত্যুত তাঁহারা বিতণ্ডা করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের কথাগুলি যদিও অভিলাষ হইতেই উঠিয়াছে

বটে, তথাপি অভিলাষ হইতে উঠিয়াছে বলিয়াই কথাগুলি অলীক বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। যাহাতে প্রয়োজন তাহাতেই মনুষ্যসাধারণের নিয়ত অভিলাষ থাকে, এবং তাহা কালক্রমে সিদ্ধ হইবারই সম্ভাবনা। কারণ, অভিলাষ বশতঃ চেষ্টা জন্মে এবং চেষ্টাশক্তি স্থায়ীভাবে কার্য্য করিলেই ফলবতী হয়। এ কথাতেও বলা যায় যে, চেষ্টার ফলবত্তা কার্য্যের সাধনে পর্য্যবসিত হয়। প্রয়োজনসাধনের প্রণালী আবিষ্কারে অভিলাষের অধিকার নাই, অভিজ্ঞতার অধিকার।

স্থূল কথা এবং সূক্ষ্ম কথাও এই যে, শাসনের প্রয়োজন কখনই যাইতে পারে না, তবে শাসন কঠোর না হইয়া অর্থাৎ কেবল দণ্ডমূলক না হইয়া অধিক পরিমাণেই শিক্ষা এবং উপদেশমূলক হইতে পারে। আর সমাজ হইতে বৈষম্য যাইতে পারে না, কিন্তু উহার অনেকটা ন্যূনতা হইতে পারে। সুতরাং ইউরোপীয় সমাজ বিপ্লাবকবর্গের ধ্বনিত "স্বাধীনতার" পরিবর্ত্তে "শাস্ত্রাধীনতার" এবং "সাম্যের" পরিবর্ত্তে "ন্যায়ানুগামিতার" এবং "ভ্রাতৃত্বের" পরিবর্ত্তে "ভক্তি, প্রেম, এবং দয়ার" ধ্বনি উত্থিত হইলেই ভাল হয়। কতকটা এইরূপ ধ্বনি, অন্ততঃ "শাস্ত্রাধীনতার" ধ্বনি, ইংলণ্ডের বিপ্লবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল—তাহার ফলও ইউরোপীয় অপরাপর বিপ্লব কাণ্ডের ন্যায় তেমন অপকৃষ্ট হয় নাই।

ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা।

(উপনিবেশ-যোগ্যতা।)

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইউরোপেরই অবস্থামাত্র ভালরূপে জানিয়া সমস্ত মানব সমাজ সম্বন্ধে যে প্রকার ভবিষ্যদর্শন করেন, সম্প্রতি তাহার সহিত ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অতি অল্প। ভারতসমাজ অনেকটা

ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াই আপনার উন্নত সভ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার প্রকৃতি শান্তিপ্রবণ, ইহার নেতৃত্ব ধর্ম্মশাস্তৃবর্গের হস্তগত, ইহাতে সামাজিক স্বত্বও কিয়ৎপরিমাণে স্বীকৃত, ইহাতে সম্মিলিত গার্হস্থের ব্যবস্থা প্রচলিত, ইহাতে ত্যাগের মাহাত্ম্য এবং পরার্থপরতার পবিত্রতা জাজ্জল্যমান, এবং ইহাতে সমব্যবসায়ীদিগের সুদৃঢ় দলবন্ধন সূত্রও বহুকাল হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। এ সমাজে এবং ইউরোপীয় সমাজের অনেক অন্তর। সুতরাং ইউরোপীয় সমাজের পরপরকালিক পরিবর্ত্ত সকল দেখিয়া তাহাতে যেরূপ পরিণতি অনুমিত হইয়াছে, ভারত সমাজের পরিণতিও অবিকল সেই প্রকারের হইবে, এরূপ মনে করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। ভারত-সমাজ সর্ব্বতোভাবে মুক্তাবস্থ থাকিলে উহা এতদিন যে পথে চলিয়া আসিয়াছে এখনও সেই পথেই চলিতে থাকিত। কিন্তু ভারত-সমাজ সেরূপ মুক্তি পাইতেছে না। ইউরোপের মধ্যে যে জাতি সর্ব্বপ্রধান হইয়াছে, ভারত এখন সেই জাতির একান্ত বশতাপন্ন। সুতরাং আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন গিয়াছে সামাজিক স্বাধীনতাও সেইরূপ যাইবে কি না, ইহা বিচারের স্থল হইয়া পড়িয়াছে।

অতএব অগ্রেই দেখিতে হইবে যে, ভারত সমাজের স্বাধীন ভাব বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না। ভারত-সমাজের স্বতন্ত্রভাব যাইতে পারে দুই প্রকারে। এক, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে ইউরোপীয়দিগের অনুরূপ পরিবর্ত্ত সাধিত হইয়া গেলে হয়। অপর, এখনকার ভারতবাসী নিঃশেষিত হইয়া এই দেশ ইউরোপীয় জাতির আবাস ভূমি হইয়া উঠিলেও হয়। এই দুইটী বিচার্য্য বিষয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টীর বিচারই অগ্রে কর্ত্তব্য। কারণ যদি ভারতবর্ষ ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশিত হইয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়, তবে আর ইংরেজাধিকারে ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কি কি পরিবর্ত্ত ঘটিতে পারে, তাহা ভাবিবার বিষয় থাকে না। অতএব ভারতবর্ষ ইউরোপীয় কর্ত্তৃক উপনিবেশিত হইতে পারে কি না, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।

উপনিবেশ সংস্থাপন সম্বন্ধে দুইটী স্থূল কথা আছে। (১) উপনিবেশ স্থাপন বিরল-প্রজ দেশেই হয়। (২) উপনিবেশ স্থাপন সমপ্রকৃতিক দেশেই ভাল হয়; অর্থাৎ যাহারা উপনিবেশ স্থাপন করিবে তাহারা যেমন দেশ হইতে আইসে সেই দেশের সমান শীতোষ্ণ এবং তাহার সমান জল, বায়ু, শস্যাদি বিশিষ্ট দেশেই উহারা সহজে বসবাস করিতে এবং বর্দ্ধিতবংশ হইতে পারে।

উল্লিখিত দুইটী সূত্রের প্রয়োগ করিতে গিয়া দেখা যায় যে, ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ সংস্থাপন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের প্রতি উহার কোনটীই খাটে না। ভারতবর্ষে প্রজার বিরল প্রচার নহে। ইহার মধ্যে অনেক বন ভূমি এবং পার্ব্বতীয় ভূমি আছে। সে সকল স্থান অধিক লোকের বাসযোগ্য নয়। কিন্তু সে সকল ধরিয়া হিসাব করিলেও এ দেশের অধিবাসীর সংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ২৩০র অন্যূন এবং ইউরোপে ৯১র অনধিক। ইহাতেই ভারতবর্ষের কেমন প্রজাধিক্য তাহা বুঝা যায়। এই কথা অধিকতর স্পষ্ট করিবার জন্য বলিতেছি যে, প্রতি বর্গমাইলে, ফ্রান্সের জনসংখ্যা ১৮৭, ডেনমার্কের ১৪৩, বেলজিয়মের ৫১৪, হলণ্ডের ৩৪৩, অষ্ট্রীয়া হঙ্গেরির ১৬০, জর্ম্মেণির ২২১, গ্রেটব্রিটন আয়র্লণ্ডের ২১০, চীনের ২৩৪ এবং জাপানের ২৫৫। ভারতবর্ষে প্রজার বৃদ্ধি প্রতিবর্ষে ১৫ লক্ষের অধিক। অতএব ভারতবর্ষ অতি নিবিড়-প্রজদেশের মধ্যেই গণ্য। এখানে অপর জাতীয় লোকের উপনিবেশ সংস্থাপনের সুবিধা নাই।

ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ সংস্থাপনের পক্ষে দ্বিতীয় সূত্রটীও খাটে না। কারণ এক পক্ষে ভারতবর্ষ গ্রীষ্মপ্রধান এবং অধিক পরিমাণেই সমতল দেশ। উহার সুবিস্তৃত সমতল ভূভাগের মধ্যে উচ্চ এবং অপেক্ষাকৃত শীতল অধিত্যকা অত্যল্পই আছে। পক্ষান্তরে ইউরোপ শীতপ্রধান। অতএব ইউরোপে এবং ভারতবর্ষে সমপ্রকৃতিকতা নাই। এই জন্য ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার বিশেষ সুবিধা নাই।

কিন্তু একটী কথা আছে। ভারতবর্ষ একটী মহাদেশ। ইহার কোন কোন অংশ এমন আছে, যাহা অপেক্ষাকৃত বিরলপ্রজ এবং পর্ব্বত-বহুল বলিয়া শীতপ্রধান। ভারতবর্ষের সেই সকল ভাগেও কি ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইতে পারে না? ভারতবর্ষের মধ্যে ওরূপ স্থানের পরিমাণ ১ লক্ষ ৭০ হাজার বর্গমাইল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। গড়ে ঐ স্থানগুলিতে বর্ত্তমান প্রজার সংখ্যা প্রতি বর্গমাইলে ২১র অনধিক। ঐ সকল প্রদেশে ইউরোপীয় শ্রমজীবী লোকেরাও আসিয়া বাস করিতে পারে।

অপর একটী কথাও বিবেচ্য আছে। অবিরলপ্রজ দেশেও উপনিবেশ স্থাপনের সুবিধা দুই কারণ হইতে হয়। (১) যদি উপনিবেশিতব্য দেশে আপনাদের রাজ্যাধিকার থাকে, আর (২) তৎসহ উপনিবেশ স্থাপয়িতার বল যদি নিয়ত বৃদ্ধিশীল থাকে, তাহা হইলেও হয়।

উল্লিখিত দুই সূত্রের মধ্যে প্রথমটী ভারতবর্ষের প্রতি খাটিয়াছে। ভারতবর্ষের যে সকল ভাগ পার্ব্বতীয় এবং শীতপ্রধান তাহার সকল গুলিই ইংরাজ-রাজের আয়ত্তাধীন হইয়াছে, অথবা করিলেই হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও ভারতবর্ষের ঐ সকল ভাগে উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিবন্ধক আছে। প্রথমতঃ ঐ সকল ভাগ একেবারে নিষ্প্রজ অথবা অস্বামিক নহে। দ্বিতীয়তঃ গ্রেটব্রিটন এবং আয়র্লণ্ড হইতে প্রতিবৎসর যে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার লোক দেশের বাহির হইয়া যায়, তাহার অধিকাংশ ইউনাইটেড দেশে এবং অল্প লোকমাত্র ইংরাজের নিজের অধিকারে গমন করে। ভারতবর্ষে যে দুই হাজার লোক বর্ষে বর্ষে আইসে তাহারা প্রায় সকলেই স্বদেশে ফিরিয়া যায়। সুতরাং যত কাল ইউনাইটেড দেশের এবং তাহার পরে অষ্ট্রেলিয়া, কানেডা, কেপকলনি মধ্য-আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে উপনিবেশের অধিকতর সুবিধা থাকিবে, তত দিন ভারতবর্ষের পার্ব্বতীয় ভাগে স্বেচ্ছাতঃ আসিবার জন্য ইংরাজ ঔপনিবেশিক অধিক যুটিবে না। পৃথিবীর যত স্থানে

ইংরাজের উপনিবেশ স্থাপিত হইতে পারে বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহার শতকরা অশীতি ভাগ ইংরাজেরা ঐ কাজে লাগাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সেই উপনিবেশ-যোগ্য স্থান সমস্তে যাইবার সুবিধা থাকিতে ভারতবর্ষের পার্ব্বতীয় ভাগে ইংরাজের উপনিবেশের চেষ্টা হইবার সম্ভাবনা অল্প।

কিন্তু ইংরাজের প্রতাপ কি চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে?—এই বিচার দ্বিতীয় সূত্রেরই অন্তর্নিবিষ্ট। সাম্রাজ্য-শক্তির লোপ বা খর্ব্বতা হইলে উপনিবেশাদির সর্জ্জন, পালন এবং রক্ষণ হয় না। তবে ইংরাজের সাম্রাজ্যশক্তি যদি চিরস্থায়ী হয়, তাহা হইলেই ভারতবর্ষের পার্ব্বত্য প্রদেশে কোন কালে ইংরাজের উপনিবেশ স্থাপিত হইলেও হইতে পারে।

সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, কোন জাতি কর্তৃক সংস্থাপিত কোন সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হয় নাই। আসিরীয় সাম্রাজ্য ১৬০৯ বর্ষ ছিল, মীড-পারস্য ৪০০ বর্ষ, গ্রীক ১৪০০ বর্ষ, রোমরুম ২২০০ বর্ষ, মুসলমানের ভারত সাম্রাজ্য ৫৫০ বর্ষ, আরব সাম্রাজ্য ৩০০ বর্ষ, স্পেনীয় ১১০০ বর্ষ, পোর্টুগীজ ৭০০ বর্ষ। ইহাদিগের প্রথম ছয়টী একেবারেই গিয়াছে। শেষের দুইটীরও সাম্রাজ্য-শক্তি খর্ব্ব হইয়াছে, তবে রাজ্যের স্বাধীনতা এবং কতক অধিকারেরও লোপ হয় নাই।

কিন্তু পূর্ব্বকার সাম্রাজ্যগুলি গিয়াছে বলিয়াই কি মনে করিতে হইবে যে, কোন সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হইতে পারে না? সাংদৃষ্টিক-ন্যায়ের বল কি এত অধিক যে, তাহারই উপর অনুমানের একান্ত নির্ভর হইতে পারে? প্রাণি শরীরের পক্ষে বলা গিয়া থাকে, জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে। এ কথাটী সম্পূর্ণ সাংদৃষ্টিক-ন্যায় মূলক হইলেও ইহা সিদ্ধান্ত বাক্য বলিয়া সম্যক্ পরিগৃহীত হয় নাই। কারণ, অনেকানেক লোক ঐ চিরপ্রচলিত বাক্য সত্ত্বেও চিরজীবী হইবার উপায় আবিষ্করণের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন এবং অনেকানেক সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতও মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতাটী কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বিচারের উপর কোন প্রকারে স্থাপিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই বিচারাবলম্বন পূর্ব্বক কেহ কেহ

বলিয়াছেন যে, প্রাণি-শরীরের বৃদ্ধির সহিত সেই শরীরের ভার তাহার ঘণ ফলের (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য বিস্তার এবং বেধের গুণ-ফলের) অনুসারে বর্দ্ধিত হয় এবং উহার স্থিতি-স্থাপক শক্তিপেশী নিচয় বর্গফলের (অর্থাৎ দৈর্ঘ্য এবং বিস্তারের গুণ-ফলের) অনুসারে বাড়ে। অতএব দেহের ভার যত বাড়ে বল তেমন বাড়ে না। এই জন্য দেহের পাত হয়।

অতএব সাম্রাজ্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, সাংদৃষ্টিক-মূলক এই কথাটীর প্রতিপোষক কোন স্বতন্ত্র যুক্তি আছে কি না, তাহা বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। সেরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, সাম্রাজ্য বিনাশের কারণ তিনরূপ হইতে পারে। এক এই—সাম্রাজ্য বৃদ্ধিতে ধনের বৃদ্ধি; ধনের বৃদ্ধিতে সুখের অভিলাষ; সুখাভিলাষে আলস্য-প্রবণতা এবং আলস্য হইতে দৌর্ব্বল্য; এবং দৌর্ব্বল্য হইতে বিনাশ। আসিরীয়া, পারস্য, গ্রীক, প্রভৃতি সাম্রাজ্য মুখ্যতঃ এই কারণেই গিয়াছে।

সাম্রাজ্যলোপের দ্বিতীয় সূত্র এই—সাম্রাজ্য অতি বিস্তৃত হইলে তাহার বিভিন্ন ভাগ নিবাসী জনগণের স্বার্থ বিভিন্ন হইয়া উঠে। স্বার্থ-ভেদে ঐক্যমত্য থাকে না—বিভিন্ন ভাগের পরস্পর বিবাদ হয়। সেই বিবাদ শুদ্ধ বল প্রয়োগে মিটে না। সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আমেরিকার বিচ্ছেদে ইংলণ্ডের একটা প্রভূত অধিকার হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ড সে আঘাত সামলাইয়াছেন—ঐরূপ অপর উপ-নিবেশের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলেও আবার সামলাইতে পারিবেন। কিন্তু স্পেন তাহা পারেন নাই।

সাম্রাজ্য পতনের তৃতীয় সূত্র এই—সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়া যে জাতি বাড়িয়া উঠে, সে অপর কোন প্রবলতর জাতি কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হয়; সুতরাং তাহার সাম্রাজ্যাধিকার থাকে না। বেনিস্ এবং জেনোয়া এইরূপে স্পেন এবং পর্টুগাল কর্ত্তৃক, স্পেন এবং পোর্টুগাল, হলণ্ড কর্ত্তৃক এবং হলণ্ড ইংলণ্ড কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়া বিলুপ্ত প্রভ হইয়াছে।

ইংলণ্ডের প্রতি উল্লিখিত তিনটী সূত্রের প্রয়োগ করিয়া দেখা যায়

যে (১) ইংলণ্ডের ধন অতি-বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ধনের প্রতি ইং-রাজের মায়াও বাড়িয়াছে। কিন্তু ইংরাজ খুব বাবু হয়েন নাই। আয়াস স্বীকারেই তাঁহার আনন্দানুভব হয়। অক্‌সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজের ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা পড়া শুনায় তেমন মনোযোগ না করেন, তাঁহারাও দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটী, নৌকাবাহন প্রভৃতি পরিশ্রমের কার্য্যে বিলক্ষণ পটু হইয়া থাকেন। এখানেও দেখা যায় জজ মাজিষ্ট্রেটেরা আপনাপন কাজ ভাল করিয়া করুন বা না করুন, কিন্তু টেনিস ক্রিকেট, ক্রোকে, বাড্‌মিণ্টন এবং শিকার খেলায় খুব মন দেন। (২) ইংলেণ্ড আপনার উপনিবেশিকদিগকে চিরকালই স্ববশে রাখিতে পারি-বেন এমত সম্ভাবনা অতি বিরল। উহারা যে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে, মার্কিণেরাই তাহার লক্ষণ দেখাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু মার্কিনেরা ছাড়িয়া যাওয়ায় ইংলণ্ডের কি কিছু ক্ষতি হইয়াছে? মার্কিনেরা হাত ছাড়া হইবার পরেইত প্রথম বোনাপার্টি ইংলণ্ডের নিকট পরাভূত হইয়াছিলেন। (৩) জর্ম্মণি এবং রুসিয়া যথেষ্ট বাড়িতেছে বটে। কিন্তু জর্ম্মণি, যত দিন হলণ্ড এবং ডেনমার্ককে আত্মসাৎ না করিবে ততদিন ইংলণ্ডের সমকক্ষতাও প্রাপ্ত হইবে না। রুসিয়ারও তুর্কি এবং আফগানকে স্ববশ করা চাই, তবে ইংলণ্ডের প্রতিযোগী হইতে পারিবে। সে সকলের অনেক বিলম্ব। ফ্রান্স, জর্ম্মণির বৃদ্ধি নিবারণ করিবে এবং জর্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়া মিলিত হইয়া রুসিয়াকে বাড়িতে দিবে না। তবেই অপর কেহ বড় হইয়া ইংলণ্ডকে খাট করিতে পারিবে না। সম্প্রতি ইং-লণ্ডের শিল্পজাত ইউরোপীয় অপরাপর দেশে পূর্ব্বের ন্যায় অধিক যাইতেছে না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় অনেকানেক দেশে ইংলণ্ডের শিল্পজাতের আমদানিই অধিক হইয়া উঠিতেছে। অতএব ইংলণ্ডের ধন এবং সাম্রাজ্য-শক্তি যেমন বর্দ্ধিত হইয়াছে, ভবিষ্যতেও যে তেমনি থাকিবে না, ইহা বলিবার কোন হেতুই এ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না।

যদি ইংলণ্ডের বল চিরকাল অটুট থাকে এবং তাঁহার ভারতবর্ষ

অধিকার কখন হস্তচ্যুত না হয়,’ তাহা হইলে ভারতবর্ষ দেশ অতি নিবিড় প্রজ বলিয়া সামান্যতঃ ইংরাজের উপনিবেশিত না হইয়াও একটী বিশেষ প্রকারে ইংরাজের উপনিবেশিতপ্রায় হইতে পারে। অর্থাৎ এ দেশে ইংরাজ শ্রমজীবীদিগের প্রবেশ না হইয়া এখানকার প্রধান প্রধান রাজপদ সমস্ত যেমন ইংরাজের করকবলিত হইয়াছে, তেমনি ক্রমে ক্রমে জমিদারী স্বত্ব, শিল্পালয়ের মূলধনিকতা, এবং অপর সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তৃত্ব ইংরাজের আয়ত্ত হইয়া যাইতে পারে। দেশীয়েরা ইংরাজ ভূস্বামির প্রজা, ইংরাজ মনিবের কর্ম্মকর এবং ইংরাজনেতার অধীন লোক মাত্র হইয়া থাকিতে পারেন। বস্তুতঃ এখন হইতেই তাহার কতকটা সূত্রপাত হইয়া যাইতেছে। চা-কর, নীল-কর, এবং অনেক স্থলে ইজারদার আর কোথাও কোথাও জমীদার রূপেও ইংরাজ ভারতবর্ষে ভূস্বামিত্ব লাভ করিয়াছেন। জমিদারী, বাটী, বাগান, প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়াও ইংরাজেরা টাকা ধার দিতেছেন। এই সে দিন বেতিয়ার মহারাজা ইংলণ্ড হইতে ৫ লক্ষ পৌণ্ড ধার পাইয়াছেন। তুলার-কল পাটের কল, গালার কারখানা, রেসমের কুঠি বহু পরিমাণেই ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে। দেশের অন্তর্বাণিজ্যও ক্রমশঃইংরাজের হাতে যাইতেছে। সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমুদায় সুনাব্য নদ নদীতে যে সকল বাষ্পীয় পোত নিরন্তর গতি বিধি করিতেছে, সকল গুলিই ইংরাজ বণিকের সম্পত্তি। দেশীয় দিগের হস্ত হইতে সকল অধিকার, ক্ষমতা এবং ব্যবসায় ক্রমে ক্রমে খসিয়া যাইবার সম্ভাবনা। ইংলণ্ডীয় শিল্পজাতের আমদানিতে দেশীয় শিল্পের লোপ হইয়া কৃষিজীবীর সংখ্যা বাড়িতেছে, পূর্ব্বোক্তরূপ অধিকারাদির লোপে তাহা আরও বর্দ্ধিত হইতে পারে। সাম্রাজ্য বল ত্রিবিধ (১) রাজনৈতিক বল, (২) সৈনিক বল, (৩) ধন-বল। ভারতবর্ষ প্রথম দুইটি দ্বারা সন্দষ্ট হইয়া ক্ষতশির হইয়াছে, তৃতীয় বলটী ক্রমে ক্রমে ইহাকে দৃঢ়তররূপে বাঁধিবার নিমিত্ত প্রসারিত হইতেছে। কিন্তু ভারতবাসীদিগের

মধ্যে ধনশালী লোকের সংখ্যা একান্ত ন্যূন হইয়া গেলেও উহাদিগের ধর্ম্মলোপ না হইলে সমাজের স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইবে না।

ভবিষ্য-বিচার—ভারতবর্ষের কথা।

(ধর্ম্মপ্রণালী বিষয়ক।)

পণ্ডিতেরা কোন মানবিক ব্যাপার সম্বন্ধেই উৎকর্ষ এবং অপকর্ষ, উন্নতি এবং অবনতি, এই শব্দগুলি যথাশ্রুত মুখ্যার্থে প্রয়োগ করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে, যাহা আপনার সময়ের উপযোগী তাহাই উৎকৃষ্ট বা উন্নত, এবং যাহা সময়ের অনুপযোগী তাহাই অপকৃষ্ট বা অবনত। এই গৌণার্থের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি না রাখায় সাধারণ লোকের মধ্যে দুই প্রকারের ভ্রম জন্মে। এক যাহা পূর্ব্বগত তাহাই অপকৃষ্ট বলিয়া নিন্দিত, অথবা যাহা পরবর্ত্তী তাহাই হেয় বলিয়া ঘৃণিত হয়। প্রথমটীর ফল অযথানুকরণ এবং দ্বিতীয়ের ফল গোঁড়ামি। প্রথমটী হইতে পুরাতনের প্রতি বিরাগ এবং দ্বিতীয়টী হইতে নূতনের প্রতি অযত্ন সম্ভূত হয়। প্রথমটী বলে যাহা নূতন তাহাই আসুক, পুরাতনের থাকিয়া কাজ নাই, দ্বিতীয়টী বলে যাহা যেমন আছে, তাহা ঠিক সেইরূপই থাকুক।

এ দুইটী ভাব দুইটী উপধর্ম্মস্বরূপ। প্রকৃত ধর্ম্ম ইহাদের কোন-টীতেই নাই। যাহা উপযোগী, অর্থাৎ আত্মরক্ষার অনুকূল পরিবর্ত্ত, তাহাই হউক—এই ভাবই ধর্ম্মভাব। এই ধর্ম্মভাবের প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া এবং 'উন্নতি' 'উৎকর্ষ' প্রভৃতি শব্দগুলির প্রকৃতার্থ যে 'উপযোগিতা' মাত্র, ইহাই স্মরণ রাখিয়া, ইংরাজ আধিপত্যে ভারত সমাজে কিরূপ পরিবর্ত্তের উন্মুখতা জন্মিতেছে, তাহা বিচার পূর্ব্বক বুঝা

আবশ্যক। প্রথমতঃ সর্ব্বপ্রধান সামাজিক বিষয় অর্থাৎ ধর্ম্মপ্রণালী লইয়া সেই বিচারে প্রবৃত্ত হইব।

ধর্ম্ম তিনটী বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত বলিয়া অনুভূত হয়। যেমন দেহের শিরোভাগ, মধ্যভাগ, এবং হস্তপদাদি অঙ্গ আছে, তেমনি ধর্ম্মের শিরোভাগ, তাহার মতবাদ লইয়া; মধ্যভাগ, নীতিব্যবহার লইয়া; এবং হস্তপদাদি, আচার-প্রণালী লইয়া সংঘটিত মনে করা যাইতে পারে। উহারা পরস্পর পৃথক্ হইয়াও সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ নয়। যেমন শিরোদেশ হইতেই অপর দুই ভাগের বল, তেমনি অপর দুই ভাগে বিশেষ বিশেষ কার্য্য না হইলেও শিরোদেশে বলসঞ্চার হয় না। ধর্ম্মের শিরোভাগ বা মতবাদ, দর্শনাত্মক-জ্ঞান-কাণ্ড। জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে মনুষ্যের মন যাহা কিছু জানিতে এবং বুঝিতে চায়, এই ভাগ তাহা জানাইয়া এবং বুঝাইয়া দেয়। মনুষ্য আপনাকে কিরূপে রাখিবে এবং অপরের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা নৈতিক উপদেশের পালনে শিক্ষিত হয় এবং যদ্দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারী হইতে পারিবে আচারকাণ্ডে তাহার অভ্যাসের উপায় বিবৃত হয়। এই রূপে ত্রিধাবিভাজিত আর্য্যধর্ম্মের কোন প্রকার পরিবর্ত্ত হইতে পারে কি না, তাহাই ক্রমশঃ দেখা যাইবে।

প্রথমতঃ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তের কয়েকটী সূত্র নির্দ্ধারণ করা যাইতেছে।

(১) ব্যাপকতর ধর্ম্মের আবির্ভাবে ব্যাপ্য-ধর্ম্ম তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। মনে কর, কোন বালক বা যুবা দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে যে, কয়েকটী বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান মাত্রেই ধর্ম্মের চরম, তাহাকে যদি অপর ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, ঐ সকল অনুষ্ঠানমাত্রেই ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম জাগতিক সমুদায় গূঢ় প্রশ্নের সদুত্তর দেয় এবং তাহার আদেশ সকল কার্য্যেই যাবজ্জীবন পালনীয়, তাহা হইলে সে যাহাকে আপনার ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত, তাহা অপেক্ষা উদারতর ভাবে মগ্ন হইয়া পূর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ এবং নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে।

(২) বিজেতৃদিগের নিয়ত পীড়নেও ধর্ম্ম পরিবর্ত্ত হইয়া থাকে। যদি একজাতি অপর জাতীয় লোক কর্ত্তৃক বিজিত হয় এবং বিজয়ীরা আপনাদের ধর্ম্মটীকে বিজিতদিগের মধ্যে প্রচালিত করিবার জন্য নিয়ত যত্ন করেন, তাহা হইলে বিজিত জাতির ধর্ম্ম পরিত্যক্ত হয় অথবা বিজিতেরা নিঃশেষিত হইয়া যায়। মিসর, পারস্য, প্রভৃতি দেশে এইরূপে মুসলমান ধর্ম্মের এবং দক্ষিণ-আমেরিকায় খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

(৩) ধর্ম্মের আদান প্রদান হয়। অর্থাৎ যদি দুইটী জাতির ঘনিষ্ঠ মিশ্রণ ঘটে, তবে উভয়ের ধর্ম্মও সম্মিলিত হইয়া একরূপ হইয়া যায়। রোমায় এবং গ্রীকদিগের এবং অপরাপর দেবপূজাপরায়ণ জাতিদিগের মধ্যে এইরূপ হইয়াছে।

(৪) কোথাও কোথাও দুইটী বিভিন্ন ধর্ম্মের সংস্রবে একটী নূতন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। যদি দুইটী জাতি বুদ্ধিবিদ্যায় কতকটা সমকক্ষ হয় এবং উভয়ের মধ্যেই জ্ঞানচর্চ্চা সমভাবে প্রচলৎ থাকে, তাহা হইলে দুইটী হইতেই কিছু কিছু মতবাদ এবং আচার পরিগৃহীত হইয়া নূতন পন্থাটী জন্মে। ভারতবর্ষের নানক পন্থী, কবীর পন্থী, গোরক্ষ পন্থী, দাদু পন্থী, প্রভৃতি পন্থ সকল মুসলমান এবং হিন্দু উভয় ধর্ম্মের সম্মিলনসম্ভূত।

(৫) অধিকতর বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সংখ্যায় বৃহত্তর জাতির সহিত সংস্রব ঘটিলে তাহার ধর্ম্ম, অপেক্ষাকৃত স্বল্পজ্ঞ এবং ক্ষুদ্র জাতি কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হয়। সিংহল, ব্রহ্ম, তিব্বত দেশাদিতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার, এবং সুইডেন নরওয়ে প্রভৃতিতে খৃষ্টধর্ম্মের আবির্ভাব, এই সূত্রে হইয়াছিল, বলা যায়।

(৬) দেশের ভিন্নতা হইলেও ধর্ম্ম ভাবে ঈষৎ ভিন্নতা জন্মিবার সম্ভাবনা। যদি কোন জাতি আপানাদের পূর্ব্বাবাস পরিত্যাগ করিয়া তাহা হইতে ভিন্ন প্রকৃতিক দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে জগতের মূর্ত্তি তাহাদের চক্ষে পূর্ব্ব হইতে ভিন্নরূপ দেখায় এবং তাহারা পুরুষ পরম্পরাক্রমে যে দেশে আসিয়াছে তাহার উপযোগী সুতরাং তদ্দেশ প্রচলিত ধর্ম্মভাব

গ্রহণ করিতে উন্মুখ হয়। রোম ধ্বংসকারী বর্ব্বর জাতীয়েরা যে, অতি সহজেই খৃষ্টান হইয়াছিল, আবাস পরিবর্ত্ত তাহার অন্যতম কারণ।

এই ছয়টী স্থূল স্থূল সূত্রের মধ্যে কোনটীর প্রয়োগে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় কি না? প্রথমতঃ ধর্ম্মামতবাদ সম্বন্ধে বলা যায়—

(১) আর্য্যধর্ম্মের অপেক্ষা উদারতর ধর্ম্ম মনুষ্যের মনে উদিত হয় নাই—হইতেও পারে না। এ ধর্ম্ম কোন একটী বাক্যে অথবা কোন ঘটনা বিশেষের প্রতি প্রতীতি খ্যাপনে অথবা কোন বিশেষ মতবাদে সম্বন্ধ নহে। ইহার প্রদত্ত শিক্ষা, অধিকারিভেদে পৃথিবীর সকল জাতির উপযোগী হইতে পারে। ইহা অপর কোন ধর্ম্মেরই ব্যাপ্য বস্তু নয়। ইহাতে ভীতি-প্রণোদিত বর্ব্বর জাতীয়দিগের অর্চ্চন বন্দনাদি, বশ্যতা-প্রবণ এবং সম্মিলনপটু যুদ্ধ-কুশল লোকদিগের দাস্য সখ্যাদি, ভক্তিপরিষিক্ত ভাবুক জনগণের প্রেম বাৎসল্যাদি, এবং অধ্যাত্ম-দর্শনোন্মুখ মানবদিগের আত্মনিবেদন এবং অভেদ ভাবাদি, অর্থাৎ অতি নিম্ন হইতে সর্ব্বোচ্চ পর্য্যন্ত সমুদায় ধর্ম্মভাব, ইহাতে অতি প্রোজ্জ্বল রূপেই বিদ্যমান। আর্য্য-ধর্ম্মে যাহা নাই, তাহা অপর কোথাও নাই।

(২) ভারতবর্ষের অধিপতি ইংরাজ। ইংরাজ পরধর্ম্মের পীড়ন করেন না। তিনি বরং স্বদেশ মধ্যে কখন কখন ভিন্ন সাম্প্রদায়িকের প্রতি অযথাচরণ করিয়াছেন, কিন্তু বিদেশে আসিয়া তাহা কখনই করেন নাই। আর ভারতবর্ষে প্রজার ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া আছেন, সেই প্রতিজ্ঞা সম্যক্‌রূপেই পালন করিয়া চলিতেছেন বলা যায়।

(৩) ইংরাজদিগের ধর্ম্মের সহিত আর্য্যধর্ম্মের কিছু সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজ পাদ্রি সাহেবদিগের নিরন্তর আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া ভারতবর্ষীয়গণ আর্য্যধর্ম্মের সারভূত কথা সকলের সমধিক চর্চ্চা করিতেছেন। আর্য্যধর্ম্মের যে ভাগটী খৃষ্টধর্ম্মের অনুরূপ, সেই ভাগই সম্প্রতি বিশেষরূপে

প্রকটিত হইতেছে। অর্থাৎ দ্বৈতবাদের অনুরূপ ভারতবর্ষের যে বৈষ্ণবতন্ত্রতা তাহাই এক্ষণে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। পক্ষান্তরে জর্ম্মণ জাতীয় পণ্ডিতেরা কেহ স্পষ্টতঃ কেহ বা অস্পষ্টতঃ স্বীকার করেন যে, তাঁহাদের দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষীয় মতবাদ হইতে ভিন্ন নয়। ইংরাজেরাও ক্রমশঃ ঐ জর্ম্মণ মতবাদে দীক্ষিত হইতেছেন এবং পূর্ব্বে খৃষ্টান-ধর্ম্মের যেরূপ সঙ্কীর্ণভাবে ব্যাখ্যা করিতেন, তাহা ছাড়িয়া দিয়া উহাতে আর্য্যধর্ম্ম-সম্মত উদারতর ব্যাখ্যা প্রবিষ্ট করিতেছেন। কালে যখন জর্ম্মণদিগের মতবাদ অধিকতর প্রচলিত হইয়া উহা পাদ্রি সাহেবদিগের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে নূতন জিনিস বলিয়া প্রদত্ত হইবে, তখন আবার অদ্বৈতবাদ প্রোজ্জ্বলতর-রূপে পরিদৃষ্ট হইবে। হেগেল এবং সোপেনহোর এই দুই জন জর্ম্মণির অতি প্রধান দার্শনিক। ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্ম্মা মতবাদ সম্বন্ধে হেগেল বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীরা প্রকৃত জ্ঞানই লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা বিচারপূর্ব্বক করিতে পারে নাই—আন্দাজিতে করিয়াছিল মাত্র! সোপেন্‌হোর বলিয়াছেন যে, আমি যাহা যাহা বলিলাম তাহার সহিত বৈদিক উপনিষদ সমস্তের ঘনিষ্ঠ সম্মিলন আছে; কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি উপনিষদ গ্রন্থ হইতে নিজ মতবাদ গ্রহণ করিয়াছি। তিনি একথাও বলিয়াছেন যে, ইউরোপে সংস্কৃতের চর্চ্চা এখনকার অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত এবং গভীরতর হইলে, গ্রীকদিগের দর্শন-শাস্ত্রাদি পাঠে ইউরোপ যেমন একবার জাগ্রৎ হইয়াছিল, আবার সেইরূপ অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর জাগ্রৎ ভাব ধারণ করিবে। ফলতঃ অতীন্দ্রিয় ভাবের একান্ত বিরোধী যে সংকীর্ণ জড়বাদ এক্ষণে ইয়ুরোপে দেখা দিয়াছে তাহা ইয়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিকেরা স্থায়ীবস্তু বলিয়া মনে করেন না এবং ঐ ইয়ুরোপীয় জড়বাদ এদেশে আসিলেও ভারতবর্ষের প্রশস্ত অদ্বৈতবাদ দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়াই যাইবে। অতএব ইউরোপীয় সংস্রবে এবং ইংরাজ আধিপত্যে আমাদের ধর্ম্ম্যমতবাদের কোন মৌলিক পরিবর্ত্ত সংঘটন হইতে পারে না।

(৪) যদি ভারতবর্ষে সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চ্চা বলবৎ থাকে এবং এথানকার অধিবাসিগণ একেবারে বিদ্যাবিহীন না হইয়া পড়ে, তাহা হইলে মুসলমানদিগের অধিকার কালেও যেমন লোকে ফারসি আরবি পড়িয়া মুসলমান হয় নাই, তেমনি ইংরাজাধিকারে ইংরাজী পড়িয়াও সাধারণে ধর্ম্মচ্যুত হইবে না। নূতন ব্রাহ্মদিগের ন্যায় দুই একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মধ্যে মধ্যে দেখা দিবে মাত্র। ফলতঃ যেমন মুসলমানেরাই আর্য্যমতবাদের স্বাদগ্রাহী হইতেছিল, ইংরাজও ক্রমে তাহাই হইবেন।

(৫) ভারতবাসী সংখ্যায় অল্প নয়। প্রত্যুত পৃথিবীর সর্ব্বত্র লইয়া যত ইংরাজ আছেন, ভারতবাসীর সংখ্যা তাহার তিন গুণ অধিক। সম্প্রতি বিদ্যাবত্তাতে ভারতবাসী ন্যূন হইয়া আছে। কিন্তু যথন প্রাচীন সংস্কৃতের প্রতি ইহাদের শ্রদ্ধা রহিয়াছে এবং ইহারা আপনাদের চলিত ভাষাগুলিতে যত্নপূর্ব্বক সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেছে, তথন যে ইংরাজদিগের অপেক্ষা নিতান্তই স্বল্পবিদ্য হইয়া থাকিবে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। অপর, ইউরোপীয় ধর্ম্মমতবাদ যে অভিমুখে আসিতেছে, যথন আমরা সেই দিকেই পূর্ব্ব হইতে আসিয়া আছি, তথন আপনাদের রক্ষার উপযোগী কোন মৌলিক পরিবর্ত্তই প্রয়োজনীয় হইতে পারে না অর্থাৎ আর্য্যধর্ম্মের পরিবর্ত্ত সাধনে উন্নতির বা উপযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

(৬) ভারতবর্ষবাসীরা স্বদেশেই আছেন, এবং স্বদেশেইই থাকিবেন। আর যদিই স্বদেশ হইতে গিয়া অপর কোথাও বাস করেন, তাহা হইলেও তথাকার বাহ্যপ্রকৃতি সমস্ত পৃথিবীর প্রতিরূপ স্বরূপ ভারতবর্ষ হইতে সমুৎপন্ন ব্যাপক ধর্ম্ম ভাবের বিসদৃশ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়, নীতিবাদ। পূর্ব্বকালে অপরাপর জাতীয় লোকে ভারতবাসীকে কেমন সুনীতিসম্পন্ন এবং একান্ত সত্যপরায়ণ বলিয়া বর্ণণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার উল্লেথ করা নিষ্প্রয়োজনীয়। অনধিক কালগত হইল, মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর মন্‌রো সাহেব স্পষ্টাক্ষরে লিথিয়াছেন যে, যদি ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশের নীতি বিষয়ক বাণিজ্য

চলে, অর্থাৎ ভারতবর্ষের নীতি সেই দেশে যায় এবং সে দেশের নীতি ভারতবর্ষে আইসে, তবে ইউরোপীয় দেশটী আমদানি দ্রব্যগুলি পাইয়া যৎপরোনাস্তি লাভবান হয়। কিন্তু আজি কালি আর সে ভাবের কথা নাই। এখন ভারতবাসীকে দুর্ব্বিনীত বলাই একটী অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়মের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে, এবং অভ্রান্ত-অন্তর্দৃষ্টি, শান্ত-স্বভাব, এবং পূর্ণতাভিলাষী ভারত-সন্তান সহজেই আপনার অসম্পূর্ণতা উপলব্ধ করিয়া আপনার প্রতি আরোপিত সকল ত্রুটিই স্বীকার করিয়া লইতেছেন; অন্যের সহিত তুলনায় তাঁহার নিজের যে উৎকর্ষ প্রমাণিত হইতে পারে, অমানিত্বাদিগুণ বশতঃ তিনি সে তুলনায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

অনেক জাতির শাস্ত্রেই ধর্ম্ম দশ-লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর্য্যশাস্ত্রেও ঐরূপ অনেকানেক উক্তি আছে। মনু বলেন—

ধৃতিঃক্ষমা দমোস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥

ধৈর্য্য, ক্ষমা, দম, অচৌর্য্য, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মলক্ষণ।

অপর কোন জাতিরই মধ্যে শান্তি দৃঢ়তা এবং পবিত্রতা সাধনের এমত উচ্চ এবং কার্য্যকারী উপায় সকল কথিত হয় নাই। প্রত্যুত অপর কাহার বর্ণিত ধর্ম্মলক্ষণ ইহার সহিত তুলিত হইতেই পারে না।

লোকের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে "অমানিত্বমদম্ভিত্ব মহিংসাক্ষান্তিরার্জ্জবং" এই কয়েকটী শব্দেই সমস্ত সার কথা রহিয়াছে।

লোকের প্রতি মনের ভাব কেমন হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধেও সারাৎসার বলা হইয়াছে, যথা—

"পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা।
আত্মবদ্বর্ত্তিতব্যংহিদয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা।

অন্যের প্রতি, বন্ধুবর্গের প্রতি, মিত্রের প্রতি, দ্বেষ্টার প্রতি, সর্ব্বদা আত্মবদ্-

ব্যবহার করিবে, ইহাই দয়াধর্ম্ম।' আর্য্য-নীতির আরও একটী উচ্চতম সোপান আছে। তাহা এই—

"সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমংপশ্যন্ আত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি।

বস্তুতঃ আর্য্যনীতি শাস্ত্র প্রকৃত বস্তু প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে জ্ঞানকাণ্ডের সহিত অভেদ হইয়া আত্মপর বোধটীকেই থাকিতে দেয় না—এই জন্য ইহাতে সাম্প্রদায়িক ভাব নাই। এই কারণে বিদ্বেষ্টৃচক্ষে ইহাতে একটী প্রকাণ্ড ত্রুটি লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যুত সেই একমাত্র ছিদ্র দ্বারেই ভারতবর্ষে যাবতীয় ধর্ম্মবিপ্লবের স্রোত বহিয়া আসিয়াছে। প্রথমে বৌদ্ধই ঐ পথ দেখাইয়া দেন। তিনি "সংঘ" বা আত্মসম্প্রদায়কে নিরতিশয় ভক্তি এবং প্রীতি করিতে শিক্ষা দেন। তাহার পর, যতগুলি "পন্থ" মুসলমানদিগের সময়ে আর্য্যধর্ম্ম হইতে পৃথগ্‌ভূতরূপে উত্থিত হইয়া ক্রমে উহাতেই লীন হইয়া গিয়াছে, তাহারাও মুসলমান ধর্ম্ম হইতে শিখিয়া আপনাপন সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেমিক হইতে উপদেশ দিয়াছিল। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও উহাদিগেরই অন্যতম।

যাহা হউক, বৌদ্ধবাদ, 'পন্থ'বাদ এবং বৈষ্ণবতা ভারতবর্ষে প্রাদুর্ভূত হওয়াতেই এখানকার লোকের মনে উহাদিগের উপদিষ্ট সাম্প্রদায়িক-সহানুভূতি এবং প্রেম, প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন সমস্ত ভারতসমাজে দৃঢ়তর একতার প্রবর্ত্তন ও সম্বর্দ্ধন অর্থাৎ ভারতবাসীমাত্রের ঘনিষ্ঠতর সম্মিলন ইংরাজের উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত প্রভাবে হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়—আচার। আমাদিগের আচার প্রণালীর কোন অংশ পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক কি না? এই প্রশ্নের উত্তরদানে প্রবৃত্ত হইলে আচারের সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি কিরূপ তাহা স্মরণ করিতে হয়। শাস্ত্র বলেন—

"আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারা দীপ্সতা প্রজা।
আচারাদ্ধন মক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণং॥"

আচার হইতে আয়ুষ্মত্তা, অভীষ্টরূপ সন্তান, ধন এবং অক্ষয়ভাব লাভ হয়। আচারে দুর্লক্ষণের নাশ হয়।

অতএব আচারের সাক্ষাৎ ফল ঐহিক। সুতরাং উহা মনুষ্যের ভূয়োদর্শন বা বিজ্ঞানের সহিত অসম্পৃক্ত নয়, অর্থাৎ প্রকৃত অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞান যাহা বলিবে, প্রকৃত সদাচারও তাহা হইতে ভিন্ন হইবে না। মনুসংহিতায় ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার প্রকরণের প্রারম্ভেই নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটী আছে,—

এবং যথোক্তং বিপ্রাণাং স্বধর্ম্ম মনুতিষ্ঠতাং।
কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাং প্রভো॥

হে প্রভো! আপনি যেরূপ বলিলেন, সেইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের (অকাল) মৃত্যু ঘটনা হয় কেন?

এই প্রশ্নের উত্তর বাক্যে বলা হইতেছে—

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্যচ বর্জনাৎ।
আলস্যাৎ অন্নদোষাচ্চ মৃত্যু র্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥

বেদের অনভ্যাস বশতঃ, আচারের বর্জন নিমিত্ত, আলস্য দোষ হেতু এবং ভোজন দোষ প্রযুক্ত ব্রাহ্মণদিগের (অকাল) মৃত্যু ঘটনা হয়।

অতএব ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচারের প্রকৃত কারণ শরীরের এবং মনের স্বাস্থ্য সংরক্ষণ—তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এই ভাবটী সুব্যক্ত হইয়াছে।

আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখ প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥

আয়ুঃ, উৎসাহ, বল, স্বাস্থ্য, সুখ এবং রুচি-বৃদ্ধিকর, সরস, সস্নেহ, স্থায়ী এবং তৃপ্তি-জনক ভক্ষ্য দ্রব্য সাত্ত্বিক স্বভাব লোকের প্রিয় হয়।

অতএব কোন্ দ্রব্য খাইতে আছে আর কোন্ দ্রব্য খাইতে নাই, তাহা নির্ণয় করিবার শাস্ত্র সম্মত মূল-সূত্র শরীরের এবং মনের স্বাস্থ্য রক্ষারই সূত্র—দীর্ঘায়ু লাভের সূত্র। ঐ মূল সূত্রের যত শাখা পল্লব

আছে, সেগুলির অধিকাংশই এতদ্দেশে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের উপযোগী নিয়ম বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। সে নিয়মগুলি সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারদিগের অভিজ্ঞতা সম্ভূত; সুতরাং তাচ্ছল্যের বস্তু নহে। আজি কালি ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল নিয়ম ভঙ্গ করিয়া চলিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রায়ই স্বাস্থ্য হারাইতেছেন এবং স্বল্পায়ুঃ হইতেছেন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষে যে প্রকার আহার শাস্ত্রকারদিগের প্রশংসিত, সেই প্রকার আহারই প্রচলিত থাকিবে, কারণ তাহাতেই রক্ষার উপায়, তাহাই আমাদের উপযোগী। কিন্তু বিদেশগত হিন্দু সন্তানের আহার কিছু ভিন্নরূপ হইলে ততটা দোষ না হইতেও পারে। ধাতুভেদে এবং বয়োভেদে এবং ঋতু ভেদে আহারের অবান্তর ভেদ হওয়া অশাস্ত্রীয় বা অযৌক্তিক নহে।

আচারের অপরাপর অঙ্গের এই কয়েকটী প্রধান (১) দশবিধ সংস্কার (২) ব্রতানুষ্ঠান (৩) আশ্রম ভেদ রক্ষা (৪) শ্রাদ্ধপূজাদি ক্রিয়া।

এগুলি অনেক লুপ্ত হইয়াছে। সাগ্নিকতা পূর্ব্বেই গিয়াছিল। বৌদ্ধের প্রাবল্য হইতে আচার লোপ আরম্ভ হইয়াছে, মুসলমানের অধিকারে আরও বাড়িয়াছে, এখনও বাড়িতেছে। কিন্তু আচার লোপ হইবার কারণ, সকল আচারের অনুপযোগিতা নহে। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রচার ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া যাওয়াতেই লোকের মধ্যে আচার সম্বন্ধীয় জ্ঞানের অনেক ন্যূনতা হইয়াছে। সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে এই বঙ্গ দেশেই স্মার্ত্তশিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত আচারকাণ্ড এখনও সজীব আছে এবং এই প্রদেশেই স্মার্ত্তাচারও অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইতেছে। বাঙ্গালার জল বায়ু অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হইলেও আচার রক্ষা নিবন্ধন এ প্রদেশের লোকেরা অনেক বিষয়েই অন্য কোন প্রদেশ বাসী অপেক্ষা নিকৃষ্ট হয় নাই।

বাস্তবিক আচারটী পরমধর্ম্ম না হউক, কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষার প্রধানতম

উপায়। আচার যাওয়া ভাল নয়। যে দেশের এবং যে জাতির যে আচার, তাহার ত্যাগে তদ্দেশীয় এবং তজ্জাতীয় লোক সকল ক্ষীণ এবং অল্পায়ু হয়। রোমান কাথলিক খৃষ্টানদিগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারের অনেকানেক নিয়ম প্রচলৎ আছে। উহাঁরা তৎসমুদায় রক্ষা করিয়া ইউরোপ-প্রচলিত ধনোপার্জ্জন প্রথার সম্যক্ অনুসরণ করিতে পারেন। ইহুদীয়েরাও খুব ধনবান্ এবং নীরোগ এবং আয়ুষ্মান হয়, এবং কখন কোন দেশে আপনাদিগের জাতীয় আচার পরিত্যাগ করে না। অতএব ধনোপার্জ্জনে ব্যগ্র হইয়া এক্ষণে কেহ কেহ যেমন আচার ছাড়িতেছেন তাহা অপ্রকৃতদর্শীর কাজ।

শাস্ত্রে যে আচারের উল্লেখ আছে, তাহা বহু পরিমাণে ব্রাহ্মণদিগেরই প্রতিপাল্য। এখনও ব্রাহ্মণেরাই সেগুলি অধিক পরিমাণে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, এবং অপর সকল ভারতবাসী অপেক্ষা ব্রাহ্মণেরা যে অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট হইয়া আছেন ইহাও তাহার অন্যতম কারণ।

বস্তুতঃ আচার ধর্ম্মের শরীর। দশ সংস্কার পবিত্রতার ব্যঞ্জক। ব্রতানুষ্ঠান ইন্দ্রিয় দমনের বিকাশ। আশ্রম-ভেদ অধিকারী-ভেদ-স্বীকৃতির পরিচায়ক। এবং শ্রাদ্ধপূজাদি পূর্ব্বগতদিগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন। অতএব সমগ্র আচার লোপে নীতি লোপও অবশ্যম্ভাবী।

ভবিষ্য-বিচার—ভারতবর্ষের কথা।

(ভাষা বিষয়ক।)

পিতৃ মাতৃ হীন শিশুকে অনাথ বলে। পিতার অভাবে শিশুর রক্ষণের ব্যাঘাত হয় এবং মাতার অভাবে তাহার পোষণের ত্রুটি হয়। এই জন্য সাধারণতঃ তাদৃশাবস্থ শিশুর জীবিতাশা ন্যূন হইয়া থাকে।

মনুষ্য শিশুর পক্ষে পিতা মাতাও যাহা, মনুষ্য সমাজের পক্ষে ধর্ম্ম এবং ভাষাও তাহা। ধর্ম্ম সমাজের পিতা, ধর্ম্ম হইতে সমাজের জন্ম এবং রক্ষা, আর ভাষা সমাজের মাতা, ভাষা হইতে সমাজের স্থিতি এবং পুষ্টি হয়। ধন বল, দল-বন্ধন বল, বাণিজ্য বল, আর রাজনৈতিক স্বাধীনতা বল সকল গিয়াও সমাজ বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল লোকের ধর্ম্ম এবং ভাষা গিয়াছে, সে সকল লোকের স্বতন্ত্র সমাজ আছে, এমন কথা বলা যায় না।

দক্ষিণ-আমেরিকার অনেকগুলি দেশে সেই সকল দেশের আদিম নিবাসী ইণ্ডিয়ান লোকেরা বিদ্যমান আছে। কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্ম খৃষ্টান, এবং ভাষা স্পেনীয় অথবা পোর্টুগীজ্ হইয়া গিয়াছে; তাহাদের পূর্ব্ব ধর্ম্মও নাই, পূর্ব্ব ভাষাও নাই। ঐ সকল লোকের আত্মসমাজ সর্ব্বতোভাবেই বিলুপ্ত।

মার্কিণেরা স্বদেশ হইতে নিগ্রো জাতীয় কতকগুলি লোককে লইয়া গিয়া আফ্রিকা খণ্ডের লাইবিরিয়া নামক প্রদেশে বাস করাইয়াছেন এবং তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া লাইবিরিয়াতে আপনা-দের অনুরূপ প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত করাইয়াছেন। মার্কিণ-দিগের বড়ই আশা ছিল যে, ঐ সকল লোক আফ্রিকার মধ্যে প্রাবল্য লাভ করিবে এবং ঐ খণ্ডের অপরাপর নিগ্রো জাতীয়দিগকে সুসভ্য করিয়া তুলিবে। কিন্তু সে আশা বিফলা হইয়াছে। নিগ্রো জাতীয় ঐ লোকগুলি লাইবিরিয়ায় আসিবার পূর্ব্ব হইতেই আপনাদিগের ধর্ম্ম এবং ভাষা হারাইয়াছিল। তাহারা আর অপর নিগ্রোদিগের সহিত মিলিতে পারে না এবং অপর নিগ্রো জাতীয়েরাও আর তাহাদিগকে বিশ্বাস করে না। প্রত্যুত তাহাদিগের প্রতি নিরতিশয় সন্দেহ এবং বিদ্বেষ করে। আজি কালি সভ্যতা বা উন্নতির উপাদান বলিয়া যাহা যাহা কথিত হয়, তাহা সমুদায়ই লাইবিরিয়াতে একত্রিত হইয়াছে, অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্ম আছে, কোট কোর্ত্তা আছে, গির্জ্জা ঘর আছে, বৈদেশিক

রাজদূতদিগের অবস্থিতি আছে, বাণিজ্যিকী সন্ধি-পত্রাদি আছে, আর স্কুল কলেজ আছে এবং যথেষ্ট অনুকরণ আছে; নাই লাইবিরিয়ায় জাতীয় ধর্ম্ম এবং জাতীয় ভাষা; বলও নাই, বুদ্ধিও নাই, স্বচ্ছলতাও নাই, মৌলিকতাও নাই, এবং যদি মার্কিণ এবং ইউরোপীয়দিগের বিশেষ আনুকূল্য না থাকিত, তবে এত দিনে সমীপবর্ত্তী বাস্তব নিগ্রো-জাতিদিগের আক্রমণে লাইবিরিয়ার মার্কিন প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটী নিঃশেষিত হইয়া যাইত। ফলতঃ অন্য জাতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মভাষাদি পাইলে সামাজিক স্বাতন্ত্র্যলাভের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়।

রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত গ্রীস ভিন্ন অপর কোন প্রদেশেই তৎ-প্রদেশীয় ভাষার শিক্ষা সম্পাদন হইবার নিয়ম ছিল না। প্রদেশীয় আদালত গুলিতেও রোমীয়দিগের নিজ লাটিন ভাষা ভিন্ন আর কোন ভাষা প্রচলিত ছিল না। প্রাদেশিক জনগণের সামাজিক রীতিও রোমীয় অনুকরণে সংঘটিত হইয়াছিল। যখন রোমের বল এবং প্রভাব খর্ব্ব হইয়া পড়িল, তখন কোন প্রদেশ হইতে রোমের সাহায্য হওয়া দূরে থাকুক, প্রদেশবাসিগণ আত্মরক্ষাতেই একান্ত অসমর্থ হইয়া পড়িল। একমাত্র গ্রীক বা পূর্ব্ব সাম্রাজ্যই বর্ব্বর বিপ্লব হইতে সমধিক কাল সংরক্ষিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষ পাঁচ শত বৎসরেরও অধিককাল মুসলমানদিগের একান্ত আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষে জাতীয় ধর্ম্মের এবং ভাষার এবং সমাজরীতির লোপ হয় নাই। মুসলমানেরা বহুকাল যাবৎ ভারত-বাসী হিন্দুদিগের ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন আবার হিন্দুদিগেরই পুন-রুজ্জীবন হইতে লাগিল। হিন্দুরা এতদূর সতেজ হইয়াছিল যে, প্রকৃত কথায় হিন্দুদিগের হস্ত হইতেই সাম্রাজ্য-শক্তি ইংরাজের হস্তগত হইয়াছে বলিতে হয়; ইংরাজ নামে মাত্র মুসলমানের হাত হইতে ভারত-সাম্রাজ্য পাইয়াছেন, বস্তুতঃ হিন্দুর স্থানেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ভাষাদি যেমন মুসলমানের আমলে বজায় ছিল, ইংরাজের আমলে সেইরূপ বজায় থাকিবে কিম্বা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিবে, না, রোম সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলিতে যেরূপ হইয়াছিল, আমাদিগের সামাজিক রীতি, এবং ভাষাদিও সেইরূপ বিলুপ্ত-ভাব প্রাপ্ত হইবে? আমাদের ভাষাগুলির ভবিষ্য দশা কিরূপ হইবে অনুমিত হইতে পারে, তাহাই এই প্রবন্ধে বিচার করিব।

বিচার্য্য বিষয়টীকে দুই ভাগে বিভাগ করিয়া দেখিতে হইবে (১) ভারতবাসীর ভাষা থাকিবে, কি যাইবে; এবং (২) যদি থাকে, তবে কেমন ভাবে থাকিবে।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, পৃথিবীর সকল দেশেই অনেকানেক জাতি এবং জাতীয় ভাষা হইয়াছে এবং গিয়াছে। এমন কোন স্থান নাই, যেখানে পূর্ব্ব হইতে একাল পর্য্যন্ত কোন একটী জাতি বাস করিয়া আছে, অথবা চিরকালাবধি একই ভাষার ব্যবহার চলিয়া আসিয়াছে। এই বাঙ্গালা দেশেই মনে কর, এখন এখানে বাঙ্গালা ভাষা চলিতেছে—ইহার পূর্ব্বে কোন প্রকার প্রাকৃত ভাষার চলন ছিল, তাহারও পূর্ব্বে কোন প্রকার কোলেরীয় ভাষা চলিত, এবং হয় ত তাহারও পূর্ব্বে ইহার স্থানে স্থানে কোনরূপ পৈশাচী ভাষা ব্যবহৃত হইত। অনুমান এই পর্য্যন্ত যায়। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে যে দেশটী একেবারে মনুষ্য-শূন্য ছিল, এরূপ মনে করা যায় না। হয়ত, কোলেরীয়দিগেরও পূর্ব্বে এমন কোন জাতি ছিল, যাহার সামান্য অবশেষ মাত্র এখনও মোরভঞ্জের গভীরতম বন-প্রদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে—উহারা কোন প্রকার অস্ত্রাদির ব্যবহার জানে না এবং বস্ত্র পরিধানও করে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ। কোথাও কোন প্রদেশের প্রকৃত আদিম অধিবাসীদিগকে নিশ্চয় করিয়া বাহির করিতে পারা যায় না, এবং তাহাদের কোন ভাষা বা কেমন ভাষা ছিল, তাহা নির্ণীত হয় না।

এই সকল উদাহরণের দ্বারা জানা যায় যে, জাতির বিধ্বংসে জাতির ভাষাও বিনষ্ট হয়। কিন্তু অনেকানেক স্থল আছে, যথায় জাতির বিধ্বংস না হইয়াও জাতীয় ভাষার অন্তর্দ্ধান হইয়াছে। ঐ সকল স্থলে ক্ষুদ্রতর ভাষা বৃহত্তর ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। এখনও শত বর্ষের বড় অধিক হয় নাই, ইংলণ্ডের অন্তর্গত কর্ণওয়াল প্রদেশে কর্ণিস নামক ভাষার প্রচলন ছিল। উহা আর স্বতন্ত্র ভাষা-রূপে বিদ্যমান নাই—ইংরাজীতে মিলাইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মের পেগু প্রদেশে আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এক পেগুবী ভাষা প্রচলৎ ছিল। ব্রহ্ম দেশীয়েরা পেগু বিজয় করিয়া ঐ ভাষাটীকে উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া সফলপ্রযত্ন হইয়াছিল—পেগুবী ভাষাটী ব্রহ্ম ভাষার সহিত এক হইয়া গিয়াছে। রুসিয়াধিকৃত পোলণ্ডের মধ্যেও রুসীয়দিগের যত্নে পোলদিগের ভাষা অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে; এবং রুসীয় ভাষার চলন হইতেছে।

উল্লিখিত কয়েকটী স্থলে এবং ঐ প্রকার অপরাপর স্থলেও বিজিত ক্ষুদ্রসংখ্যক লোকের ভাষা বিজয়ী বৃহত্তর জাতির ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থলে বিজিগীষু ক্ষুদ্র জাতির ভাষাও বিজিত বৃহত্তর জাতিদিগের ভাষার শিরোবর্ত্তী হইয়াছে, এবং তাহা-দিগের বৃদ্ধির পথ রুদ্ধ করিয়া স্বয়ং বৃদ্ধিশীল হইয়াছে। রোমীয়দিগের ভাষা, গ্রীকদিগের ভাষা, এবং আরবদিগের ভাষা এইরূপে তত্তজ্জাতীয় দিগের বিজিত সুবিস্তীর্ণ প্রদেশগুলিতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ সকল স্থলে, দেখা যায় যে, বিজিত প্রদেশগুলির ভাষাতে শিক্ষাদান, বিচারা-লয়ের ব্যবহার, এবং রাজকীয় কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ একেবারেই বন্ধ করা হইয়াছিল।

এখন দেখিতে হইবে যে, ভারতবর্ষপ্রচলিত ভাষা সমস্তের প্রতি উল্লিখিত লক্ষণগুলি বা তাহাদিগের কোনটী সংলগ্ন হয় কি না।

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে ভারতবাসী একেবারে নির্ব্বংশ এবং বিধ্বস্ত

হইয়া যাইবে, এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। যে সকল জাতি পৃথিবী হইতে একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, তাহারা একান্ত বর্ব্বর, স্বল্প-সংখ্যক এবং কতিপয় গোষ্ঠীর সমষ্টিমাত্র ছিল—জাতি পদবাচ্য ছিল না বলিলেই হয়। তাহাদিগের ভাষাগুলিও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন এবং সুপরিস্ফুট হয় নাই। কোন ভাষার পূর্ণতা তদ্ভাষী জনগণের সংখ্যা এবং বিস্তৃতির অনুক্রমেই জন্মে। বর্ব্বরদিগের সংখ্যাও কম, সুতরাং তাহাদের ভাষা ক্ষুদ্র এবং সংকীর্ণ এবং অসম্বদ্ধ থাকে। তেমন ভাষাগুলি সহজেই বিলোপ দশা প্রাপ্ত হইতে পারে। ভারতবর্ষের ভাষা-গুলির সেরূপ অবস্থা নয়। ভারতবর্ষের ভাষাগুলির অবান্তর ভেদ লইয়া গণনা করিলে সর্ব্বশুদ্ধ ১০৬টী ভাষার নাম পাওয়া যায়, এবং তাহাদিগের অধিকাংশই অধিকসংখ্যক লোকের ব্যবহৃত নয়, এবং পূর্ণাবয়বও নয়, এবং দৃঢ়সম্বদ্ধও নয়। এক কোটির অধিক লোকে যে কয়েকটী ভাষায় কথোপকথন এবং পুস্তকাদি রচনা করে, তাহা প্রধানতঃ ছয়টী; আর্য্যাবর্ত্তে, (১) পঞ্জাবী-সিন্ধু (২) হিন্দি-হিন্দুস্থানী এবং (৩) বাঙ্গালা-আসামী-উড়িয়া; দাক্ষিণাত্যে, (৪) মহারাষ্ট্রীয়-কানারী, (৫) তেলেগু (৬) তামিল-মালায়ালম। এই ছয়টীর মধ্যে একটী অর্থাৎ হিন্দি-হিন্দুস্থানী ১০ কোটি লোকের ভাষা—সুতরাং পৃথিবীর যত লোকে ইংরাজী কহে, তাহার সমপরিমাণ লোকে হিন্দি-হিন্দুস্থানীও কহে। পঞ্জাবী-সিন্ধু ভাষী লোকের সংখ্যা ১ কোটি ৬৫ লক্ষ। অতএব ইউরোপের স্পেনীয় ভাষার সমান। বাঙ্গালা-উড়িয়া-আসামী ৫ কোটি লোকের ভাষা, অর্থাৎ সমস্ত জর্ম্মণ ভাষী লোকের তুল্য। মহারাষ্ট্রীয় ভাষীর সংখ্যা ২ কোটি, প্রায় ইটালীয় ভাষীর সমান। তেলেগু ভাষীর সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ এবং তামিল-মালা-য়ালম ভাষীর সংখ্যাও ১ কোটি ৭০ লক্ষ, অর্থাৎ তুর্কভাষী সমস্ত লোক অপেক্ষাও কিছু অধিক। এই ছয়টী ভাষার মধ্যে একটীও অসম্পূর্ণ বা অসম্বদ্ধ নয়। সকলগুলিতেই উৎকৃষ্ট পদ্য এবং গদ্যগ্রন্থ

আছে। এরূপ পূর্ণাবয়ব ভাষা সকল মারা পড়িতে পারে না। জেতৃ-দিগের নিরতিশয় পীড়নে বিজিত জাতির ভাষা লুপ্ত হয়, অথবা ক্ষুদ্র ভাষা বৃহত্তরের অন্তর্নিবিষ্ট হয়, কিন্তু এই দুই সূত্রের মধ্যে কোনটীই ভারত-বর্ষীয় প্রধান প্রধান ভাষাগুলির প্রতি খাটে না। ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষীয় বহু প্রচলিতভাষার লোপ সম্বন্ধে কোন শঙ্কাই হইতে পারে না। ইংরাজ পীড়ন করেন না এবং প্রজার ভাষা বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত কোন ইচ্ছাই করেন না। প্রত্যুত অনেকে ইংরাজের ভাষা সম্বন্ধীয় রাজনীতির প্রতি অন্যরূপ সন্দেহই করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেখেন যে, ইংরাজ প্রতি প্রদেশে এবং কখন কখন প্রতি বিভাগেও ভাষাগত অবান্তর ভেদ-গুলি রক্ষা করিয়াই চলিতে সমুৎসুক, এবং তাহা দেখিয়া মনে করেন যে, ভারতবাসীর ভাষাভেদ মিটিলে পাছে সমুদায় অন্তর্ভেদ মিটিয়া যায়, এবং ভারতবাসী সবল হইয়া উঠে, সেই ভয়ে ইংরাজ আমাদের ভাষাভেদ রক্ষা করিতেই চাহেন। কিন্তু ইহা প্রকৃত অনুমান নয়। দেশের মধ্যে গমনাগমনের সৌকর্য্য যত বৃদ্ধি হইবে, এবং শিক্ষার যত বিস্তৃতি হইবে, এবং ভারতবর্ষীয় ভাষা সকলে পুস্তক রচনা এবং সংবাদ পত্র প্রচারাদি যত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, ততই এক একটী ভাষার অন্তর্গত অবান্তর ভেদলুপ্ত হইবে এবং বিভিন্ন ভাষাদিগেরও মৌলিক ভেদ ক্রমশঃ ন্যূন হইয়া আসিবে। ইংরাজ হইতেই ঐ ত্রিবিধ কার্য্যে ভারতবর্ষের বিশিষ্ট সহায়তা হইতেছে। অতএব তাঁহার কর্তৃক আমাদের ভাষাগুলির অন্তর্ভেদ বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ মনে করা নিতান্ত অন্যায্য। কিন্তু কোন কোন রাজকর্ম্মচারীর মনে যে, ঐরূপ রাজনৈতিক ভাব সমুত্থিত হইতে পারে না, এমত নহে।

যেমন রোমীয়দিগের সময়ে লাটিন ভাষা রোম-সাম্রাজ্যে চলিয়া-ছিল এবং গ্রীক ভিন্ন অপর সকল ভাষাকে অধঃপাতিত করি-য়াছিল, ইংরাজী ভাষাও ভারতবর্ষে সেইরূপ প্রভুত্ব করিবে কি না, ইহাই শেষ বিচার্য্য। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি কখন তেমন

হইয়া উঠে তাহা ইংরাজের দোষে হইবে না, ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয়-দিগের দোষেই হইবে। ইংরাজেরা এদেশে যতটা ইংরাজী চালাইতে চাহেন, ইংরাজী শিক্ষিত দেশীয় লোকেরা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর ইংরাজী চাহেন। ইংরাজ বিধি করিলেন যে, সকল আদালতেই স্থানীয় ভাষা অথবা ইংরাজী ভাষা এই দুয়ের এক ব্যবহৃত হইবে, কিন্তু সেরূপ বিধি থাকিলেও দেশীয় ভাষায় উকীল মোক্তার প্রভৃতির উক্তি প্রত্যুক্তি এবং আমলাবর্গের লেখা পড়া, বর্ষে বর্ষে ন্যূন হইয়া পড়িতেছে এবং ইংরাজিতেই আদালতের সমুদায় কাজ চলিতেছে। দেশীয় ভাষার সেরেস্তা উঠিয়া যাওয়াতে, ইংরাজ হাকিমের কোন অসুবিধা নাই। এই জন্য তিনি বুঝিতে পারেন না যে, ইহা হওয়ায় আদালতের কার্য্য ইংরাজী শিক্ষিতদিগের একচেটিয়া হইয়া উঠিতেছে, এবং তাহাতে প্রজার অসুবিধা বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। বাঙ্গালা দেশের আদালত সকল হইতে যে সকল কারণে ফারসি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং বিহারে উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে কায়েথি-হিন্দি প্রচারিত হইয়াছে, ইংরাজীর অতি-প্রসারতা রোধ করিবার জন্য সেই সকল কারণই বিদ্যমান আছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিতেরা তাহা বুঝেন না। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশীয় সাধারণ লোক হইতে, তাঁহাদের যে বিশিষ্টতা জন্মে, তাঁহারা সেই অভিমান-সুখেই একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়েন।

কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিতদিগের অভিমান বশতঃই হউক, আর ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষের অভিমানমিশ্রিত আলস্য বশতঃই হউক, যদিও ইংরাজ অধিকারে আদালত এবং রাজ কার্য্যালয় সকলে দেশীয় ভাষাগুলির অনাদর হইয়া উঠিতেছে, তথাপি উহা মুসলমানদিগের সময়ে যতটা হইয়াছিল, তাহার অধিক হয় নাই, এবং হইতে পারিবেও না—মুসলমানদিগের সময়ে রাজ-কার্য্যে দেশীয় ভাষার প্রচলন একেবারেই বন্ধ ছিল। কিন্তু মুসলমানের আমলেও দেশীয় ভাষাগুলি সর্ব্বতোভাবে সজীব ছিল। পঞ্জাবী ভাষায় "আদি" গ্রন্থ, হিন্দি ভাষায় দাদুপন্থীদিগের দ্বিলক্ষাধিক দোঁহা, কবীরপন্থী-

দিগের সুরসাগর, ভক্তমালা, সতসইয়া এবং ছত্রপ্রকাশাদি গ্রন্থ, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় জ্ঞানেশ্বরী, অভঙ্গ, এবং বাকৃহারাদি গ্রন্থ; বাঙ্গালায় চৈতন্য-ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কাব্য-নিচয়—এ গুলি মুসলমানদিগের রাজত্বকালেই প্রণীত এবং জনসাধারণ কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিল। অপরাপর দেশে বিদ্যাচর্চ্চার সম্বর্দ্ধনের নিমিত্ত রাজার সাহায্যের যতটা প্রয়োজন, ভারতবর্ষে চলিত ভাষা সম্বন্ধে কখনই রাজানুকূল্যের ততটা প্রয়োজন হয় নাই। এই মহাদেশের সর্ব্বত্রই ধর্ম্মভাবের আধিক্য এবং সেই ভাবের বিকাশই এখানকার সাহিত্যের মূল। অপরাপর ভাবের বিকাশ সেই মূল হইতেই সমুদ্ভূত। এদেশে যত দিন ধর্ম্মভাব আছে, তত দিন এখানকার লোক আপনা-পন পিতৃমাতৃ ভাষায় সেই ভাব প্রকাশ করিতে রত হইবে—এবং তাহা হইলে সমস্ত সাহিত্য-শাস্ত্র সজীব থাকিবে। অতএব ইংরাজের আধিপত্যে ভারতবর্ষের ভাষার লোপ বা হীন-বীর্য্যতা ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষীয় ভাষা সকল সজীব এবং উন্নতা-বস্থ থাকিলেও রাজভাষা ইংরাজীর সহিত তাহাদিগের সম্বন্ধ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতর হইতে থাকিবে। মুসলমানদিগের সময়ে যেরূপ যেরূপ হইয়া-ছিল, ইংরাজের আমলেও সেই সকল ব্যাপারের অনুরূপ ঘটনা ঘটিবে—এবং তাহা স্বল্পতর কালে এবং সমধিক পরিমাণেই ঘটিবে। কারণ, এখন মুদ্রাযন্ত্র জন্মিয়াছে, শিক্ষার বিস্তৃতিও হইতেছে, এবং গতায়াত দ্বারা লোকের পরস্পর মিশ্রণ পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। মুসলমানদিগের সময়ে কত শত শত আরবী এবং ফারসী শব্দ আমাদিগের ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী শব্দ অনেক আসিয়াছে, আরও অনেক আসিবে। ইউরোপের আমদানি নূতন নূতন দ্রব্যাদির নাম, আর আইন এবং ব্যবহার ঘটিত এবং বিজ্ঞান ঘটিত অনেকানেক পারিভাষিক শব্দ, আর জাতিবাচক এবং গুণ-বাচক কতক শব্দ অবশ্যই আমাদের ভাষায় প্রবিষ্ট হইয়া স্বর সামঞ্জস্যের নিয়মানুসারে অপভ্রষ্ট

হইয়া চলিত হইবে। বিদ্যা-চর্চ্চার বৃদ্ধির সহিত সংস্কৃত রত্নাকর হইতেও বহু পরিমাণে শব্দ রত্নের উদ্ধার হইয়া চলিত ভাষায় মিশিয়া যাইবে। এইরূপ হইতে হইতে আমাদের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পর সমীপবর্ত্তী বই দূরবর্ত্তী হইবে না; অর্থাৎ ভাষা সমস্ত একতার দিকেই চলিবে। ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির মধ্যে হিন্দি-হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত হইতে থাকিবে।

ভবিষ্যবিচার—ভারতবর্ষের কথা।

(সামাজিক-রীতি বিষয়ক।)

আমাদিগের সামাজিক প্রণালীর সারভূত কথা—জাতিভেদ। ইহা পৃথিবীর অপর সকল লোকের পক্ষে অতি আশ্চর্য্য-জনক ব্যাপার হইয়া আছে। যে বৈদেশিক পর্য্যাটক যখন ভারতবর্ষে পরিভ্রমণ করিতে আসিয়াছেন, তিনিই এখানকার জাতিভেদ প্রণালী সম্বন্ধে কথা তুলিয়াছেন। পূর্ব্বকালের লোকেরা প্রায় সকলেই এই প্রণালীর প্রশংসা করিয়াছেন, নব্য কালের লোকেরা ইহার প্রায়ই নিন্দা করিতেছেন। কিন্তু প্রশংসাই করুন আর নিন্দাই করুন, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কেহই বুঝিতে পারেন নাই বলিলেই হয়। জাতিভেদ প্রণালীটী কোন সমাজের পক্ষেই নিতান্ত নূতন বস্তু নয়। পুরুষানুক্রমে ব্যবসায় বিশেষের অবলম্বন করা, বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের বিভিন্নদলে সম্বদ্ধ হওয়া, এবং সকল ব্যবসায়িবর্গের এক মাত্র যাজক সম্প্রদায়ের বশ্য হওয়া, এ সকল ব্যাপার সর্ব্বদেশ সাধারণ এবং কোন কালে পৃথিবীর সকল দেশেই অল্প বা অধিক পরিমাণে

পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছিল। পরন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে ব্যবসায় বিভাগের ভেদটী অপর সকল দেশের অপেক্ষা বিশেষরূপেই পরিস্ফুট হইয়া আছে।

এরূপ হইবার কারণ, যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধেয়। ভারতবর্ষে মৌলিক বর্ণ-ভেদের নিরতিশয় আধিক্য। ভারত ভূমির মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আকার এবং প্রকৃতি সম্পন্ন মনুষ্য বহু পূর্ব্বকাল হইতে একত্রিত হইয়াছে, এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। এখানে ককেসীয়, মোঙ্গলীয়, কোলেরীয়, দ্রাবিড়ীয়, নিগ্রীয় পলিনেসীয় প্রভৃতির বিবিধ পরিমাণে মিশ্রণ-জাত নানা প্রকারের লোক সুবহু পরিমাণেই বাস করিতেছে। ব্যবসায় ভেদের সহিত ঐ সকল মৌলিক ভেদও মিলিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সাধারণতঃ ব্যবসায়-ভেদ জন্ম-ভেদ অনুসারে ঘটিয়াছে। মনুসংহিতায় পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, অমুক বা অমুক হইতে উৎপন্ন বংশীয়দিগের অমুক ব্যবসায়। উক্ত সংহিতায় ককেসীয়াদি মৌলিকবর্ণের কথা নাই বটে, কিন্তু তাহা না থাকিলেও যখন জন্মের গুণাগুণ ধরিয়া ব্যবসায়ের নিরূপণ হইয়াছিল, তখন মৌলিক বর্ণের ভেদ এবং তাহাদের উচ্চাবচ সাঙ্কর্য্য ঐ গুণাগুণ অবধারণের যে শ্রেষ্ঠ উপাদান হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। ব্যবসায়ভেদ সাহজিক বর্ণ-ভেদের সহিত সমধিক পরিমাণে সম্মিলিত হওয়াতে এখানকার জাতিভেদ সুদৃঢ় এবং অত্যধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই জন্য অপরাপর দেশে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে বিবাহ বন্ধনের স্বল্পতা মাত্র দৃষ্ট হয়, এখানে ওরূপ বিবাহের একেবারেই নিষেধ হইয়া গিয়াছে এবং সেই বিবাহ-নিষেধের অঙ্গীভূত হইয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভোজনের একপংক্তিকতা এবং শরীর সংস্পর্শ পর্য্যন্ত নিবারিত হইয়াছে। সঙ্কর বিশেষতঃ বিলোমসঙ্কর উৎপাদনে আর্য্যশাস্ত্রের নিতান্ত অনভিরুচি। "সঙ্করো নরকায়ৈব"।

আমাদিগের জাতিভেদ প্রথার স্থূল এবং মূল কথা এই। ইংরাজ এত দিনের পর জাতিভেদের এই প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার উপক্রম করিয়াছেন। সম্প্রতি রিস্‌লী সাহেব বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আদেশ

অনুসারে জাতিভেদ বিষয়ে যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে ভারতবাসীর জাতিভেদের অন্তস্তলে যে মৌলিকবর্ণভেদের অস্তিত্ব আছে তাহার সুপরিস্ফুট বোধ প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ইংলণ্ডে যখন একটী প্রকাশ্য বক্তৃতায় এই কথার প্রথম উত্থাপন করেন তখন তাঁহার শ্রোতৃবর্গ একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল। আজি কালি এরূপ কথাও উঠিতেছে যে, বিভিন্ন জাতীয় লোকের শরীর এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাণ গ্রহণ করিতে পারিলে, জাতিভেদের মৌলিক হেতু স্থির হইতে পারে। যাহা হউক, ইংরাজ বিদেশী—তিনি যে এতদিন আমাদের সামাজিক প্রণালীর প্রকৃত রহস্য ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন তাহা বিচিত্র নহে। এ দেশের বড় বড় সংস্কারকেরাও এই রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারেন নাই এবং তাহা না পারাতেই আপনাদের প্রবর্ত্তিত সংস্কার কার্য্যে বিফল প্রযত্ন হইয়াছেন। "যেমন গঙ্গাতে আসিয়া পড়িলে সকল নদ নদীর জল গঙ্গার জল হইয়া যায়, তেমনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই সকল লোক পবিত্র হইয়া উঠে"—বুদ্ধদেবের এই কথার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার মতাবলম্বীরা ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য স্বীকার করিলেন না, সকল জাতির লোককে তুল্য মূল্য করিলেন এবং সেই জন্য দেশের অনুপযোগী ব্যবহার প্রবর্ত্তিত করিতে গিয়া আপনারা হীনবল এবং দেশ হইতে বিতাড়িত হইলেন। ব্রহ্ম, চীন, তিব্বত প্রভৃতি যে সকল দেশে একবর্ণাত্মক লোকের বাস, তথায় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইল, আশ্রয় পাইল এবং বদ্ধমূলতা লাভ করিল।

বৌদ্ধের স্থানে সাম্প্রদায়িক সহানুভূতির নীতিবাদ গ্রহণ করিয়া এবং শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের একটী উক্তি যে, যবন খস হুন প্রভৃতি অপকৃষ্ট জাতীয়েরাও হরিনাম গ্রহণ বলে দ্বিজোত্তম হয়—ইহার পারমার্থিক ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবহারিক বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ লইয়া, নব্য বৈষ্ণবতন্ত্রতার প্রবর্ত্তকগণ দলপোষণ চেষ্টায় জাতিভেদ প্রথা পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিলেন। কিন্তু দুই এক পুরুষের মধ্যেই ঐ উপদেশ নিস্ফল হইয়া পড়িল।

বৈষ্ণবেরা বৈবাহিক বিষয়ে আপনাপন জাতি খুঁজিয়া লইতে আরম্ভ করিল। ফল কথা, ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রণালীর মূল অতি গভীর এবং দৃঢ়, এই জন্যই ইহার বিরুদ্ধ চেষ্টা বিফল হইয়া যায়। বৈষ্ণবই হউক, আর মুসলমানই হউক, আর নানক পন্থীই হউক, আর খৃষ্টানই হউক, আর যেই হউক ভারতবাসী জাতিভেদ প্রথার অবলম্বন না করিয়া পুরুষানুক্রমে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে পারে না। এখানকার জাতিভেদ প্রণালীর হেতু যদি কেবল মাত্র ব্যবসায় ভেদ হইতে সমুৎপন্ন হইত, তাহা হইলে যেমন পৃথিবীর অপরাপর দেশ হইতেও জাতিভেদ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে, ভারতবর্ষ হইতেও সেইরূপে ইহা অনেক কাল উঠিয়া যাইত। মনুসংহিতা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে লোক সকলকে পুরুষানুক্রমিক বিশেষ বিশেষ ব্যবসায় কার্য্যে সম্বদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা সেই সংহিতার সময় হইতেই বিলক্ষণ শিথিল ছিল। মনু বলেন,—

আজীবংস্তুতথোক্তেন ব্রাহ্মণ স্বেন কর্ম্মণা।
জীবেৎক্ষত্রিয়ধর্ম্মেণসহ্যস্য প্রত্যানন্তরঃ॥
উভাভ্যামপ্যজীবংস্তু কথংস্যাদিতি চেদ্ভবেৎ
কৃষি গোরক্ষমাস্থায় জীবেদ্বৈশ্যস্যজীবিনং॥

পূর্ব্বোক্তরূপ জাতীয় ব্যবসায় দ্বারা যদি ব্রাহ্মণ আপনার জীবিকার অর্জ্জনে অসমর্থ হয়েন, তবে দ্বিতীয় যে ক্ষত্রিয় জাতি তাহার ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন। যদি দুয়েতেই না হয়, তবে কৃষি, গোরক্ষা প্রভৃতি বৈশ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবেন।

অতএব জীবনোপায়ের নিমিত্ত একজাতীয় লোকে জাত্যন্তরের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারে। ব্রাহ্মণেরা পাখি মারা, কুকুর পোষা প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতেন, মনুসংহিতাতেই ইহার ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। উচ্চজাতীয়দিগের বৃত্তি স্বল্পোৎপাদিকা। নীচজাতীয় লোকে যে উচ্চ জাতীয়ের বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারিত না, বোধ হয়, ইহাও তাহার একটি কারণ।

ভারতবর্ষের জাতি-ভেদ প্রণালী শুদ্ধ ব্যবসায়-ভেদ-মূলক নয়, এই প্রকৃত কথাটী না বুঝাতেই এই প্রণালীর প্রতি অনেকটা অযথা নিন্দাবাদ হইয়া থাকে। ইউরোপীয় অর্থ-নৈতিকেরা বলেন যে, লোকে যাহার যে ব্যবসায়ে ইচ্ছা, সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিতে না পাইলে, সমাজের ধনবত্তার কথা দূরে থাকুক, তাহার জীবন রক্ষাই দুরূহ হইয়া পড়ে। অর্থনৈতিক পণ্ডিতদিগের এই সিদ্ধান্তটী কিরূপ যুক্তির উপর সংস্থাপিত তাহা একটু অনুধাবনপূর্ব্বক বুঝিবার প্রয়োজন আছে। ইউরোপীয় অর্থ-নৈতিকদিগের বিচার এইরূপ—'কোন দেশে তদ্দেশ নিবাসী জনগণের প্রয়োজনীয় শস্য, বস্ত্র, লবণ, তৈলাদি ভোগ্যবস্তু প্রস্তুত হইতেছে। মনে কর, অপর কোন দেশ হইতে তথায় ঐ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে কোন একটী, যথা তৈলের আমদানি হইল, এবং সেই তৈল দেশে যে তৈল জন্মিতেছিল তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং স্বল্প মূল্য হইল। তাহা হইলে ঐ আমদানি তৈলেরই ব্যবহার হইবে এবং দেশীয় তৈলিক-দিগের ব্যবসায় উঠিয়া যাইবে। সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইবে। যদি তাহাদিগকে ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহারা অতিশয় বিপদাপন্ন একান্ত দরিদ্র এবং পরিশেষে বিনষ্ট হইবে। তৈলিকদিগের সম্বন্ধে যেরূপ অপর ব্যবসায়ী সকলের সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। এই জন্য ব্যবসায় পরিবর্ত্তের পথ সর্ব্বতোভাবেই মুক্ত থাকা আবশ্যক।'

অর্থ-নৈতিকদিগের যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম, সেগুলি বিচার-সঙ্গত কথা। কিন্তু ভারতবাসীর জাতিভেদ প্রথা যে ব্যবসায় পরিবর্ত্তের তেমন কঠিনতম কোন প্রতিবন্ধকতা করে না, তাহা মনুসংহিতা হইতে প্রদর্শিত হইয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষের অবস্থাভিজ্ঞ এবং ভারতবর্ষীয় শাস্ত্রের প্রকৃত জ্ঞানাপন্ন এমন দুইটী ইংরাজের উক্তিও উদ্ধৃত করিব। এল্‌ফিনষ্টোন্ সাহেব বলেন,—"আমি এতদিন ভারতবর্ষে আছি, এবং ইহার অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কোন

নূতন ব্যবসায় গ্রহণ করাতে কাহার জাতি গিয়াছে ইহা দেখি নাই"। কোল্‌ব্রুক্‌ সাহেব বলিয়াছেন "পৈতৃক-বৃত্তির দ্বারা জীবিকার অর্জ্জন না হইলে অপর বৃত্তির অবলম্বন করায় শাস্ত্রের স্পষ্ট বিধি আছে, সুতরাং জাতি ভেদ আছে বলিয়া ভারতবর্ষে ব্যবসায় পরিবর্ত্তনের বিশেষ কোন ব্যাঘাত হয় না"। অতএব প্রকৃত অর্থ-নৈতিক বিচারে যাহা সিদ্ধ হয়, ভারতবাসীর জাতিভেদ প্রথাটী সে বিধানের বিরোধী হইয়া চলে না। সকল লোকেই 'বৃত্তি কর্ষিত' হইলে স্ব স্ব জাতীয় বৃত্তি পরিত্যাগ এবং জাত্যন্তরের বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে।

কিন্তু ইংরাজ অর্থ-নৈতিক বিচার যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতেই পরিসমাপ্ত হয় না। উহার পরিণামে একটী হঠোক্তি আছে। তাহা এই—'সমাজান্তর্গত অধিক লোকের যাহাতে সুবিধা হয় তাহাই ন্যায্য, কোন একটী সম্প্রদায়ের দুঃখ ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তে তৈলিকদিগের ব্যবসায় উঠিয়া গিয়া তাহাদের কষ্ট হইতেছে বলিয়া কি উৎকৃষ্টতর এবং স্বল্পতর-মূল্য বৈদেশিক তৈলের আমদানি বন্ধ করা হইবে? কদাপি নহে। তৈলিকেরা ব্যবসায়ান্তরে প্রবিষ্ট হউক।' আমার বিবেচনায় ইংরাজ অর্থনীতি শাস্ত্রের এই কথাটী ভাল কথা নয়। তৈলিকেরা কি সমাজেরই একটী অঙ্গ-স্বরূপ নয়? সমাজের অন্তর্গত কোন একটী সম্প্রদায় অথবা একটী পুরুষও যদি জীবিকার জন্য কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্য সমাজের চেষ্টা করা কি বিধেয় নয়? দীন দুঃখিদিগকেও সমাজ পালন করেন কেন? ইংলণ্ডাদি দেশে দীনপালন বিধির সৃষ্টি কেন হইয়াছে? ভারতবর্ষাদি দেশে আতিথ্য প্রথা এবং ভিক্ষাদানের নিয়ম কেন এত বলবৎ রহিয়াছে? সমাজ আপনার অঙ্গ স্থানীয় কোন সম্প্রদায়কেই তুচ্ছ করিয়া চলিতে পারেন না। এইজন্য কোন চিন্তাশীল স্বতন্ত্রপ্রজ দেশই ঐ হৃদয় শূন্য অর্থনীতি গ্রহণ হইতে পারে নাই। মার্কিণেরা আমদানি বাণিজ্য সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছেন যে, স্বদেশীয় কোন ব্যবসায় উঠিয়া যাইতে পারে এমত কোন বৈদেশিক আমদানির আরম্ভ হইলে,

সেই দ্রব্যের উপর গুরুতর শুল্ক বসাইয়া স্বদেশীয় ব্যবসাদারদিগকে বলিয়া দেওয়া হইবে যে, এত বর্ষের জন্য ঐ শুল্কটী বসান হইল, সেই সময়ের মধ্যে তোমরা আপনাদের প্রস্তুত দ্রব্যটীকে উৎকৃষ্ট এবং অল্প-মূল্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা কর। ঐ নিয়মের ফলে বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া উঠে, তাহার বিক্রয় অধিক হয় না, দেশীয় ব্যবসায়ীরা অবসর পায়, এবং সেই অবকাশের মধ্যে, হয় আপনাদের দ্রব্যটীকে বৈদেশিক দ্রব্যের সমান বা তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট করিয়া তুলে, অথবা আপনারা ব্যবসায়ান্তর শিখিয়া লইয়া সেই নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথাও কিয়ৎপরিমাণে ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। অর্থাৎ এখানেও সমাজের অঙ্গীভূত ব্যবসায়দারদিগের প্রতি মমতা থাকে এবং সেই জন্য আমদানি দ্রব্যের একেবারে ভূরি প্রবেশ কতকটা বন্ধ করিয়া রাখে, এবং বৈদেশিক আমদানিতে যে ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাদিগকে কিছু অবসর দেয়। বস্তুতঃ অর্থনীতি যদি ধর্ম্মনীতির সহিত মিলিয়া চলে, তাহা হইলে জাতিভেদ প্রথার সহিত তাহার কোন অনৈক্যই হইতে পারে না।

জাতিভেদ প্রণালীর বিরুদ্ধে একটী শিক্ষাসূত্রকেও সাক্ষ্য স্বরূপে দণ্ডায়মান করা হয়। সে সূত্রটী এই—ব্যক্তি-ভেদে প্রবৃত্তির ভেদ থাকে, যে যাহার আপনাপন প্রবৃত্তির অনুযায়ী ব্যবসায় অবলম্বন করিলেই সে ব্যবসায়ের উন্নতি হয়। এই জন্য পুরুষানুক্রমে কোন এক ব্যবসায়ে লোকের নিবদ্ধ হওয়া ভাল নয়। এস্থলে দেখা যায় যে, শিক্ষা-সূত্রের সাক্ষ্যটী প্রকৃত প্রস্তাবে জাতিভেদ প্রথার অনুকূল বই প্রতিকূল নহে। প্রবৃত্তির মূল প্রথমতঃ পিতৃমাতৃ শরীর সঞ্জাত এবং দ্বিতীয়তঃ শৈশবের দৃষ্ট ব্যাপার সম্ভূত। উভয় কারণ হইতে পিতৃ-ব্যবসায়ে প্রবৃত্তির আধিক্যই সম্ভবপর। এই জন্য সাধারণতঃ পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করাতেই কি প্রবৃত্তিগত, কি শিক্ষা-সৌকর্য্যগত, সকল প্রকার সুবিধা অধিক। আর বিশেষ প্রতিভাশালী ব্যক্তির পক্ষে উন্নতির প্রতিবন্ধক কিছুই নাই।

জাতিভেদ প্রণালীর বিরুদ্ধে আর একটী কথা বলা হয়। ঐ কথাটী ঐতিহাসিক পরিণামবাদ হইতে সমুদ্ভূত। কথাটী এই—কোন সময়ে, ইউরোপীয় সকল সমাজেই এক প্রকার জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। এখনও সকল দেশেরই প্রত্যন্ত গ্রামাদিতে ঐ প্রথার কিছু কিছু চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে। ঐ সকল গ্রামবাসীদিগের পুত্রেরা স্ব স্ব পিতৃ ব্যবসায় অবলম্বন করে এবং সমব্যবসায়ীদিগের সহিতই বৈবাহিক আদান প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু এখন ঐ প্রথা কোন বৃহন্নগর বা দেশ-সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নাই। অতএব সমাজ যে পরিণতি-নিয়মের অধীন, সে নিয়ম জাতিভেদ প্রথার অনুকূল নহে—এই জন্য উহা এখন পৃথিবীতে অসাময়িক হইয়াছে এবং উৎসাদিত হওয়া উচিত। ঐ কথার উত্তরে এই বলা যায় যে, ভারতবর্ষের জাতি-ভেদ প্রথা যদি অন্যান্য দেশের জাতিভেদ প্রথার ন্যায় কেবল মাত্র শ্রম-বিভাগের প্রয়োজনে সমুদ্ভূত হইত, তাহা হইলে সেই সকল দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও ঐ প্রথার পরিণতি তদনুরূপ হইত, অর্থাৎ উহা আপনা হইতেই উঠিয়া যাইত।

পরন্তু প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিণাম-বাদীর বিচার ওরূপ স্থূল কথায় পর্য্যবসিত নহে। প্রকৃতপরিণাম-বাদী বলিবেন যে, জাতিভেদ প্রথার প্রয়োজন তিনটী; এক শ্রমের বিভাগ, দ্বিতীয় শিক্ষার সৌকর্য্য, তৃতীয় ব্যবসায়ানুসারিক দলবন্ধন। ভারতবর্ষে জাতিভেদ নিবন্ধন এই তিনটী প্রয়োজনই সুসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন ভারতবাসীর প্রয়োজন ব্যবসায়ানুসারিক দলবন্ধন নয়, এখন প্রয়োজন লোক সাধারণের সম্মিলন এবং একতা। আমি এ কথাটীর অসম্মান করি না। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, এক প্রকারের দল বন্ধন অন্য প্রকারের বৃহত্তর সম্মিলনের ব্যাঘাতক নহে, প্রত্যুত তাহার অনুকূল। কারণ জাতিভেদ বশতঃ ব্যবসায়গুলি অতি বিস্পষ্টরূপে পরস্পর পৃথক্‌ভূত হওয়াতে, সমাজান্তর্গত সকলেই অতি দিব্যচক্ষে দেখিতে পায় যে, তাহারা অন্যোন্যের আশ্রয়াপেক্ষী হইয়াই সকলে সচ্ছন্দে থাকিতেছে, পরস্পরের আশ্রয় না পাইলে কেহই সুখে থাকিতে পারিত না।

অতএব ব্যবসায় পার্থক্য স্পষ্টীকৃত হওয়ায়, সাধারণ সম্মিলনের ব্যাঘাত না হইয়া তাহার বিশিষ্ট সহায়তাই হইতে পারে। এই যে এক্ষণে ইউরোপ খণ্ডের নানাদেশে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের মধ্যে সম-ব্যবসায়িব্যক্তিদিগের দলবন্ধন হইতেছে, তাহাই কি ইউরোপীয় সমাজের পরিণাম ফল বলিয়া ধর্ত্তব্য হইতেছে না?। ঐ সকল দলবন্ধন কি জাতীয় বন্ধনের অঙ্গীভূত নয়? ঐ দলবন্ধনের প্রভাবেই কি মূল-ধনিগণ শ্রমজীবীদিগের প্রতি সহৃদয় দৃষ্টি করিতে শিখিতেছেন না? অতএব ঐতিহাসিক পরিণতির প্রকৃত বিচারে ভারতবর্ষের জাতিভেদ প্রথা সদোষ বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

জাতিভেদ প্রথার সম্বন্ধে অর্থনীতি, শিক্ষাসূত্র, এবং সমাজ-নীতি যাহা যাহা বলেন, তাহার বিচার করিয়া এক্ষণে অপর তিনটী সামান্য কথার উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ কথাগুলি আজি কালি বহুলোকের মুখেই শুনা যায়। (১) খাওয়া দাওয়ার এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের কোন প্রতিবন্ধকতা থাকিলে, সমাজের মধ্যে দৃঢ় সম্মিলন জন্মে না। কিন্তু আমার বিবেচনায় যখন সম্মিলনের প্রকৃত মূল বশ্যভাব তখন খাওয়া দাওয়ার এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের অবারিত ব্যবস্থা সম্মিলনের অনুকূল হইতে পারে না। বস্তুতঃ কোন দেশেই ঐ সকল সম্বন্ধ অবারিত ভাবে চলে নাই, এখনও চলিতেছে না (২) জাতিভেদ স্বীকারে সাম্যের অপলাপ হয়। উহার উত্তর এই—যাহা নাই তাহার অস্বীকারে কোন প্রকার অপলাপ হইতে পারে না। পৃথিবীতে সাম্য নাই। তদ্ভিন্ন, সম্পূর্ণ সাম্য ভাবের প্রভাবে বশ্যতার লোপ হয় এবং বশ্যতার লোপে সম্মিলন একেবারে অসম্ভবপর হয়। (৩) জাতি-ভেদের কথা বেদে তেমন স্পষ্টতঃ উক্ত হয় নাই। কিন্তু বৈদিক গ্রন্থের প্রকাশ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে অথবা তাহারও পশ্চিম অঞ্চলে হইয়াছিল। সেই সকল দেশ আর্য্য-বহুল। তথায় বিভিন্ন বর্ণের লোক সমধিক পরিমাণে একত্রিত হয় নাই। সুতরাং অপরাপর লোকের সহিত মিশ্রণে আর্য্য-শোণিত দূষিত হইবে, এরূপ শঙ্কার কারণ ব্রহ্মাবর্ত্তে উপ-

স্থিত হয় নাই। এই জন্যই প্রাথমিক বৈদিক গ্রন্থে জাতিভেদের কথা তেমন অধিক করিয়া বলিবার প্রয়োজন ছিল না। আর্য্যগণ ক্রমে ব্রহ্মর্ষি-দেশে, অনন্তর সমুদয় আর্য্যাবর্ত্তে, এবং তাহার পর দাক্ষিণাত্যে যেমন প্রসারিত হইতে থাকিলেন, অমনি ব্যবস্থাপকেরা অপরাপর লোক-দিগের সহিত তাঁহাদের মিশ্রণ নিবারণার্থে সচেষ্ট হইলেন। মৌলিক বর্ণভেদজনিত আকারগত পার্থক্য হইতে যে ভিন্নতা স্বতঃই উপস্থিত ছিল, ব্যবস্থা-শাস্ত্র সেই ভিন্নতাকে ন্যূনকল্প করিয়া এবং তজ্জাত বিদ্বেষ ভাবকে মন্দীভূত করিয়া তাহাকে সামান্য ব্যবসায়-ভেদরূপে পরিণত করিয়া দিলেন।

এখন ভাবিয়া দেখিতে হইবে, ইংরাজের অধিকারে আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সাহজিক এবং সাধারণতঃ অর্থ, শিক্ষা ও সমাজ নীতির অবি-রোধী, এই জাতিভেদ প্রণালীর অবস্থা কিরূপ হইতে পারে।

ইংরাজ ভারতবাসীকে আপনার অধীন মনে করেন। অধীনের প্রভু-শক্তি থাকে না। প্রভুতা দুই প্রকারে জন্মে; (১) ধনাধিকার হইতে (২) আভিজাত্য হইতে। সুতরাং সাধারণ ইংরাজের চক্ষে ভারতবাসীর ধনাধিকার এবং আভিজাত্য দুইটী বস্তুই ভারতবাসীর অবস্থার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে না। ব্রাহ্মণদিগের আভিজাত্য সহজেই ইংরাজের চক্ষুঃশূল। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের প্রতি অনুকূল না হইলেই জাতিভেদ প্রথার প্রতিও অনুকূল হওয়া যায় না। কিন্তু ইংরাজ ঐ আন্তরিক প্রতিকূল ভাবটীকে বিলক্ষণ দমন করিয়াই চলেন এবং জাতিভেদ প্রথার প্রতি বিরূপতা প্রদর্শন না করিয়া উহার প্রতি সম্যক ঔদাসীন্য অব-লম্বন করিয়াই অপক্ষপাতিতা প্রদর্শনের চেষ্টা করেন।

যে যে স্থলে অত্যল্প পরিমাণে ইংরাজ আমাদিগের সমাজ-রীতির প্রতি প্রতিকূলাচরণ করিয়াছেন তাহাও দেশীয় সম্প্রদায়-বিশেষের প্ররোচনাতেই করিয়াছেন। ইংরাজ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া আমাদের সমাজ-প্রণালীর গাত্র স্পর্শ করেন নাই। যাহা হউক, দুই একটী স্থলে

তাঁহার কৃত কার্য্যের দ্বারা আমাদের সমাজিক প্রথার প্রতি কিছু কিছু আঘাত হইয়াছে বলিতে হয়। প্রথম আঘাত ১৮৫০ অব্দের ২১ আইনের দ্বারা হইয়াছে। ঐ ব্যবস্থার অনুসারে কেহ স্বধর্ম্মচ্যুত হইলে পিতৃ ধনের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইবে না। ঐরূপ ব্যবস্থা বা ব্যবহার মুসলমানদিগের সময়েও প্রবল ছিল, এবং তাহা থাকায় যেমন সমাজের কোন ক্ষতিই হয় নাই, ইংরাজ কৃত এই আইন হইতেও তাহা অপেক্ষা অধিক হয় নাই, এবং হইবে বলিয়াও বোধ হয় না। ১৮৫৬ অব্দের ১৫-আইন অর্থাৎ বিধবাবিবাহের আইনটীও আমাদিগের সামাজিক রীতির প্রতি একটু আঘাতের চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু একাল পর্য্যন্ত ঐ আইন হইতে বিশেষ কোন ফলই ফলে নাই। প্রত্যুত আইনটী বিধিবদ্ধ হওয়াতে, এই হইয়াছে যে, হিন্দু বিধবা দুশ্চরিত্রা হইলেও মৃত স্বামীর ধনাধিকারিণী হইয়া থাকে, যদি দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তাহা হইলেই সেই অধিকার বিচ্যুতা হইয়া যায়!! কিন্তু উল্লিখিত দুইটী আইন জাতি-ভেদ প্রথার প্রতি সাক্ষাৎ হস্তার্পণ করে না; ১৮৭২ অব্দের ৩ আইন অর্থাৎ ব্রাহ্ম-বিবাহের আইনও জাতিভেদ প্রথার প্রতি অধিকতর বিরূপতা করিতে পারিবে না। বিবাহ ব্যাপারটীকে 'সংস্কার' কার্য্য হইতে আনিয়া 'চুক্তির' ভিতরে ফেলায় ভাল হয় নাই, ইতিমধ্যেই দুই এক জন ব্রাহ্মকে এই কথা বলিয়া অনুতাপ করিতে শুনিয়াছি। হিন্দুর বিবাহ যে সংস্কার কার্য্য তাহা যদিও ১৮৯১ সালের কনসেণ্ট আইনের দ্বারা অস্বীকৃত হয় নাই, তথাপি ঐ আইন প্রচলিত সামাজিক রীতির প্রতি কিঞ্চিৎ আঘাত করিয়াছে। কিন্তু সুবোধ এবং সদাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং নীতির দোহাই দিয়া ঐ পথে অধিক দূর অগ্রসর হইবেন তাহা মনে করা যায় না—প্রমাদ কথনই স্থায়ীভাব হইতে পারে না।

বস্তুতঃ এই সকল উপায়ের দ্বারা ভারতবর্ষের সমাজ প্রণালীর মূল স্বরূপ জাতিভেদ প্রথার কিছু কিছু অনিষ্টের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু

যতই চেষ্টা হউক, ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথার নৈসর্গিক মূল আছে, এবং যত দিন সেই মূল থাকিবে, ততদিন সকল ঘরেই সকল লোকে বিবাহ করিতে পারিবে না। জাতি-ভেদের মুখ্য তাৎপর্য্য বিবাহভেদ-অন্য কোন ভেদ নয়; বিবাহ-ভেদটীকে রক্ষা করিবার উদ্দেশেই অন্যান্য ভেদের ব্যবস্থা। বিবাহ ভেদের মূল কথাও যাহা শাস্ত্র ব্যক্ত হইয়াছে, বিজ্ঞান এবং সাধারণ অভিজ্ঞতাও তাহাই সমর্থিত করে।

বিশিষ্টং কুত্র চিদ্বীজং স্ত্রীযোনিস্ত্বেব কুত্রচিৎ।
উভয়ন্তু সমংযত্র সা প্রসূতিঃ প্রশস্যতে॥

কোথাও পুরুষ উৎকৃষ্ট, কোথাওবা স্ত্রী উৎকৃষ্ট হয়, কিন্তু উভয়ে সমান হইলেই সন্তান ভাল হয়। ক্ষেত্র বীজের বৈষম্য হইতে পূর্ব্বপুরুষের দোষাদি সন্তানে প্রত্যাগত হইবার অধিক সম্ভাবনা—এইটী মৌলিকতথ্য।

জাতিভেদ এই মৌলিক নিয়মের উপরেই সংস্থাপিত। যদি কখন ভারতবাসিগণ ইউরোপীয় বা আফ্রিক কোন একটী দেশের অধিবাসিবর্গের ন্যায় সমবর্ণ এবং সমাকার হয়, তখনই জাতিভেদ উঠিয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু যত দিন ইহাদের আকার, বর্ণ, এবং প্রকৃতির সাদৃশ্য না জন্মিতেছে, ততদিন ইহাদের মধ্যে একজাতিত্বও হইবে না। অপিচ, উপসংহারে বলি, জাতিভেদ প্রথা অসময়ে উঠাইবার জন্য দৃঢ় চেষ্টা করিলে (১) সমস্ত জাতির অপকর্ষ সাধন হইবে, (২) দেশের অন্তঃশাসনশক্তি আরও ন্যূন হইয়া পড়িবে, এবং (৩) লোকের স্বভাব হইতে শান্তি-প্রবণতা তিরোহিত হইয়া রাজ্যের সুশাসন কঠিনতর হইয়া উঠিবে।

(আর্থিক অবস্থা বিষয়ক।)

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অপর সকল দেশ অপেক্ষা অতি সমৃদ্ধিশালী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখন ভারতবর্ষ অতি দরিদ্র দেশের মধ্যেই গণ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে বিভিন্নদেশীয় বণিক্‌গণ ভারতবর্ষ হইতে অনেকানেক উপাদেয় দ্রব্য স্বস্বদেশে লইয়া যাইতেন, এখন ভারতবর্ষেই অপর দেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যজাত সমানীত হয়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের যাবতীয় রাজকার্য্য দেশীয় লোকের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইত, এক্ষণে সমস্ত উচ্চ রাজকার্য্যে বিদেশীয়দিগেরই সম্যক অধিকার হইয়াছে। পূর্ব্বে দেশের রক্ষা, যুদ্ধ-ব্যবসায়ী দেশীয় লোকের দ্বারাই সম্পাদিত হইত, এক্ষণে বিদেশ হইতে সমাগত সৈন্যই দেশ রক্ষার অস্থিমজ্জা হইয়াছে।

দেশীয় জনগণের উল্লিখিতরূপ অকর্ম্মণ্যতার লক্ষণগুলির মধ্যে শেষোক্ত দুইটী অর্থাৎ রাজকার্য্যে এবং সৈনিক কার্য্যে বিদেশীয়ের নিয়োগ, মুসলমানদিগের সময় হইতেই দেখা দিয়াছিল। তখনও অনেকানেক উচ্চতম রাজকার্য্য বৈদেশিক মুসলমানের হস্তগত হইয়াছিল, এবং অনেকানেক মুসলমান সৈনিক পুরুষও ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসিয়াছিল। কিন্তু কি মুসলমান রাজ-কর্ম্মচারী, কি মুসলমান সৈনিক প্রায় সকলেই স্ব স্ব জন্মভূমির সহিত সম্পর্ক শূন্য এবং ভারতবর্ষ নিবাসী হইয়া যাইত।

এখন ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারী এবং ইংরাজ সৈনিক প্রায় কেহ এ দেশে স্থায়ী হইয়া থাকেন না—এবং ইংরাজের অধিকারেই ভারতবর্ষের বাণিজ্যিকী অবস্থার পূর্ব্বোল্লিখিত বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ ইংরাজের অধিকার কালকেই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবর্ষে বৈদেশিক অধিকারের কাল বলা যায়।

পক্ষান্তরে, এই বৈদেশিক অধিকারের সময়েই ভারতবর্ষ সর্ব্বতোভাবে উপশান্ত হইয়াছে, ইহার সমস্ত অন্তর্বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে, বহিঃ-

শত্রুর আগমন সম্ভাবনা তিরোহিত হইয়াছে, বাণিজ্যকার্য্যের সম্যক বিঘ্নশূন্যতা জন্মিয়াছে, এবং ধনোপার্জ্জনের পথ লোকসাধারণের পক্ষে তাহাদের নিজ নিজ বুদ্ধি, বিদ্যা, ক্ষমতা, অধ্যবসায় এবং শ্রমশীলতার সমক্ষে এক প্রকার উন্মুক্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। এই সকল কারণে ধনের বৃদ্ধি বই কদাপি হ্রাস হইবার সম্ভাবনা হয় না। কিন্তু ঐ সকল শুভ লক্ষণের যুগপৎ উদয়েও ভারতবর্ষ দরিদ্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। পণ্ডিতেরা গণনা করিয়াছেন যে ৫ কোটি ভারতবাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত অন্ন দুই সন্ধ্যা যুটে না। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, অনাহার, স্বল্পাহার এবং কদাহার দোষে ভারতবাসী ক্ষীণবীর্য্য এবং স্বল্পায়ুঃ হইতেছে। এক প্রকার নিশ্চয় হইয়াই গিয়াছে যে, প্রতি দশ এগার বৎসর অন্তর ভারতবর্ষে একটী করিয়া বৃহৎ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এবং তাহার পরেই একটী করিয়া মহামারী আসিয়া উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন, স্থানে স্থানে অন্নকষ্ট এবং মারীভয় প্রায় প্রতিবর্ষেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রভূত ধনশালী ইউরোপের কথা ছাড়িয়া দিলেও পৃথিবীর অপর কোন দেশের অবস্থা এরূপ হইয়াছে বলিয়া শুনা যায় না।

ভারতবর্ষে সর্ব্ববিজয়ী ইংরাজের অধিকার। ঐ অধিকারের গুণে দেশে শান্তি থাকায় যে লোক সংখ্যার বৃদ্ধি ও তৎসহ আবাদের বৃদ্ধি হইয়া মোট কৃষ্যুৎপন্ন ধনের উৎপত্তি বাড়িয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু গড়পড়তায় প্রজার আয় বাড়িয়াছে এমন মনে করিবার কোন হেতু দেখা যায় না। পক্ষান্তরে ঐ অধিকার কালেই বিদেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পোৎপন্ন ধনের হ্রাস হইতেছে এবং যত ধন উৎপাদিত হইতেছে, তাহাও সমস্ত দেশে থাকিতেছে না।

ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রকারে কত ধন প্রতিবর্ষে উৎপন্ন হয়, তাহার অনুসন্ধান করিয়া সুপ্রসিদ্ধ রাজস্ব সচিব বেয়ারিং সাহেব এক প্রকার নিশ্চয় করিয়াছেন যে, গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর বার্ষিক আয় ২৭ টাকা মাত্র। কেহ কেহ, যথা গ্রাণ্টডফ সাহেব, বলেন ঐ আয় ২০ টাকার অনধিক। যদি

২৭ টাকাই ধরা যায়, তাহা হইলেও প্রতি ব্যক্তির ভাগে মাসে ২০ অথবা দিন ৴২॥ সাড়ে চার পয়সা পড়ে। ঐ আয় হইতেই ভারত-বাসীর খাওয়া, মাথা, পরা, বাস, ক্রিয়া, আমোদ, প্রমোদ সমুদায় নির্ব্বাহিত হয়। এবং ইহার ভিতর হইতেই বৈদেশিক শিল্পজাতের মূল্য দিতে হয় এবং এদেশে ও ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্টের ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়।

কয়েকটী প্রধান প্রধান দেশে গড়ে প্রতি ব্যক্তির বার্ষিক আয় ও রাজস্ব দান কত টাকা তাহা নিম্নে দেখান যাইতেছে।

দেশ	আয়।	রাজস্ব দান।
ইংলণ্ড	৩৪০ *	৩০
ফ্রান্স	২৯০	৩৪
জর্ম্মণি	১৮০	২৫
ইটালী	৭৭	২৩
অষ্ট্রীয়াহঙ্গেরী	১১০	২২
রুসিয়া	৫৪	১৪
স্পেন	৬২	২০
পর্ত্তুগাল	৮০	১১
তুরস্ক	৪০	৫
মার্কিন	৩০০	১৪
পারস্য	অজ্ঞাত	২
জাপান	৬২	৪
চীন	অজ্ঞাত	॥০
ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ	২৭	৪

* বিদেশীয় রাজ্যের হিসাব পৌণ্ডে জানা আছে। এই প্রবন্ধে সাবেক মত ১০ টাকায় পৌণ্ড ধরা গেল।

অতএব পৃথিবীর অপর সকল প্রধান প্রধান দেশের লোকের অপেক্ষা, ভারতবাসীর আয় এত কম যে তাহার উপর অধিকতর করভার পড়িয়াছে স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু ইংরেজাধীন ভারত ভূমিতেই এরূপ গুরুভার করের আদায় হয়, এমত নয়। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরাজের অনধীন, ভারতবর্ষের যে সকল ভাগ আছে, সেই সকলেও করভার অল্প নহে। হাইদ্রাবাদ রাজ্যে প্রতি ব্যক্তির রাজস্ব দান. ৪৴০ টাকা, হোলকার রাজ্যে ৭ টাকা, বরোদা রাজ্যে ৫ টাকা, সিন্ধিয়া রাজ্যে ৪ টাকা, কাশ্মীর রাজ্যে ৫৷৴০ টাকা, মহীশূর রাজ্যে ২৷৷০ টাকা। অতএব দেশীয় রাজাদিগের সহিত তুলনায় ইংরাজ অধিকারে করাদানের আধিক্য বোধ হয় না।

কিন্তু দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে যে কর গৃহীত হয়, তাহা অনেকটা দেশের ভিতরেই ব্যয়িত হয়, তাহাতে দেশের ধন দেশের কার্য্যে লাগে। কিন্তু ইংরাজাধিকৃত ভাগের যে রাজস্ব তাহার প্রায় চতুর্থাংশ সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইংলণ্ডে চলিয়া যায়। ভারতবর্ষের নিমিত্ত কখন আবশ্যক হইতেও পারে এইরূপ অনুমানে ঐদেশে যে সকল সৈনিক প্রস্তুত থাকে তাহার জন্য, ভারতবর্ষের রাজকার্য্য সম্বন্ধীয় বিলাতী আফিসের খরচের জন্য, ভারত-বর্ষকর্ত্তৃক পরিগৃহীত ঋণের বৃদ্ধির জন্য, এবং বাটা বিভ্রাট প্রভৃতি অন্যান্য বাবে সমুদায় রাজস্বের প্রায় চতুর্থাংশ ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিতে হয়। ইংলণ্ডে ঐরূপ খরচ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। ১৮৭৯ অব্দে কিঞ্চিন্ন্যূন ১৭ কোটি টাকা গবর্ণমেণ্টের ইংলণ্ডে খরচ হয়। ১৮৮৮ অব্দে ঐ খরচ প্রায় ২২ কোটি হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন, এখানে যে প্রায় ৭০-হাজার গোরা ফৌজ থাকে এবং প্রায় ১০-হাজার নানা ব্যবসায়ী ইংরাজ আছেন, তাঁহাদিগের বেতনাদির টাকাও অনেক পরিমাণে ইংলণ্ডে চলিয়া যায়। উহার পরিমাণ কত তাহা ভারতবর্ষের বাণিজ্যিকী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে কিছু অনুভূত হইতে পারে।

১৮৮৮—৮৯ অব্দে কয়েকটী প্রধান প্রধান দেশে আমদানি রপ্তানি যেরূপ হইয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে দেখান যাইতেছে।

দেশ	আমদানি কোটী টাকা,	রপ্তানি কোটি টাকা,
ইংলণ্ড	৪২৭	৩৩২
ইউনাইটেড দেশ	১৪৮	১৪৬
ইটালি	৪০	৩৫
ফ্রান্স	২০২	১৮১
জর্ম্মণি	২৫১	২৪২
হলণ্ড	১০	৯
জাপান	১৬	১৫
তুরুস্ক সাম্রাজ্য	১৬	১২
ভারতবর্ষ	৮০	৯৮
মিসর	৭	১০

এতদ্বারা দেখা যাইতেছে যে ভারতবর্ষ, এবং বৈদেশিক ঋণে বিক্রীত-প্রায় মিসর ব্যতীত উল্লিখিত সকল দেশেই রপ্তানির অপেক্ষা আমদানির পরিমাণ অধিক।

ভারতবর্ষ হইতে যত মাল রপ্তানি হয় তাহার মূল্য ৯৮ কোটি। ইংরাজ সওদাগরেরা শতকরা ১৫ টাকা হিসাবে লাভের গণনা করেন; অতএব ৯৮ কোটির উপর লাভ ১৪ কোটি পর্য্যন্ত হইতে পারে। সুতরাং যদি ভারতবর্ষের বাণিজিকী ব্যাপারটী সুস্থাবস্থ হইত, অর্থাৎ যদি বহির্ব্বাণিজ্যের লাভের টাকাও দেশে আসিয়া পৌঁছিত, তাহা হইলে আমদানির পরিমাণ (৯৮+১৪=১১২) এক শত বার কোটি হইতে পারিত। কিন্তু তাহা না হইয়া ৮০ কোটি মাত্র হয়। অতএব সুস্থা-বস্থারসহিত তুলনায় ভারতবর্ষের বার্ষিক ক্ষতি (১১২−৮০=৩২)

বত্রিশ কোটি টাকা বলিয়া ধরিতে হয়। আমাদের বাণিজ্য চেষ্টা না থাকায় আমরা ঐ ১৪ কোটি টাকার লাভভাগী হইতে অধিকারী নহি। কিন্তু যত যায় ততও আইসে না।

ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যে যত টাকার জিনিস বাহির হইয়া যায় তাহার অপেক্ষা ১৮ কোটি টাকার জিনিস কম আইসে। ঐ ১৮ কোটি, কতক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আর কতক পরম্পরাসম্বন্ধে ইংলণ্ডেই যায়। ইংলণ্ড হইতে কতক মূলধন রেলওয়ে এবং জলপ্রণালী প্রস্তুত করিবার জন্য এবং নীল, চা, কাফি প্রভৃতির চাসের জন্য, এবং চটের কল, তুলার কল, চিনির কল প্রভৃতি কারখানার জন্য, ইংরাজ কর্ত্তৃক এই দেশে আনীত হয়। ঐ মূলধনও ভারতবর্ষের মোট আমদানির অর্থাৎ ৮০ কোটি টাকার মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে থাকে। সুতরাং ভারতবর্ষের বার্ষিক ক্ষতি ১৮ কোটি মাত্র নহে, তাহার অপেক্ষা অধিক।

বৎসর বৎসর যে বৈদেশিক মূলধন আসিতেছে তাহার পরিমাণ ঠিক জানিবার উপায় নাই। রেলওয়ে কোম্পানিদের অংশে ও গবর্ণমেণ্টের ঋণে মোটামুটি আন্দাজ ৩০০ কোটি টাকা এক্ষণে ভারতের বাহিরের ঋণ দাঁড়াইয়াছে। গত ৫০ বৎসরের মধ্যেই এই ঋণের সৃষ্টি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ গড়ে প্রতি বৎসরে ৬ কোটি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন রাজা জমিদার প্রভৃতির ঋণ, কলকারখানা, চা-বাগান, ষ্টীমার প্রভৃতির জন্য টাকা আসিতেছে; সুতরাং গড়ে বার্ষিক আরও ২ কি ৩ কোটি মূলধন ঐ হিসাবে আসিতেছে মনে করা অসঙ্গত নহে। এইরূপ বাণিজ্যের গতি এবং অন্যান্য বিষয় অনুশীলন করিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে এখনই ভারতবর্ষের বৎসরে ২৬।২৭ কোটি টাকা সাক্ষাৎ লোকসান হইতেছে।

আরও একটী কথা বিবেচ্য আছে। গবর্ণমেণ্টের ইংলণ্ডে গৃহীত ঋণের এবং এদেশে ইংরাজ বণিকাদির প্রেরিত মূল-ধনের সুদ পরে আমাদের রপ্তানিকে ক্রমশই বর্দ্ধিত করিবে। এদেশে ইংলণ্ডের ন্যস্ত

মূলধন রেলওয়ে নির্ম্মাণেই সমধিক ব্যয়িত হইয়াছে। ১৮৮৫ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ ধনের পরিমাণ ১৮০-কোটি টাকা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে গবর্ণমেণ্টকে প্রজার স্থানে গৃহীত রাজস্ব হইতে ২৬ কোটি টাকা প্রদান করিয়া ইংলণ্ডীয় মূলধনীদিগের সুদ পোষাইয়া দিতে হইয়াছে। তবে আজি কালি আর তেমন ক্ষতি হইতেছে না। কোন কোন রেলওয়ে হইতে গবর্ণমেণ্টের কিছু কিছু লাভ হইতেও আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের অপর কতকটা মূলধন ভারতবর্ষের জলপ্রণালী নির্ম্মাণে বিনিযুক্ত হইয়াছে। সেই সকলের মধ্যে যে গুলি পূর্ব্বকালের অর্থাৎ হিন্দু এবং মুসলমান দিগের সময়ের জলপ্রণালীর পুনরুদ্ধার মাত্র সেই গুলি হইতেই কিছু কিছু লাভ থাকে, নূতন প্রণালীর মধ্যে কয়েকটী ভিন্ন প্রায় কোনটীতেই লাভ থাকে না, কিছু কিছু লোকসান হয়। তবে রেলওয়ে এবং খালে দেশীয় মজুরদারেরা কতকটা কাজ পায়।

রেলওয়ে এবং পূর্ত্তকার্য্যে তাদৃশ লাভ না হইবার কয়েকটী কারণ প্রধান বলিয়া উক্ত হয়। এক কারণ এই যে, উহাদিগের নির্ম্মাণে অযথারূপ মূলধন ব্যয় হইয়া যায়। দ্বিতীয় কারণ, উহাদিগের কার্য্য পরিচালনেও অপরিমিত খরচ হয়। তৃতীয় কারণ, সকল কাজ বুঝিয়া করা হয় না। চতুর্থ কারণ, কখন কখন ইংলণ্ডীয় বণিকদল ভারতবর্ষে কাজ করিতে আসিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিলে, যথেষ্ট মূল্য দিয়া তাহাদিগের কার-বার ক্রয় করিয়া লওয়া হয়।

রেলওয়ে এবং জলপ্রণালী নির্ম্মাণ এই দুইটী প্রধান কার্য্য ভিন্ন, নীল, চা, কাফির চাসে এবং পাট, তুলা এবং চিনির কারখানায় ইংলণ্ডের কতক মূলধন ভারতবর্ষে খাটে। ঐ গুলির উপর গবর্ণ-মেণ্টের টাকার, অর্থাৎ প্রজার প্রদত্ত রাজস্বের, কোন অংশ ব্যয়িত হয় না। সুতরাং ঐগুলিতে ভারতবর্ষের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন লোক-সান নাই। প্রত্যুত ঐ সকলের অবলম্বনে মজুরদার লোকেরা খাটিয়া খাইতে পায়।

ঐ সকল চাসের এবং কল-কারখানায় কাজে যত মজুর খাটে তাহার একটা স্থূল হিসাব করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে সর্ব্ব সমেত ৯১০টী ঐ প্রকার কারবার চলিতেছে। তাহার কোন কোনটী বৃহৎ এবং কোন কোনটী অতি সামান্য। যদি প্রত্যেক কারবারে গড়ে ৫০০ মজুর খাটে বলিয়া ধরা যায়, তবে ইংরাজদিগের চাস এবং কলকারখানাদিতে (৯১০ × ৫০০ = ৪৫৫০০০) মোটামুটি ৫ লক্ষ মজুরের অন্ন সংস্থান হইতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু যতই হউক, বিলাতী দ্রব্যের আমদানিতে আমাদের যে সকল ব্যবসায় মারা পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে, সেই সকল ব্যবসায়ের অবলম্বনে কত লক্ষ লক্ষ লোক অন্ন পাইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। লবণ প্রস্তুতকারী মলুঙ্গিদিগের সংখ্যাই বোধ হয়, ৫ লক্ষ ছিল।

ফলতঃ ইংরাজাধিকারে ভারতবর্ষীয় শিল্পজাতের বড়ই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যাহারা তন্তুবায়ের কিম্বা কর্ম্মকারের অথবা কাংস্যকারের ব্যবসায়দ্বারা অতি স্বচ্ছন্দ অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তাঁহারা সকলে আর স্ব স্ব ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে না। কলের কাপড় এবং সুতার আমদানি হওয়াতে, এবং বিলাতী ছুরি, কাটারি, কুদ্দাল প্রভৃতির আগমনে, আর লোহা, পিত্তল, এবং তাম্রের চাদর বিলাত হইতে আসাতে, এখানকার অনেক ব্যবসায়ীর ব্যবসায় লোপ পাইয়াছে।

১৮৮৯ অব্দে ৩১ কোটি টাকার সূতার বস্ত্র আসিয়াছিল। তদ্ভিন্ন তিন কোটি টাকার অন্যান্য বস্ত্র ৪১ লক্ষ টাকার ছাতা ৫ কোটি টাকার ধাতু ও ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যাদি, ৮৮ লক্ষ টাকার লবণ, ও ২ কোটি টাকার তৈল আসিয়াছিল।

এক মাত্র কার্পাস শিল্পনাশে ভারতবর্ষের আয় কত ন্যূন হইয়া গিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া দেখা যায় যে তুলার মণ ২০ টাকা ও বিলাতী বস্ত্রের মণ ৬৩ টাকা। প্রতি ২০ টাকার তুলায় প্রায় ৪০ টাকা

বৈদেশিক শিল্পীর মজুরি ও মহাজনদিগের লাভ। সুতরাং বাৎসরিক ৩১ কোটি টাকার কাপড় আমদানিতে এদেশে প্রায় ২০-কোটি টাকার ধনোৎপত্তি কমিতেছে। যদি এমনও মনে করা যায় যে, অন্যান্য শিল্পনাশে ভারতের যত লোকসান হয় তাহা ইংরাজ মুলধনীদিগের অধীন মজুরদারদিগের আয়ে পোষাইয়া যাইতেছে, তথাপি বিলাতের খরচ যোগানয়, বৈদেশিক ঋণে ও দেশীয় শিল্পনাশে বৎসরে ৪৬। ৪৭ কোটি টাকা লোকসান হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত হিসাবে এইরূপ প্রতীয়মান হয়।

ইউরোপীয় প্রধান প্রধান দেশে কৃষিজীবীর পরিমাণ কিরূপ হইয়া থাকে, তাহা দেখিলে ভারতবর্ষের শিল্প নাশের ফল আরও সুস্পষ্ট হইবে। শিল্প প্রধান ও সুসমৃদ্ধ দেশে কৃষিজীবীর সংখ্যা অত্যধিক হয় না। ইংলণ্ডের কর্ম্মণ্যলোকদিগের মধ্যে শতকরা ১৩ জন কৃষিজীবী; স্কটলণ্ডের ১৭ জন, আয়র্লণ্ডের ৪৩ জন, ইটালিকে ৪৪ জন, ফ্রান্সে ৪৬ জন, গ্রীসে ৪৯ জন, মার্কিন দেশে ৪৪ জন। সমস্ত ভারতবর্ষ-ব্যাপক আদমসুমারি তিন বার গৃহীত হইয়াছে, প্রথমবার ১৮৭১ অব্দে, দ্বিতীয় বার ১৮৮১ অব্দে ও তৃতীয় বার ১৮৯১ অব্দে। তৃতীয়বারের বিশেষ বিবরণ এখনও জানা যায় নাই। প্রথম বারের গণনার উপর নির্ভর করিয়া দুর্ভিক্ষ কমিশন ইংরাজাধীন ভারতবর্ষের জনগণের ব্যবসায়ানুযায়ী সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ অবধারণ করেন।

কৃষিজীবী	শতকরা	৫৬ জন।
বণিক, মজুর ও শিল্পী	”	৩৪ জন।
চাকরী ও উচ্চ ব্যবসায়ী	”	১০ জন।

১৮৮১ অব্দের গণনা হইতে দেখা যায় —

কৃষিজীবী	শতকরা	৬০ জন।
বণিক, মজুর ও শিল্পী	”	৩১·৫ জন।
চাকরী ও উচ্চ ব্যবসায়ী	”	৮·৫ জন।

পর পর আদমসুমারিতে মজুরদারদিগের সম্বন্ধে অধিকতর অনুসন্ধান হইলে কৃষিজীবীর পরিমাণ যে, আরও অধিক তাহা সহজেই দেখা

যাইবে। যাহা হউক, উপরিলিখিত বিবরণগুলি হইতেই বোধ হয় যে (১) ভারতবর্ষে কৃষিজীবীর পরিমাণ অন্যান্য সুস্থাবস্থ দেশের অপেক্ষা অধিক (২) বৈদেশিক শিল্পের প্রতিযোগিতায় এখানকার অনেকানেক লোক স্ব স্ব ব্যবসায়চ্যুত হইয়া কৃষিকার্য্যের উপর যাইয়া পড়িতেছে এবং কৃষিকার্য্যই ভারতবাসীর একমাত্র অবলম্বন হইবার উপক্রম হইয়াছে।

ভারতবর্ষের লোকেরা ক্রমে ক্রমে উচ্চ উচ্চ অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িতেছে—ইহাই ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা। ইহাই বৈদেশিক অধিকারের ফল। এই মহানিষ্ট নিবারণ করিবার উদ্দেশেই সুদূরদর্শী এবং উদারমতি ইংরাজ শাস্তৃগণ কেহবা এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের, কেহবা স্বদেশীয় বিদ্যাদানের, কেহবা স্বায়ত্ত শাসন-শক্তি প্রদানের চেষ্টা করিয়াছেন। সে সকল উপায় একান্ত নিস্ফল হয় নাই—কিন্তু পর্য্যাপ্তও হয় নাই। এখনও সমাজের উপরিভাগ নামিয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষের যে এতদূর দারিদ্র্য হইয়াছে, কিছু দিন পূর্ব্বে ইংরাজ রাজের তাহা স্পষ্টরূপে অনুভূত ছিল না। ভারতবর্ষকে সোণার গাছ বলিয়াই সকলের বোধ ছিল। এখনও যে ইংরাজ মাত্রেই এই দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। কিন্তু যখন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যের অবগতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন কালে দেশের পরিচালন এরূপে পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা, যাহাতে ইহার দারিদ্র্যদশা আরও বর্দ্ধিত না হয়; প্রত্যুত যাহাতে ভারতবাসীর এমন সচ্ছল অবস্থা হয় যে, ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত শিল্পজাত এখনকার অপেক্ষাও অধিকতর পরিমাণে ভারতবাসীর দ্বারা ক্রীত হইতে পারে।

স্বদেশীয় কাহার কাহার মনে এমন একটা ভ্রম আছে যে, এই দেশে ধনবিভাগের বৈষম্য নিবন্ধন ক্লেশ হয়। বস্তুগত্যা তাহা নহে। ইউরোপ এবং আমেরিকাতে লোকের যে প্রকার ভয়ানক ধনবৈষম্য জন্মিয়াছে, এখানে তাহার লক্ষাংশের একাংশও হয় নাই, হইতে পারেই না। এখানে উপরের স্তর সকল ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িতেছে এবং ভারতবাসী সকল লোক ক্রমে এক-সা হইয়া যাইতেছে।

১৮৭২ অব্দে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় ভারতের আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় যে বিজ্ঞাপনী দাখিল হইয়াছিল তাহা হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কত আয়ের কত লোক আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

প্রদেশ	৫০০ টাকা হইতে ১০০০এর নূ্যন আয়ের লোকসংখ্যা,	১০০০ হইতে ২০০০এরনূ্যন আয়ের লোকসংখ্যা,	২০০০ হইতে ১০০০০এরনূ্যন আয়ের লোকসংখ্যা,	১০০০০ হইতে ১ লক্ষেরনূ্যন আয়ের লোকসংখ্যা,	১ লক্ষের অধিক আয়ের লোকসংখ্যা,	৫০০ টাকা ও তদধিক আয়বানের সমষ্টি	২০০ টাকার অনূ্যন আয়বান সঃ কঃ সমেত
বাঙ্গালা	১৪২৯৪৭	২৬২০০	১৬৬৯১	২৫০৮	১৮০	১৮৮৫২৬	২৭৮৪৮২
মান্দ্রাজ	৪৬০৩৯	৯৩৯৮	৪৮২০	৪১৫	২২	৬০৬৯৪	১৩৯৫২৯
বোম্বাই	৭৯৩৭১	৩৭১২৭	১৪৭৪৯	১৪৫৬	২০৮	১৩২৯১১	২১৮৯৬৮
উঃ পঃ প্রদেশ	৫৪১৪৩	১২৩৫৯	৭১০৭	৮৩৮	২১	৭৪৪৬৮	২০০৪৯৩
অযোধ্যা	৭১৫৯	১৪৭৫	৯৯৮	৪৩৪	৩৮৬	১০৪৫২	৪৪২৩৮
পঞ্জাব	২৫২২৯	৫২৮০	২০৩১	১৫৮	২	৩২৭০০	৭৬০৩৪
ব্রহ্মদেশ	৭৫০৫	১১৯১	৫৬৯	২৭৯	১০	৯৫৫৪	৩৩১০২
মধ্য প্রদেশ	৮০৩৫	২৫৭৮	১৪১৫	১৫৪	৭	১২১৮৯	২৬১৯২
৫০০ টাকার অনূ্যন আয়ের (সঃ কঃ=) সরকারী কর্ম্মচারী	——	——	——	——	——	৫৮৫৬৮	——
মোট——	৩৭০৪২৮	৯৫৬০৮	৪৮৩৮০	৬২৪২	৮৩৬	৫৮০০৬২	১০১৭০৩৮

উপরি উক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে, লক্ষ টাকার অধিক আয়-বিশিষ্ট বড়মানুষ বাঙ্গালার জমিদার, অযোধ্যার তালুকদার ও বোম্বাইয়ের

সওদাগর ও জাইগীরদারদিগের মধ্যেই যাহা কিছু আছে, অন্যান্য প্রদেশে নাই বলিলেই চলে। এস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বড় বড় হৌসওয়ালা বৈদেশিক সওদাগরেরাও ঐ মোট ৮৩৬এর মধ্যেই আছেন।

সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইংরাজাধীন ভারতবর্ষের তৎকালীন ১৯ কোটি প্রজা সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যায় যে, শতকরা ·৩ জনের ৫০০ বা তদধিক টাকা বার্ষিক আয় এবং শতকরা ·৫৩ জনের আয় ২০০ টাকার অন্যূন।

ইংলণ্ড, ওয়েলস এবং স্কটলণ্ডের মোট প্রজা সংখ্যা ২ কোটি ৮০ লক্ষ। উহাদিগের মধ্যে ১৪ লক্ষের বার্ষিক আয় ১৫০ পৌণ্ড বা তদধিক। অর্থাৎ শতকরা ৫ জনের বার্ষিক আয় ১৫০০ (এখনকার হিসাবে ২০০০) টাকার অন্যূন। এই সকলের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক এরূপ অতুল আয়বান যে, গড়পড়তায় দেশস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ই ৩৪০ টাকা দাঁড়াইয়াছে। অথচ সকলেই স্বীকার করেন যে, ইংলণ্ডের মধ্যে যাহারা সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তরে আছে তাহারা, ইউরোপে দান ও আত্মীয় প্রতিপালন ধর্ম্মের প্রভাব না থাকায় এবং শীতপ্রধান দেশে বাস হেতু, এদেশের সর্ব্বাপেক্ষা গরীবদিগের অপেক্ষাও অধিক দুঃখভাগী। ইংলণ্ড এবং ওয়েলসে প্রতি ৩১ জনের মধ্যে এক জনকে দরিদ্রাবাসে খাটিয়া খাইতে হয়। এবং ৬৫ বৎসরের অধিক বয়স্ক যত লোক আছে তাহার মধ্যে শতকরা ৩৮ জনকে শেষ দশায় ঐ স্থলে গিয়া পড়িতে হয়।

ফলতঃ ইউরোপে যেরূপ ধন-বৈষম্য জন্মিয়াছে এখানে তাহার নাম গন্ধও নাই। অতএব জমিদার বা উকিল অথবা মহাজন ইহারাই দেশের সকল টাকা উদরসাৎ করিতেছে, কৃষক এবং শিল্পীরা সেই জন্যই নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে, স্বপ্নেও এরূপ মনে করিতে নাই। ওরূপ কথা বলিলে কেবল ইউরোপ সম্বন্ধে একটী সত্য কথার নিতান্ত মিথ্যা জল্পনা করা হইবে, গৃহের ছিদ্র আরও বিস্তৃত হইবে, সম্মিলন হইবার উপায় আরও ন্যূন হইয়া যাইবে এবং শত্রু হাসিবে মাত্র।

(জৈবনিক অবস্থা বিষয়ক।)

কোন দেশের লোক সমধিক নির্ধন হইলে সেই দেশে অনেকানেক দুর্লক্ষণ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে তদ্দেশবাসীদিগের জৈবনিক অবস্থা সম্পৃক্ত কোন দুর্লক্ষণ যদি জন্মিয়া থাকে, সেগুলি বিশেষ সাবধানতা-পূর্ব্বক লক্ষ্য করা আবশ্যক। দেশের দরিদ্রতা অতি বর্দ্ধিত হইলে (১) দেশবাসীদিগের খাদ্য পরিমাণ ন্যূন হয়, এবং খাদ্য সামগ্রীর প্রকৃতি অপকৃষ্ট হয় (২) সন্তানোৎপত্তি অল্প হয় এবং আয়ুষকাল স্বল্প হইয়া পড়ে।

এই সকল বিষয়ে ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, তাহা বিচার পূর্ব্বক নির্ণয় করিতে হইলে ভারতবাসীর বিভিন্ন সময়ের অবস্থার তুলনা করিয়া দেখিতে হয়। কারণ 'ন্যূনতা', 'অপকর্ষ', 'স্বল্পতা' প্রভৃতি শব্দগুলি সাপেক্ষ শব্দ। কোন কিছু 'ন্যূন' বা 'অপকৃষ্ট' বা 'স্বল্প' বলিলে, কাহার অপেক্ষা ন্যূন বা অপকৃষ্ট বা স্বল্প এই প্রশ্ন সহজেই উদিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবাসীর ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অবস্থা তুলনা করিয়া বুঝিবার কোন উপায় নাই বলিলেই হয়। মনে কর, প্রশ্ন হইল, এখন ভারতবাসী দীর্ঘায়ু হইতেছে অথবা স্বল্পায়ু হইতেছে। ১৮৮১ অব্দের আদমসুমারির বিজ্ঞাপনী হইতে জানা যায় যে, ঐ অব্দে ষষ্টি বৎসর এবং তাহার অধিক বয়স্ক লোকের সংখ্যা ১ কোটি অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৪ জন। ভারতবর্ষের পক্ষে বৃদ্ধ লোকের এই পরিমাণ অল্প বা অধিক হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিতে হইলে, ভূতপূর্ব্ব কোন সময়ে ৬০ বৎসর এবং তদধিক বয়স্ক শতকরা কত লোক ছিল, তাহা জানিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাহা জানিবার কোন উপায়ই নাই। আকবর বাদসাহের সময়ে, কি বিক্রমাদিত্যের সময়ে, কি সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতবর্ষে কত বৃদ্ধ লোক বাঁচিয়া ছিল, তাহা কেহই বলিতে বা অনুমান করিতেও পারেন না। উহা অপেক্ষা

স্থূল আর একটা কথা লইয়াই দেখ। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, দুর্ভিক্ষ পীড়া এখন অধিক হইতেছে, না পূর্ব্বকালের সমানই আছে, না কমিয়াছে, তাহা হইলে কোন কথাই দৃঢ়রূপে বলা যাইতে পারে না। ভারতবর্ষে হিন্দু এবং মুসলমানের অধিকার কালেও দুর্ভিক্ষ হইত, এখনও হইয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব্বে কতকাল অন্তর হইত, কত সময় ব্যাপিয়া থাকিত এবং কতদূর প্রসারিত হইত, তাহার কোন নির্ণয় নাই। এই মাত্র অনুমান করিতে পারা যায় যে, এখনকার দুর্ভিক্ষ যেমন প্রায় লাগিয়াই রহিয়াছে, অথবা এক বৎসর বা দুই বৎসর অনাবৃষ্টি বা অল্পবৃষ্টি হইলেই ঘটিতেছে, পূর্ব্বে তেমন শীঘ্র শীঘ্র হইত না। কিন্তু ঐ কথাটীও অনুমান মাত্র। যদি কেহ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, পূর্ব্বে সকল দুর্ভিক্ষের সম্বাদ পাওয়া যাইত না, তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারা যায়, এমন কোন অকাট্য প্রমাণ নাই।

উল্লিখিত দুইটী উদাহরণ দ্বারা অবশ্যই বোধ হইবে যে, পূর্ব্বগত কোন কালের সহিত তুলনা করিয়া ভারতবাসীর বর্ত্তমান অবস্থাকে ভাল অথবা মন্দ বলিতে পারিবার প্রকৃত পথ নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও এখন ভারতবাসীর জৈবনিক অবস্থা কিরূপ হইয়াছে তাহা জানিবার অনেকটা উপায় হইয়াছে এবং তাহা জানাতেই বিশেষ ফল।

ভারতবাসীর খাদ্য পরিমাণ ন্যূন হইয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্বে লোকে যত খাইতে পারিত এখন তত খাইতে পারে না, সকল লোকেরই এইরূপ বিশ্বাস। এক্ষণকার দুই তিন পুরুষ পূর্ব্বে যে সকল ভোজ দেশে হইত, যাঁহারা তাহার দুই একটীর হিসাব দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে, পূর্ব্বে লোক খাওয়াইতে যত দ্রব্যের আহরণ করিতে হইত, এখন সেই পরিমাণ লোক খাওয়াইতে তত দ্রব্যের আয়োজন করিতে হয় না। প্রসিদ্ধ দেবসেবাগুলির পূর্ব্বকালের যেরূপ বরাদ্দ ছিল তাহা দেখিলেও অনুমিত হইতে পারে যে, এখন পূর্ব্বের অপেক্ষা অল্প পরিমাণ দ্রব্যে অতিথিদিগের ভোজন নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

কিন্তু এই সকল প্রমাণ অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বসনীয় অপর একটী প্রমাণ আছে। এখানকার জেলের কয়েদীদিগের নিমিত্ত ইংরাজ ডাক্তরেরা অবধারিত করিয়াছেন যে, তণ্ডুল এবং দাইল এবং মৎস্যাদি উপকরণ সমস্তে প্রতি ব্যক্তির অন্ততঃ ১ সের, ১ পুয়া, ২ ছটাক, ২ তোলা ভক্ষ্য পাওয়া অত্যাবশ্যক। যাহারা তণ্ডুল খায় না, আটা খায়, তাহাদেরও প্রতি ব্যক্তির পক্ষে এক সের, দুই ছটাক, দুই তোলা খাদ্য পাওয়া আবশ্যক। উল্লিখিত পরিমাণের ন্যূন হইলে কয়েদীর শরীর সুস্থ থাকিতে পারে না। ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য ধরিয়া হিসাব করিলে প্রতি ব্যক্তির খোরাকী খরচ মাসিক ৪৲ টাকার ন্যূন হয় না। কিন্তু ইহা বাজার দর। কৃষিজীবী সম্প্রদায়কে অনেক জিনিস বাজার হইতে ক্রয় করিতে হয় না এবং বিক্রেতাকে লাভ দিতে হয় না। এজন্য সাধারণের পক্ষে খোরাকী খরচ গড়ে ৩৲ ধরা যায়। কিন্তু এই খোরাকী পূর্ণবয়া লোকের জন্যই প্রয়োজনীয়। যাহারা অল্প বয়স্ক অথবা বৃদ্ধ, তাহাদের পক্ষে ঐ পরিমাণ খোরাকীর প্রয়োজন হয় না। ২০ কোটি বৃটিশ ভারতবাসীর মধ্যে পূর্ণ-বয়স্ক অর্থাৎ ১৫ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক লোকের সংখ্যা ১২-কোটি; তাহার মধ্যে ৬ কোটি পুরুষ, ৬-কোটি স্ত্রীলোক। পুরুষ ৬-কোটির খোরাকী খরচ ডাক্তরদিগের উপদিষ্ট হিসাবে ধরিলে ২১৬ কোটি টাকা হয়। এবং ৬-কোটি স্ত্রীলোকের খোরাকী উহার চতুর্থাংশ ন্যূন ধরিলে ১৬২ কোটি টাকা হয়। অতএব উভয়ের খোরাকীতে (২১৬+১৬২=) ৩৭৮ কোটি টাকা পড়ে। শিশু এবং বৃদ্ধদিগের খোরাকী যদি পূর্ণ বয়স্কদিগের সিকিতে হয় বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ঐ খোরাকীতেও বার্ষিক ৭২ কোটি পড়ে। অতএব সমুদায় ভারতবাসীর বার্ষিক খোরাকী খরচ ডাক্তারদের মতানুসারে স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী হইতে হইলে ৪৫০ কোটি টাকা হয়। কিন্তু সমস্ত ভারতবাসীর রোজগার ৫৪০ কোটীর অধিক বলিয়া কেহই মনে করেন না। উহারই ভিতর হইতে রাজস্ব দান করিতে হয়, এবং আবাস ও বস্ত্রাদির জন্য

খরচ করিতে হয়। অতএব ভারতবাসীর খাদ্য যে, এত ন্যূন হইয়া আছে যে, তদ্দ্বারা শরীর সবল বা সুস্থ থাকিতে পারে না, তদ্বিষয়ে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, জেলের খোরাকী ডাক্তর সাহেবদিগের উপদেশানুযায়ী হয় না। কিন্তু যাহা হয় তাহাও জেলের বহিঃস্থিত প্রজাসাধারণের অপেক্ষা পর্য্যাপ্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী কেহ কেহ স্পষ্টাভিধানেই বলিয়াছেন যে, অন্যূন পাঁচ কোটি ভারতবাসী অর্দ্ধাশনে জীবন যাপন করে।

ভারতবাসীর খাদ্য অবশ্যই অপকৃষ্ট হইয়াছে। খরচের অনটন হওয়াতে লোকে আহারের ন্যূনতা করিতে বাধ্য হইলে, তাহার পূর্ব্ব হইতেই আহারের অপকর্ষ সাধন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্য সামগ্রী শস্যজাতের মধ্যে গোধূম, যব এবং চাউল ছিল। শাস্ত্রে ঐ তিনটী শস্যের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এখনকার কয়েকটী নূতন এবং প্রধান ভক্ষ্য শস্যের নাম বাজরা, মকাই, চিনে, জোয়ারি। ঐ গুলির নাম কোন সুপ্রচলিত সংস্কৃত পুস্তকে নাই। অতএব মনে করা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে উহাদের এরূপ প্রাধান্য ছিল না। পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে যে সকল প্রদেশে গোমের ব্যবহারই সমধিক ছিল, এখন সেই সকল স্থানে তণ্ডুল বাড়িয়াছে এবং বাজারাদি শস্যের বৃদ্ধি অপরিসীম হইয়াছে। এইটীই সাধারণ সংস্কার। গবর্ণমেণ্টের বিবিধ বিজ্ঞাপনী হইতেও জানা যায় যে বঙ্গবিভাগ ছাড়িয়া ধরিলে এখন বাজরা প্রভৃতি খাদ্য শস্য ২২ কোটি বিঘায়, গোধূম ৬ কোটি বিঘায় এবং ধান্যের চাস ৮ কোটি বিঘায় হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে চাউলের রপ্তানি ৮ কোটি টাকার হইতেছে গোধূম ৭॥ কোটি টাকার; বাজরাদিগরের রপ্তানি নাই; ডাইল ৩০ লক্ষ টাকার যায়। অতএব ভারতবাসী অপরাপর দেশবাসীদিগের নিমিত্ত যথেষ্ট গোধূম এবং তণ্ডুল পাঠাইয়া দিয়া আপনারা অধিকাংশেই বাজরাদিগর খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে প্রতিবর্ষে যত গোধূমের রপ্তানি হয় প্রায়

তত পরিমাণেই বাজরা মকাই প্রভৃতি তথায় আমদানি হয়। প্রধান মন্ত্রী লর্ড সালিসবরী সাহেবও বলিয়াছেন যে, ভারতবাসী বাজরাদিগর খাইয়াই থাকিতে পারে, অতএব ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডে গোধূমের আমদানী প্রসারিত হউক।

লোকের আহার যথোচিত না হইলে তাহাদের উৎপন্ন সন্তানের জীবন রক্ষা ভাল হয় না। কোন বিচক্ষণ ইংরাজ এই তথ্যের স্মরণ করিয়া এদেশে দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বলক্ষণ নিরূপণকরত বলিয়াছেন যে, ভারত-বর্ষের কোন প্রদেশে সন্তানোৎপত্তির হ্রাস বা অধিক শিশুর মৃত্যু হইতেছে দেখিলেই অনুভব করিতে হয় যে, তথায় খাদ্য সামগ্রী দুর্মূল্য হইয়াছে, এবং সত্বরেই দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। বাস্তবিক আহার-গ্রহণ এবং সন্তানোৎপাদন এই দুইটী ব্যাপারের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই আছে। উদ্ভিজ্জদিগের চাসে দেখা যায়, যদি মৃত্তিকায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সার না পড়ে, তবে গাছ সতেজ হইয়া উঠে না। এই কথা উদ্ভিজ্জের পক্ষেও যেমন খাটে, অপরাপর সকল জীব এবং মনুষ্যের পক্ষেও তেমনি খাটে।

এখন দেখা যাউক, ভারতবর্ষে সন্তানের উৎপত্তি এবং রক্ষা কি পরিমাণে হইতেছে। ইংরাজদিগের দেশে প্রতিবর্ষে প্রজাবৃদ্ধি শতকরা ১·০৭, যদি আয়র্লণ্ডে প্রজার স্বদেশত্যাগাদি জন্য বৎসর বৎসর সংখ্যা হ্রাস না হইত, তবে প্রায় ২ হইত। ফ্রান্সের প্রজাবৃদ্ধি ·৩, জর্ম্মণির ১·১, অষ্ট্রীয়ার ·৭, বেলজিয়মের ১·১, বেলজিয়মই ইউরোপের মধ্যে অতি নিবিড়-প্রজ দেশ। ডেনমার্কের ১, ইটালীর ·৬, স্পেনের ·৩ পোর্টু-গালের ১·১। ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গবিভাগে ·৮, মাদ্রাজ বোম্বাই এবং মধ্য-প্রদেশে ·৭, পঞ্জাবে ·৬ এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ·৩। মোটামুটি সমুদয় ভারতবর্ষের পক্ষে ·৬ ধরা যাইতে পারে।

যে সকল প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারী ভারতবর্ষে ১৮৮১ অব্দের আদম-সুমারি গ্রহণে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা ইংলণ্ডের তুলনায় ভারতবর্ষে

প্রজা বৃদ্ধির স্বল্পতার কোন হেতুই স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন নাই। কিন্তু প্রায় সকলেই এ দেশের বৈবাহিক প্রণালীর প্রতি কিছু কিছু কটাক্ষ করিয়াছেন। ভারতবাসীর যাহা কিছু অনিষ্ট ঘটে, তাহা ভারতবাসীর দোষেই ঘটে, এরূপ ভাবিয়া লইতে ইচ্ছা হওয়া অসঙ্গত নয়। এরূপ ইচ্ছার বশীভূত না হইলে, বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও কেন এমন অপ্রকৃতস্থলে দোষারোপ করিতে যাইবেন?

বস্তুতঃ ভারতবর্ষের বৈবাহিক-প্রণালীর তেমন কোন গুরুতর দোষই নাই। (১) এখানে বৈবাহিক সম্বন্ধের অল্পতা নাই। এখানে গৃহস্থাশ্রমী মাত্রেই বিবাহ করে। ইউরোপের উত্তর প্রান্তবর্ত্তী নরওয়ে-সুইডেন দেশে স্ত্রীজাতীয়দিগের মধ্যে প্রতি শতে ৬০·৮ অবিবাহিতা, ৩১·৮ বিবাহিতা এবং ৭·৪ বিধবা থাকে। ইংলণ্ডে ৫৯·২ অবিবাহিতা, ৩৩·৩ বিবাহিতা এবং ৭·৫ বিধবা। ইউরোপের দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী গ্রীসদেশে ৫৪·৩ অবিবাহিতা, ৩৪·৭ বিবাহিতা এবং ১১ বিধবা থাকে। ভারতবর্ষে অবিবাহিতা ৩১·৩ বিবাহিতা ৫০ এবং বিধবা ১৮·৭। অতএব স্পষ্টই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে বিবাহিতার পরিমাণ ইউরোপ অপেক্ষা অধিক। কোন ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, রোগিণী ভিন্ন, দেশের সকল স্ত্রীলোকেরই উদ্বাহ সূত্রে সম্বদ্ধ হওয়া উচিত। অতএব ইউরোপ অপেক্ষা ভারতবর্ষে যে, ঐ বৈজ্ঞানিক নীতিরই অধিক সুপালন হয়, তাহা অপক্ষপাতী ইউরোপীয় মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আদমসুমারির বিজ্ঞাপনী লেখক একটী ইংরাজও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, ২০ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কা স্ত্রীলোকর মধ্যে সধবার সংখ্যা শতকরা ইংলণ্ডের অপেক্ষা ভারতবর্ষে অধিক। অতএব ইংলণ্ডের অপেক্ষা ভারতবর্ষের বৈবাহিক প্রথা উৎকৃষ্টতর এবং প্রজাবৃদ্ধির অনুকূল।

(২) আদমসুমারির কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এদেশের প্রচলিত বাল্য বিবাহ প্রথার প্রতিকূলে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে কোন

যুক্তিপ্রদর্শন করেন নাই। যুক্তির মধ্যে এইমাত্র বুঝা যায় যে, এখানকার বিবাহরীতি ইংলণ্ডের রীতির সহিত মিলে না! কিন্তু এ বিষয়েও বিজ্ঞানের মত লওয়া যাইতে পারে। উদ্বাহসূত্রে সম্বদ্ধ প্রতি দম্পতীর ন্যূনকল্পে চারিটি করিয়া সন্তান হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে বংশ থাকে না, কারণ যত সন্তান জন্মে গড়ে তাহার অর্দ্ধেক অপূর্ণাবস্থাতেই মারা গিয়া থাকে। চারিটী সন্তানের জন্মলাভে এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় মাতার পালনে দশ বার বৎসর কাল লাগে। সুতরাং যদি দেশভেদে আয়ুষ্মত্তার ভেদ হয়, অর্থাৎ কোন দেশের লোক অধিক কাল বাঁচে আর কাহারাও বা অল্প কাল বাঁচে এমত হয়, তবে যে দেশের লোকের আয়ুষ্মত্তার যে পরিমাণ, সেই পরিমাণের সহিত বৈবাহিক বয়সেরও একটী নিত্য সম্বন্ধ হইয়া যায়। বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা আপনাপন সাহজিক সংস্কারের প্রভাবেই ঐ বৈবাহিক কালের অবধারণ করিয়া লইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। নরওয়ে-সুইডেনে লোকের আয়ুষ্মত্তা গড়ে ৪২ বৎসর; ঐ দেশের বৈবাহিক বয়স ৩০ বৎসর। ইংলণ্ডে আয়ুষ্মত্তা ৩৫ বৎসর; ওখানে বৈবাহিক বয়স ২১ বৎসর। ফ্রান্সে আয়ুষ্মত্তা ৩০ বৎসর, বৈবাহিক বয়স ১৯ বৎসর। ইটালী এবং গ্রীসে আয়ুষ্মত্তা ২৮ বৎসর, বৈবাহিক বয়স ১৬ বৎসর। ভারতবর্ষে আয়ুষ্মত্তা ২৫ বৎসর, এখানকার প্রকৃত বৈবাহিক (দ্বিরাগমনের) বয়স ১৩ বৎসর। অতএব ভারতবাসীর বৈবাহিক বয়সের নিয়ম, অন্যান্য জাতীয়দিগের নিয়মের ন্যায় সাহজিক সংস্কার হইতে সমুত্থিত এবং প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিচারে সম্পূর্ণরূপে সুসঙ্গত।

আদমসুমারির কর্তৃপক্ষীয়েরা আর একটী কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ভারতবর্ষে বৈবাহিক বয়োবৈষম্য অধিক, অর্থাৎ এখানে পুরুষের বয়স খুব বেশী এবং কন্যার বয়স খুব কম হয়। কিন্তু তাঁহারা এই ব্যবস্থার কোন বিশেষ দোষের উল্লেখ করেন নাই। এই মাত্র আন্দাজ করিয়াছেন যে, ঐ কারণে এ দেশে পুত্র সন্তান অধিক এবং কন্যা সন্তান অল্প হয়। কিন্তু ভারতবাসীর

মধ্যে যে পুরুষের সংখ্যা তেমন অধিক এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা তেমন অল্প, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা নহে। সকল স্ত্রীলোকের সংখ্যা না হওয়াই ঐ সংখ্যা বৈষম্যের প্রধান কারণ। ১৮৭১ সালের আদমসুমারিতে যত বৈষম্য দেখা গিয়াছিল ১৮৮১ সালে তত দেখা যায় নাই। যদি প্রকৃতপক্ষেই কিছু ইতর বিশেষ থাকে, তাহাও ইউরোপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্ম প্রধান গ্রীস এবং ইটালীর আদমসুমারিতেও যেরূপ অল্প পরিমাণ দেখা যায়, সেইরূপই থাকিবে, তাহার অধিক হইবে না। ইংলণ্ডেও পুত্র সন্তান অধিক জন্মে।

(৪) যাঁহারা ভারতবাসীর বৈবাহিক প্রণালীর প্রতি দোষারোপ পূর্ব্বক তাহাতে ভারতবাসীর সমস্ত দুরবস্থার হেতু নির্দ্দেশ করিতে সমুৎসুক, তাঁহারা যে, এখানকার বিধবা বিবাহ প্রতিষেধের উল্লেখ করিবেন তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বস্তুতঃ ঐ সম্বন্ধে তাঁহাদের নিন্দাবাদ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই বোধ হয়। প্রথমতঃ, দেখা যায় যে, হিন্দু-সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ শ্রমজীবীদিগের মধ্যে প্রদেশভেদে অধিক বা অল্প পরিমাণে বিধবা বিবাহ প্রচলৎ আছে। দ্বিতীয়তঃ আদমসুমারির বিজ্ঞাপনী হইতেই দেখা যায় যে, বিধবার সংখ্যা হিন্দু স্ত্রীজাতীয়ার মধ্যে শতকরা ১৯.৭, মুসলমানের ১৭.১, জৈনের ২১.৬, খৃষ্টানের ১৫.৫ এবং আদিমদিগের ৮। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মুসলমান এবং খৃষ্টানাদির মধ্যে বিধবা বিবাহের কোন শাস্ত্রীয় প্রতিষেধ না থাকিলেও ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা এদেশে বিধবার বিবাহ অধিক দেন না। আদমসুমারির বিজ্ঞাপকেরা এই তথ্যের সিদ্ধান্তে প্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছেন যে, এখানে হিন্দুই অধিকসংখ্যক এবং প্রবল; এই জন্য এ দেশে অপর সকলে হিন্দুরই অনুকরণ করে, এবং তাহা করিবার ইচ্ছাতে স্বধর্ম্মাবলম্বী বিধবাদিগের বিবাহ দেয় না। এ কথা নিতান্ত অমূলক নয়। অমূলক কি, ইহাই সমস্ত ভারতবাসীর এক সামাজিকতার মূলসূত্র। ভারতবর্ষে হিন্দুরই সম্যক্ প্রাধান্য এবং স্থূলতঃ হিন্দুর আচার

ব্যবহারই এ দেশের যোগ্য এবং সকলের অনুকরণীয়। ফলতঃ ভারতবর্ষে বিধবার বিবাহ স্বল্পসংখ্যক হইবার সাহজিক কারণই আছে। গ্রীস এবং ইটালী প্রভৃতি দেশ ইউরোপের দক্ষিণ প্রান্তবর্ত্তী, সুতরাং অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্ম-প্রধান। ঐ দেশগুলিতে বিধবার সংখ্যা ইউরোপের শীত-প্রধান ভাগগুলির অপেক্ষা অনেক অধিক। ও সকল দেশে ত হিন্দু প্রবল এবং অনুকরণীয় হয় নাই! গ্রীস এবং ইটালীতে বিধবার সংখ্যা শতকরা ১২ এবং নরওয়ে সুইডেনে ৩ মাত্র। যদি তুরস্ক, মিসর, পারস্য প্রভৃতি দেশের তেমন আদমসুমারি পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষের বিধবা সংখ্যার সহিত (শতকরা ১৮-৭ সহিত) মিলিয়া যাইত বলিয়াই বোধ হয়। বস্তুতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যৌবধর্ম্মের হ্রাস শীঘ্র হয়—এই মুখ্য কারণেই ঐ সকল দেশে বিধবার সংখ্যা অধিক থাকিয়া যায়।

অতএব প্রকৃত দৃষ্টিতে দর্শন করিতে পারিলে, ভারতবাসীর বৈবাহিক প্রণালীতে এমন কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা ভারতবর্ষের প্রজাবৃদ্ধির অল্পতার কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে প্রজার বৃদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম হইতেছে। কম হইবার কারণ, সন্তান জনন শক্তির হ্রাস নহে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, প্রতিবর্ষে এই বাঙ্গালা বিভাগের মধ্যেই ৩০ লক্ষ সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ঐ কথা হইতে অনুমান করিয়া সমুদায় ভারতবর্ষে ৮০ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৪টী সন্তান জন্মে ধরা যাইতে পারে। ইংলণ্ডে ইহা হইতে কিছু ন্যূন পরিমাণই সন্তান জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এখানে উৎপত্তির পরিমাণ কিঞ্চিদধিক হইয়াও প্রজার বৃদ্ধি কম হয়। বস্তুতঃ ভারতবর্ষজাত সন্তানগুলির শৈশবে মৃত্যুর পরিমাণ অতি বিসদৃশই হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সুভিক্ষের বর্ষে ভারতবর্ষীয় বৈবাহিক প্রণালীর গুণে সন্তানোৎপত্তি এখনও কম হয় না। কিন্তু শিশু মৃত্যু এত অধিক হইতেছে যে, তন্নিবন্ধন সমস্ত লোকের আয়ুর গড় পড়তা অর্থাৎ দেশের সাধারণ আয়ুষ কাল পঞ্চবিংশতি বর্ষের অনধিক

ভারতবর্ষে প্রজাবৃদ্ধিঅপেক্ষাকৃত ন্যূন হইবার কারণ বৈবাহিক সম্বন্ধের অল্পতা নয়, লোক সকলের অবৈধ আচরণ নয়, জনন শক্তির হ্রাস নয়, ইহার কারণ এক মাত্র দরিদ্রতা ভিন্ন আর কিছুই অনুভূত হয় না। যদি এখানকার বৈবাহিক রীতি ইউরোপীয় দেশগুলির রীতির ন্যায় হইত, অর্থাৎ ঐ রীতি অল্প মাত্রায় পালিত, তুচ্ছীকৃত এবং অসাময়িক হইত, তাহা হইলে এত দিনে ভারত নিতান্ত স্বল্পপ্রজ হইয়া ইউ-রোপীয়দিগের উপনিবেশযোগ্য হইয়া পড়িত। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, কোন দেশে আহার্য্যোৎপত্তি পূর্ণমাত্রা প্রাপ্ত হইয়া গেলে তথায় আর প্রজাবৃদ্ধি হইতে পারে না। তখন জন্ম মৃত্যুর পরিমাণ এক হারে হইয়া প্রজার সংখ্যা স্থির থাকে। আজও ভূমণ্ডলের কোন দেশই ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। ভারতবর্ষের ভূমি এত উর্ব্বরা এবং উহাতে সর্ব্বত্রই এত অনাবাদী ভূমি পতিত আছে যে, ভারতবর্ষে প্রজা সংখ্যার পূর্ণতা নিকটবর্ত্তী হওয়াতেই প্রজাবৃদ্ধির হার ন্যূন হইয়াছে এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এখানকার আদমসুমারির কাগজ পত্র সমুদায় আলোচনা করিয়া একজন সুতীক্ষ্ণদৃষ্টি ইংলণ্ডবাসী পণ্ডিত বলিয়াছেন "মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতেই ভারতবর্ষে প্রজা সংখ্যার তাদৃশ বৃদ্ধি নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য নিবন্ধন ভারতবর্ষের উপর এমন প্রবল প্রতিযোগিতার ভার পড়িয়াছে যে, তজ্জন্য দেশবাসিগণের পুরুষে পুরুষে আহার্য্য কমিয়া যাইতেছে এবং উৎপন্ন প্রজার সংখ্যাবৃদ্ধি ন্যূন হইয়া পড়িতেছে।"

ভারত সমাজের পরিণাম কিরূপ হইতে পারে, ইহার অনুমান করিতে গিয়া দৃষ্ট হইয়াছে যে, (১) পণ্ডিতপ্রবর অগষ্ট কোমটি মানব জাতি সাধারণের ভাবী ধর্ম্ম এবং শাসনাদি সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সেই মত সর্ব্ববাদিগ্রাহ্য হইতে পারে না, এবং (২) ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রী ও বিধ্বস্তৃ দলের অনুযায়ী পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়া এখানকার সমাজের প্রকৃতি সম্যক্ ভাবান্তরতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, (৩) ইউরোপীয়দিগের কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে উপনিবেশ সংস্থাপনের সম্ভাবনা অতি সুদূরবর্ত্তী কোন ভবিষ্য কালকে কথঞ্চিৎ লক্ষ্য করিলেও করিতে পারে, কিন্তু কি বর্ত্তমান কি অনতিদূরবর্ত্তী কোন কালের সহিত তাদৃশ ঘটনার কোন সম্পর্ক নাই। দৃষ্ট হইয়াছে যে ভারতবাসীর (৪) ধর্ম্মজ্ঞান যে উচ্চতম অক্ষয় বস্তু তাহার বিলোপের কোন শঙ্কাই হইতে পারে না, এবং (৫) ভারতবর্ষ প্রচলিত বিভিন্ন ভাষাগুলির সমীকরণ বুদ্ধি বিলক্ষণ সম্ভবপর। ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ভারতবাসীর (৬) বর্ত্তমান সামাজিক রীতির মূল স্বরূপ যে জাতিভেদ প্রথা তাহা কোন সামান্য কাল্পনিক বস্তু নহে, নৈসর্গিক কারণ হইতেই সম্ভূত; সুতরাং উহা হঠাৎকারে এবং স্থায়ীরূপে উঠিয়া যাইতে পারে না। পরিশেষে ভারতবাসীর (৭) বর্ত্তমান ধনহীনতা এবং (৮) জীবন ক্ষীণতার সম্বন্ধে দেখা গিয়াছে যে, আমাদিগের অবস্থার প্রতি দেশাধিপতির এবং তজ্জাতীয় বিচক্ষণ পণ্ডিতদিগের সযত্ন দৃষ্টিপাত আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং দেশীয় জনগণের প্রকৃত উদ্যোগ হইলে অধঃপাতের প্রতিবিধান চেষ্টায় সফলতা লাভ হইলেও হইতে পারে।

ইউরোপখণ্ডের ইতিবৃত্ত মাত্র পাঠ করিয়া ঐতিহাসিক পরিণাম সম্বন্ধে আমাদের যে সকল স্থূল সিদ্ধান্ত হইয়া যায়, সেই সকল সিদ্ধান্তকে সমীচীন মনে করিয়া ভারত সমাজের সংস্কার সাধন চেষ্টা করায় বৈফল্যের এবং অনিষ্টোৎপত্তির সম্ভাবনা। সকল দেশের সমাজ গঠনপ্রণালী একরূপ নহে। ইউরোপীয় সমাজ সকল যে প্রকার গঠিত হইয়া

উঠিয়াছে, আসিয়াখণ্ডের বিভিন্ন সমাজগুলি ঠিক সেই প্রণালীতে গঠিত হয় নাই। আসিয়াখণ্ডে ধর্ম্মশাসনের প্রাবল্য। ইউরোপে বৈষয়িক ভোগ-বাসনার আতিশয্য। আসিয়াখণ্ডে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে তিতিক্ষার শিক্ষা, ইউরোপে স্বার্থরক্ষার শিক্ষা এবং অভ্যাস। ভারতবর্ষের সামাজিক গঠন, যদি একমাত্র জাতিভেদ প্রথাকে ছাড়িয়া দিয়া দেখা যায়, তবে চীনীয় জাপানীয় প্রভৃতি আসিয়িক জাতিদিগের সহিত অধিক মিলে। জাপান এবং চীন যে সম্প্রতি প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং ক্রমে ইউরোপীয় জাতিদিগের তুল্য মূল্য হইবার উপক্রম করিতেছে, তাহার পথ যে ইউরোপীয়দিগের অনুসৃত পথ হইতে ভিন্নরূপ তদ্বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। জাপানীয়দিগের সৈন্য বৃদ্ধি এবং যুদ্ধপোত বৃদ্ধির প্রয়োজন হইল। তাহাদের ভূম্যধিকারীরা স্বেচ্ছাতঃ আপনাদিগের ভূমি সম্পত্তি সমুদায় সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করিল এবং আপনারা সম্রাটের বৃত্তিভোগী হইয়া থাকিল। ইউরোপের ইতিহাসে কোথাও এমন ব্যাপারের নামগন্ধও পাওয়া যায় না। ইউরোপে ভূম্যধিকারীর বল খর্ব্ব হইয়া রাজার বল বৃদ্ধি হইতে কত রক্তারক্তি কাণ্ড হইয়া গিয়াছে এবং কত কাল বিলম্ব হইয়াছে। আবার দেখ, জাপানীয়েরা ইউরোপের শাসন-প্রণালীর প্রকৃতি অবগত হইয়া ইচ্ছা করিল যে, তাহাদের দেশেও ঐ প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। এই অভিলাষে তাহারা সম্রাটের নিকট আবেদন করিল। তাহাদের আবেদন গ্রাহ্য হইল, এবং জাপানে প্রজা নির্ব্বাচিত পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল। ইউরোপের কোনও দেশে কি এরূপে শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্ত হইয়াছে? ওখানকার সকল দেশেই পার্লিয়ামেণ্টের উদ্ভাবন, সংস্থাপন এবং বলবর্দ্ধন করিতে অনেক গোলমাল এবং অনেক বিবাদ বিসম্বাদ হইয়া গিয়াছে।

সে দিন দেখিলাম এক জন বিচক্ষণ ইংরাজ চীন সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, চীনের সম্রাটেরা যদিও সর্ব্বতোভাবে নিরঙ্কুষ, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, তথাপি চীনের শাসন কার্য্য অতি সু-

শৃঙ্খলা পূর্ব্বকই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। তিনি বলেন যে, চীনের রাজা এবং প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের শিক্ষা, সংস্কার এবং অভ্যাস এরূপ যে, তাঁহারা একমাত্র প্রজার শুভ সাধনের প্রতি তন্মনস্ক হইয়া অতি পরিশ্রম সহকারে আপনাপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং তদ্বিপরীতাচরণকে অধর্ম্ম জানিয়া তাহা পরিহার করেন। অতএব প্রজার হিতের নিমিত্ত রাজার সৃষ্টি, রাজার হিতের নিমিত্ত প্রজার সৃষ্টি নয়, এই তথ্য জ্ঞানের লাভ করিতে ইউরোপখণ্ডে যত বিবাদ বিসম্বাদ হইয়াছে চীন দেশে সেই তথ্যজ্ঞান ধর্ম্মমূলক বলিয়া একেবারে সংস্কারবদ্ধ হইয়া আছে।

বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল দেশে ঐতিহাসিক পরিণাম একমাত্র রূপ ধারণ করিয়া চলে না। সমাজভেদে তাহার রূপান্তরতা ঘটিয়া থাকে। এই জন্য বিজাতীয়ের অনুকরণমাত্রকে অবলম্বন করিয়া কোথাও কোন সমাজের সম্যক শুভ সাধন হইতে পারে না। কি রাজ-নৈতিক, কি সমাজ-নৈতিক, কি পারিবারিক, সকল ব্যবস্থাই দেশভেদে কিছু কিছু পৃথক হইয়া আছে এবং পৃথক থাকাই ভাল। দেখ, ইউরোপখণ্ডে রাজনীতি লইয়া নিরন্তর আন্দোলন চলিয়া থাকে, কিন্তু সেরূপ আন্দোলন চীন এবং জাপানের পক্ষে আবশ্যক হয় নাই। ঐ দুইটী দেশে সেরূপ আন্দোলন না হইয়াও তথায় প্রয়োজনানুরূপ ইউরোপীয় শিল্প ও সমর প্রণালী পরিগৃহীত হইয়াছে। আমার বোধ হয় যে, ভারতবর্ষেও ইউরোপীয় প্রণালীর অনুরূপ রাজনৈতিক আন্দোলন প্রয়োজনীয় কি না, তাহা এ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া বুঝা হয় নাই; গতানুগতিকতা বশতই ইংরাজীশিক্ষিত দেশীয় জনগণ ঐ প্রণালীর অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। আরও দেখ, ইউরোপ খণ্ডের সমাজগুলিতে সাম্য ভাবের বৃদ্ধি করাই সমাজোন্নতির বিশিষ্ট পথ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। ওখানকার ভূম্যধিকারী কুলীনবর্গের ক্ষমতা এবং অধিকার পূর্ব্বাপেক্ষায় ন্যূন হইয়াছে; আরও ন্যূন করিয়া দেওয়া অনেকানেক রাজনৈতিকের অভিমত। কিন্তু ভারতবর্ষে রাজা, মহারাজা, নবাব, সুবা, জমিদার এবং ব্রাহ্মণাদি স্বসমাজভুক্তদিগের পদমর্য্যাদার এবং

গৌরবের লোপ করিতে গেলে নিতান্ত অপথে পদার্পণ হইবার সম্ভাবনা। ইউরোপে বৈবাহিক বন্ধনটীকে চুক্তির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট করা পারিবারিক শুভ সাধন বলিয়া অনেকে গণ্য করেন। কিন্তু বিবাহকে চুক্তিতে পরিণত করা ভারতবর্ষে সংশোধন কার্য্য না হইয়া নিতান্ত অপুণ্যকর্ম্ম বলিয়াই গণ্য হইতে পারে। কোন্ মহাপুরুষ কর্তৃক এই প্রকার নানা সন্দেহের ভঞ্জন হইবে?

কার্য্যপ্রবৃত্তি মনুষ্যের স্বতঃসিদ্ধ। সেই প্রবৃত্তির বলে লোকে অনেক সময়ে কর্ত্তব্যাবধারণের পূর্ব্বেও কাজ করিতে যায়। সেই জন্য হঠকারিতাও জন্মে। ভারতবর্ষে যে, কোন না কোন প্রকার সংস্কার কার্য্যের নিমিত্ত অনেকেই সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছেন এবং ব্যস্তভাবে একটা না একটা কিছু করিতে বা করাইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ঐ কার্য্য-প্রবৃত্তিই তাহার অন্যতম মুখ্য কারণ। বস্তুতঃ কর্ত্তব্য-বোধ-প্রণোদিত সমাজ সংস্কার কার্য্যেও হঠকারিতার উপস্থিতি হইয়া থাকে। এই জন্য সংস্কার কার্য্যে ধৈর্য্যাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অধিক। ভারত সমাজ হীনাবস্থ হইতেছে, ইহার হীনাবস্থা কোন কোন বিষয় লইয়া এবং তাহার প্রকৃত কারণ কি, ইহা নিপুণ হইয়া জানিতে হয় এবং দেখিতে হয় যে, বর্ত্তমান হীনাবস্থা আরও হীনতর হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, এবং হীনতাবৃদ্ধির অভিমুখ কোন্ দিকে। এই সকল বিষয় নিঃসন্দিগ্ধ রূপে স্থির হইলেই কর্ত্তব্য নির্ণয়টী যথাযথরূপ হইতে পারে, নচেৎ কেবল উদ্বেগ, অধৈর্য্য, অস্থৈর্য্য এবং বিড়ম্বনা সার হয়। যিনি সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে কর্ত্তব্যের পথ অবধারিত করিয়া দিতে পারিবেন, তিনিই আমাদের প্রকৃত সংস্কারক হইবেন।

ভবিষ্য বিচার দ্বারা ভারতবাসীর যে যে বিষয়ে হীনাবস্থা বৃদ্ধির শঙ্কা হইতে পারে, সেই সেই বিষয় লক্ষ্য করিয়াই আমাদিগের কর্ত্তব্য নির্ণয় করা আবশ্যক। সমুদায় সমাজটীকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার চেষ্টা করা অবৈধ এবং অফল। আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, যত দিন আমা-

দিগের মধ্যে তাদৃশ কোন নেতৃ মহাপুরুষের আবির্ভাব না হইতেছে, তাবৎ কাল আমরা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ভারত-গবর্ণমেণ্টকেই রাজনৈতিক বিষয়ে আপনাদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহায় স্বরূপে লইয়া চলিলে নিতান্ত অকৃতকার্য্য হইব না। এতদ্দেশাগত বেসরকারী ইংরাজদিগের অথবা বিলাতের ইংরাজ-রাজনৈতিকদিগের আন্দোলন প্রণালী আমাদের অবস্থা এবং প্রকৃতির উপযোগী নহে। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক দলাদলিতে আমাদের মিশ্রিত হওয়া যেমন অকর্ত্তব্য, বে-সরকারী ইংরাজদিগের সহিত মিলিত হইয়া গবর্ণমেণ্টের কোন অনুষ্ঠানের প্রতিকূলে আন্দোলন করিতে যাওয়া তেমনি মূর্খতার কার্য্য। সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত যে, বিলাতী উদারনৈতিক এবং রক্ষণশীল উভয় দলই আমাদের পক্ষে সমান। যদিও বিলাতবাসী ইংরাজের অথবা এতদ্দেশাগত ইংরাজের চাপে বা মন রাখিতেগিয়া গবর্ণমেণ্ট কথঞ্চিৎ এমন কাজ করিয়া ফেলেন যে তজ্জন্য আমাদের ক্ষুব্ধ হইতে হয়, তথাপি ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে আমাদের আজীবনের সহিত বিলাতী ও এতদ্দেশাগত বে-সরকারী ইংরাজদিগের প্রথর স্বার্থের যতটা বিরোধ গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থের কথনই ততটা প্রভেদ হইতে পারে না। এ দেশে বড় লোকের আবির্ভাব গবর্ণমেণ্টের অনভিপ্রেত, ইংরাজ-কর্ম্মচারীর মুখেও এরূপ হঠবাদ অসঙ্গত এবং অশ্রদ্ধেয়।

ভারতবাসীর ক্ষমতা ন্যূন হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসী আপনাকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিতে অশক্ত, আপনার সুশাসনে আপনি অক্ষম, নিজের দেশটীকেই নিজে মিলাইয়া এক করিতে পারেন নাই। এখন ত সমস্ত দেশ একচ্ছত্রে মিলিত হইয়াছে, তথাপি উহাকে স্বশক্তিতে একত্র করিয়া রাখিতে পারেন বলিয়া মনে করিতে পারেন না। সুতরাং ভারতবাসীর পক্ষে অপরের সাহায্য অত্যাবশ্যক। ভারতবর্ষ সেই অত্যাবশ্যক সহায়তা ইংলণ্ডের স্থানে পাইতেছেন। ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতেছেন, ইহার সুশাসন করিতেছেন, ইহাকে মিলাইয়া তুলিয়াছেন, ইহাকে সম্মিলিত রাখিতেছেন।

অতএব ইংলণ্ড আমাদের গৌরবের, কৃতজ্ঞতার, সম্মানের এবং প্রেমের পাত্র হইয়াছেন। ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষের যতটা উপকার হইয়াছে, অপর কোন ইউরোপীয় জাতি কর্ত্তৃক ততটা হইতে পারিত না। যদি ফ্রান্সই ইহার অধিকারী হইতেন, তিনিও ইংলণ্ডের প্রবলতর আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিতে পারিতেন না। পোর্ত্তুগীজ এবং ওলন্দাজদিগের ত কথাই নাই। কিন্তু ইংলণ্ড কেবল মাত্র পরাক্রমেই যে অপর সকল ইউরোপীয় দেশ অপেক্ষা উচ্চতম তাহা নহে। অপর সকল ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা ইংরাজের ধৈর্য্য এবং গাম্ভীর্য্য অধিকতর, এবং তাঁহার ন্যায়ানুগামিতা স্থিরতর। অতএব যখন ভারতবাসীর অবস্থা এমন যে, তাঁহাকে অপরের অধীন হইতেই হয়, তখন আর কাহার না হইয়া যে ইংরাজের অধীন হইয়াছেন, ইহা সৌভাগ্য বলিয়াই স্বীকার্য্য।

ইংরাজী-শিক্ষিত সুতরাং ইংরাজ নীতি এবং চরিত্রে যাঁহারা অধিক অভিজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের হৃদয়ে একটী বিশেষ ভাব সঞ্চিত হয়। তাঁহারা জানেন যে, বীরপ্রকৃতিক ইংরাজ যাহার প্রতি শ্রদ্ধা করিতে পারেন না তাহার প্রতি প্রীতিসম্পন্ন হইতেও পারেন না। এই ভাব হইতে ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে এক প্রকার স্বচেষ্টার বাহুল্য হইয়াছে—রাজনৈতিক এবং সমাজ-নৈতিক সমিতির সংঘটন হইয়াছে, সংবাদপত্রাদির সৃষ্টি হইয়াছে, সমুদায় দেশ ব্যাপিয়া বিবিধ প্রকার আন্দোলনের ঢেউ উঠিয়াছে, এবং নানা প্রকার সংস্কারের কল্পনা এবং চেষ্টা চলিতেছে।

কিন্তু ভারতবাসী ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া স্বয়ং সিদ্ধের ন্যায় এপর্য্যন্ত কোন প্রধান রাজনৈতিক কার্য্যসম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারেন নাই। আমি যতদূর জানি তাহাতে বলিতে পারি যে, খ্যাতনামা অনেকানেক দেশীয় রাজনৈতিক ভিতরে ভিতরে ইংরাজ বিশেষের উপদেশ এবং পরামর্শ লাভ করিয়াই যাহা কিছু কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়া সভায় জর্জ টমসনের আবির্ভাব হইতে কংগ্রেসের জীবাত্মা স্বরূপ হিউম সাহেবের নাম স্মরণ করিলেই আমাদের প্রকৃত অবস্থার অববোধ হইবে।

ফলতঃ রাজনৈতিক বিষয়ে বে-সরকারী ইংরাজের সাহায্য এক্ষণে আমাদের এক মাত্র অবলম্ব হইয়া আছে। কিন্তু ঐ অবলম্ব গ্রহণ আমাদের পক্ষে কোন মতেই নির্দ্দোষ নহে। উহার প্রধান দোষ দুইটী। এক দোষ এই যে, ঐ সাহায্য গ্রহণে আমাদিগের অনুকরণ বৃত্তিটীই অতি প্রবলা হয়। সুতরাং ইংরাজের প্রণালী শুদ্ধ রাজনৈতিক বিচার বিষয়ে সম্বদ্ধ হইয়া থাকে না, উহা আমাদের সামাজিক নীতি, ধর্ম্মনীতি এবং পারিবারিক নীতির মধ্যেও প্রবেশ পূর্ব্বক আমাদিগের অনুপযোগী অনেকানেক পরিবর্ত্ত ঘটাইয়া দিতে চায়। দ্বিতীয় দোষটীও অনুকৃতি প্রবণতার বৃদ্ধি সম্ভূত। ইংরাজ অধিনেতা তাঁহার স্বদেশের উপযোগী যে আন্দোলনের রীতি তাহাই জানেন। তিনি সেই রীতি এখানেও প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু তাহা এখানকার লোকের স্বভাব, শিক্ষা এবং অভ্যাসের উপযোগী হয় না। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই কথা স্পষ্ট করিব। মনে কর, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ রাজার নিকটে স্বদেশ বিষয়ক কোন প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজরাজ স্বদেশীয় নীতির অনুসরণপূর্ব্বক বলিলেন, তোমরা দুই পাঁচ জনে যে প্রার্থনা করিতেছ তাহা তোমাদের মনগড়া বস্তু হইতে পারে—দেশের অধিক লোকেত ওরূপ কোন প্রার্থনা করে নাই। এই উত্তর ইংরাজী রীতির অনুযায়ী হইলেও উহা এদেশের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য নহে। সুতরাং উহার ফল এই হয় যে, ইংরাজ-নেতার প্ররোচনায় ইংরাজী শিক্ষিত লোকেরা এ দেশে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং আপনাদের পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশে লোক সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করেন। আমার বিবেচনায় ঐ প্রণালী এদেশের অনুপযোগী। অতএব ইংরাজ নেতৃত্বে এখানে সমীচীন কার্য্য হইতে পারে না, অর্থাৎ ইংরাজ সত্ত্বেও ভারতবর্ষে দেশীয় নেতারই সমূহ প্রয়োজন হইয়া আছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কর্ত্তব্যনির্ণয়।

নেতৃপ্রতীক্ষা।

উদ্ভাবন অপেক্ষা অনুকরণ সহজ। কিন্তু অনুকরণ কার্য্যতঃ সহজ হইলেও উহাতে ভ্রম এবং হানি অধিক হইতে পারে। উদ্ভাবন সহজে হয় না, কিন্তু যদি হয় তবে একেবারে দেশকালপাত্রের উপযোগী হইয়াই হয়। অনুকরণে ঐরূপ উপযোগিতার রক্ষা বিশেষ চেষ্টাসাধ্য। যে অনুকরণে সম্যক উপযোগিতার রক্ষা হয়, তাদৃশ অনুকরণ উদ্ভাবন হইতে বড় নিকৃষ্ট বস্তু নহে। প্রত্যুত, অনেকানেক উদ্ভাবনের উদাহরণই ঐরূপ অনুকরণের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু তাহা হইলেও অনুকরণে এবং উদ্ভাবনে মূলতঃই ভেদ আছে। অনুকরণ বাহ্য, উদ্ভাবন আভ্যন্তরিক। অনুকরণে ভেদ বুদ্ধির প্রাবল্য, উদ্ভাবনে একত্ব এবং তাদাত্ম্যতা। এই জন্য যিনি অনুকরণ করিতে পারেন, তিনি প্রায়ই উদ্ভাবন করিতে অসমর্থ হয়েন। এই জন্যই বোধং হয়, ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভাবনী শক্তির ন্যূনতা। আমাদের বর্ত্তমান নেতা ইংরাজও আমাদিগকে তাঁহার নিজের অনুকরণের শিক্ষা ভিন্ন আর কোন শিক্ষাই দিতে পারেন না। ইংরাজের অবস্থা, স্বভাব এবং চিত্তবৃত্তি এরূপ নয় যে, তিনি আমাদিগের জন্য এবং আমাদিগের হইয়া, আমাদিগের প্রকৃত গন্তব্য পথ আবিষ্কৃত বা উদ্ভাবিত করিতে শক্ত হইতে পারেন। ভারতবর্ষে এপর্য্যন্ত এমন একটী আইন, কার্য্যবিধি, অথবা ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই যাহা ইংলণ্ডের অনুকরণসঞ্জাত নহে।

ইংরাজের স্থানে অনুকরণ করিবার অনেকানেক বিষয় ভারতবাসী আপনার সম্মুখেই পাইতেছেন। এখন ইংরাজ নানাপ্রকারেই তাঁহার আদর্শস্থলীয়। অর্থ সাধন করিবার নিমিত্ত যে যে গুণের প্রয়োজন, ইংরাজের শরীরে সে সমস্ত গুণ মূর্ত্তিমান হইয়া আছে। ইংরাজের উচ্চাভিলাষ আছে, স্বাবলম্বন আছে, অধ্যবসায় আছে, ইন্দ্রিয়দমন আছে, গাম্ভীর্য্য আছে, এবং সম্মিলনশক্তি আছে। সম্মিলন-শক্তিটীতে অনেকানেক উচ্চতম সদ্গুণেরই সত্তা বুঝায়। ইহাতে মনের সংযম বুঝায়, স্থিরতর সহানুভূতি বুঝায়, বশ্যতা বুঝায়, সত্যনিষ্ঠা বুঝায়। ভারতবাসীর সম্মিলনশক্তি ন্যূন হইয়া গিয়াছে। ঐ শক্তিটীকে অধিকার করিবার জন্য বিশেষ তপস্যার প্রয়োজন। যদি সম্মিলন প্রবণতা জন্মে, তবে জাতীয় ভাবের পরিবর্দ্ধন অতি অল্পায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। বস্তুতঃ জাতীয় ভাব সম্মিলন প্রবণতারই নামান্তর অথবা পরিপাক।

আমরা সম্মিলন-প্রবণতা ইংরাজের উপদেশ হইতে যদিও না পাই, তাঁহার প্রকৃত অনুকরণে কতকটা শিখিলেও শিখিতে পারি। ভারতবাসীর যত প্রকার ক্রটি দেখিতে পাওয়া যায়, সকলগুলিই সম্মিলন-প্রবণতার ন্যূনতা হইতে সম্ভূত। ভারতবাসী রত্ন-প্রসবা ভারতের ক্রোড়ে থাকিয়া দরিদ্র। ভারতবাসী শ্রমশীল হইয়াও উদরান্নে বঞ্চিত। ভারতবাসী বুদ্ধিমান হইয়াও অন্যের পরিচালনার অপেক্ষী। ভারতবাসীর মৃত্যুভয় স্বল্প হইলেও তিনি ভীরু বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। এই সকল এবং অপরাপর সকল দোষের একমাত্র মূল, সম্মিলনে অক্ষমতা।

এই অক্ষমতার দূরীকরণ আমাদের বর্ত্তমান নেতা ইংরাজের সাক্ষাৎ চেষ্টায় কদাপি পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধ হইবার নহে। কোন স্বদেশীয় মহাপুরুষকর্ত্তৃক ইহার উপায় উদ্ভাবিত না হইলে আমাদের এই মৌলিক দোষ দূর হইবে না। তাদৃশ মহাপুরুষের যাহাতে আবির্ভাব হয় তাহার কোন পথ আছে কি না, ইহাই এক্ষণে ভাবিয়া স্থির করিবার প্রয়ো-

জন। তাহা ভাবিতে গেলে, ইহাই অনুমান হয় যে, তৎসম্বন্ধে আমাদের অবশ্যকরণীয় দুইটী। একটী এই যে, যখন কোন শুভ কার্য্যসাধনের নিমিত্ত তুমি স্বয়ং ইচ্ছা করিতেছ, যদি অপর কাহাকেও সেই বা তাদৃশ কার্য্যসাধনের নিমিত্ত ইচ্ছুক হইতে দেখ, তবে অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও তাঁহার সহিত সম্মিলিত হও। ৺ জগন্নাথ দেবের রথ-রজ্জুতে অনেকের সহিত একমন হইয়া হাত দিতে হয়, নচেৎ রথ চলে না। দ্বিতীয় কথা এই—আপনার প্রতিবাসী হউন বা পরিচিত হউন বা শ্রুতনামা যে কোন স্বজাতীয় ব্যক্তি হউন, যাঁহাকে সম্মানার্হ দেখিতে পাও, তাঁহাকেই সন্মান করিতে প্রবৃত্ত হও। যে দেশে অসূয়ার আধিক্য সে দেশে প্রকৃত বড়লোক জন্মিতে পারে না। ভারতবর্ষের এই অধঃপতিত দশায় অসূয়া দোষের অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

ভারতবাসী স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয় কাহাকেও বড়-লোক বলিয়া জানিতে চাহেন না। তাঁহার মতে তাঁহার স্বজাতীয় সকলেই ন-কড়ে ছ কড়ে। যেমন সাধন সিদ্ধিও তদনুরূপ হয়। আমরা ন-কড়ে ছ-কড়ে দেখিতে চাই, অতএব ন কড়ে ছ কড়েই দেখিতে পাই। এই দোষের সম্যক্ পরিহার না হইলে দেশে বড় লোকের আবির্ভাব হইবে না।

ভারতভূমি সত্যসত্যই রত্নপ্রসবা। এখানে প্রকৃত বড়লোকের অঙ্কুর নিয়তই উদ্গত হয়। তাহা না হইলে এত শত শত নূতন নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইবে কেন? যাঁহারা ছোট খাট যেরূপ হউক, এক একটী সম্প্রদায় সংস্থাপিত করিতে পারেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কিছু না কিছু মাহাত্ম্য অবশ্যই আছে।

তবে কি যে কেহ সংস্কারক নামধারী হইবে, তাহারই অনুবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়? তাহাও নহে। কিন্তু বরং তাহাও ভাল, তথাপি কেহ কোন উদ্ভাবনী শক্তির লেশমাত্র প্রদর্শন করিলেই তাঁহার প্রতি অসূয়াবান হওয়া ভাল নয়। পরন্তু যে প্রকার মহা পুরুষ আমাদিগের প্রকৃত নেতা

হইতে পারিবেন, তাহার কয়েকটী লক্ষণ যেন পূর্ব্ব হইতেই মনে করিয়া লইতে পারা যায়।

(১) তিনি আত্মত্যাগী এবং স্বজাতীয় লোকেরই সহানুভূতি প্রয়াসী হইবেন। (২) তিনি সকল ভারতবাসীর পরস্পর সম্মিলন সাধনের উপযোগী উপায়ের আবিষ্কার করিবেন। সুতরাং অধিকারী ভেদ-বিষয়ক তথ্যের অপহ্নব না করিয়াও সকল সাম্প্রদায়িকেরই প্রতি অপক্ষপাতী হইতে পারিবেন। (৩) তিনি পূর্ব্বগত স্বদেশীয় শিক্ষাদাতৃ-বর্গের অগৌরব করিবেন না। প্রত্যুত আপনার ব্যাপকতর মত-বাদের অভ্যন্তরে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের প্রদত্ত সমুদায় শিক্ষাসূত্রের সন্নিবেশ করিবেন। (৪) তাঁহার মতবাদে শাস্ত্রের এবং বিজ্ঞানের সমস্ত সার সম্মিলিত হইয়া থাকিবে। (৫) তিনি সূর্য্যদেবের ন্যায় ভারতা-কাশের পূর্ব্বোদিত গ্রহ নক্ষত্রাদিকে আপনার রশ্মিজালে বিলীন করিয়া লইবেন, কাহাকেও নির্ব্বাপিত করিবেন না। এই লক্ষণগুলির সহিত তীক্ষ্ণবুদ্ধিমত্তা, অগাধপাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, লিপিকুশলতা, অসীম উদারতা এবং সমস্ত কঠোর ওজোগুণেরও সম্মিলন থাকিবে। এরূপ লক্ষণের চিহ্ন মাত্র পাইলেই ভগবদ্ বাক্যের স্মরণ করিবে——

"যদ্যদ্ বিভূতি মৎ সত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেববা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মমতেজোংশসম্ভবঃ॥"

যাহাতে প্রভা, শ্রী ও তেজঃ দেখিবে তাহাই আমার তেজের অংশ-সম্ভূত বলিয়া জানিবে।

অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণের আভাস মাত্র যাঁহাতে পাইবে তাঁহারই গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। দেশের বুদ্ধিমান লোকে এই প্রণালীর অনুসরণ করিতে পারিলেই দেশ মধ্যে যদি প্রকৃত বড়-লোক কেহ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে অনতিবিলম্বেই প্রকাশমান হইবেন। আর যদি তেমন কেহ না জন্মিয়া থাকেন, তবে তাঁহারও আবির্ভাবের সময় নিকটতর হইয়া আসিবে।

আমার বোধ হয় যে, ভারতবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে এখন এমন একটী আশার সঞ্চার হওয়া উচিত যে, আমাদের অধঃপতনের নিবারণ, অবস্থার উৎকর্ষ সাধন, মনের সংশয় ছেদন, এবং হৃদয়ের ক্ষোভ শান্তন করিবার জন্য স্বজাতিমধ্যে একজন নেতৃ মহাপুরুষের আবির্ভাব অবশ্যই হইবে। সেই আশাও বিশ্বাসে পরিণত হওয়া আবশ্যক। কারণ ভগবদ্‌বাক্য আছে——

যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থান মধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥

হে ভারত! যে যে সময়ে ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের উদয় হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্ট করি।

ঐ বিশ্বাস দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইলে ভারতবাসীর কার্য্যকলাপ, ব্যবহার প্রণালী, এবং মনেরভাব তদুপযোগী বিশিষ্টতা লাভ করিবে।

নেতৃ মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, ইহা সত্য। কিন্তু কোথায় হইবে, কখন হইবে, তাহার কোন অনুমান করা যাইতে পারে না। অতএব সেই ঘটনা তাঁহার নিজের ঘরেই হইতে পারে, প্রতি ব্যক্তিকেই এরূপ মনে করিতে হয় এবং তাহা মনে করিয়া আপনার গৃহকে সর্ব্বতোভাবে সেই আবির্ভাবোন্মুখ দেবতার পবিত্র মন্দিরের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে হয়। দ্বেষ, হিংসা, লোভ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি কুৎসিত এবং নীচ প্রবৃত্তি হইতে নিজ নিজ মনকে শূন্য করিয়া রাখিতে হয়। আপনাপন সন্তানাদি সম্বন্ধে সকলকে ইহাও মনে করিতে হয় যে, আমাদের এই দুগ্ধ-পোষ্য শিশুটীই সেই মহাপুরুষ হইতে পারেন। ইহাঁ হইতেই ভারতবাসীর সম্মিলন-সূত্রের আবিষ্কার হইতে পারে, ইহাঁ হইতেই আমাদের জন্মভূমি যশের মালা ধারণ করিতে পারেন, ইহাঁ হইতেই পৃথিবীতে ধর্ম্মধনের সম্বর্দ্ধন হইয়া মানুষ বিমুক্ত-পাপাচার এবং অভূতপূর্ব্ব পুণ্যধনে ধনী হইয়া উঠিতে পারে। কোন একটী মনুষ্য-শিশুর ভাবী অবস্থা এবং ক্ষমতা কি হইতে পারে, বা কি হইতে

পারে না, তাহা কি কেহ নিশ্চয় করিতে সমর্থ? মনোমধ্যে নেতৃ মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রত্যাশা এইরূপ স্থিরতর এবং ব্যাপকভাবে সঞ্চিত রাখিয়া আপনারা পবিত্র হইয়া থাকিবার নিমিত্ত নিয়ত চেষ্টাবান হইলে এবং শিশু ও যুবাদিগের সুশিক্ষার প্রতি নির্দ্দিষ্টপথে নিরন্তর যত্ন করিলে, সকল লোকেরই মন উন্নত হইয়া উঠিবে। অনেকানেক সুবোধ লোকের হৃদয় তাদৃশ উন্নত, পবিত্র এবং একাগ্র হওয়াতেও নেতৃ মহাপুরুষের আবির্ভাবের অন্তরব হেতু উপস্থিত হইবে। একোদ্যমে কতকগুলি লোকের চিত্তোন্নতি না হইলে কোন দেশে মহাত্মা পুরুষের আবির্ভাব হয় না। যেমন উচ্চ অধিত্যকা হইতেই উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ হৃদয়বান ব্যক্তিদিগের মধ্য হইতেই উচ্চতম মহাত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। হিমালয়ের অধিত্যকা দেশ হইতেই কাঞ্চনগিরি উঠিয়াছে, নিম্ন-দ্রোণীদেশ হইতে উহা উঠে নাই। অতএব দেশের জনসাধারণের হৃদয়ে যাহাতে আশা, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সহানুভূতির বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য চেষ্টা করাই বর্ত্তমানের কর্ত্তব্য। শিক্ষা কার্য্যও বুদ্ধিমত্তা, বহুজ্ঞতা, স্বাবলম্বন, বাগ্মিতা, লিপি-কুশলতা, উদারতা এবং ওজস্বিতা বর্দ্ধন চেষ্টার সহিত স্বজাতি বাৎসল্যের প্রতি একাগ্র হইয়া পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

শাস্ত্রে একটী দশম অবতারের কথা আছে। উহাঁর নাম কল্কি। তিনি সম্ভলগ্রামে, বিষ্ণুযশার ঔরষে, সুমতির গর্ভে জন্ম লইয়া শাণিত কৃপাণ হস্তে অশ্বারূঢ় পুরুষাকারে দৃষ্ট হইবেন। কোন শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ এই শাস্ত্রোক্তির যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত কথাই সমর্থিত হয় বলিয়া আমি মনে করি। তিনি বলেন—'সম্ভল গ্রামের' *

* সম্ভলগ্রাম শব্দের ব্যুৎপত্তি – 'ভল' ধাতু নিরূপণার্থ, অৎ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ, সম্ভল অর্থে সম্যক্ প্রকারে নিরূপিত বা নিশ্চিত অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মকচিত্ত; গ্রাম অর্থে সমূহ, অতএব সম্ভলগ্রাম=নিশ্চয়াত্মকচিত্ত সমূহ।

অর্থ নিশ্চয়াত্মকচিত্তসমূহ, 'বিষ্ণু-যশার' * অর্থ 'ব্যাপক আজ্ঞা 'সুমতির" অর্থ 'সাধু বুদ্ধি' এবং 'কল্কির' † অর্থ 'কলহ-নাশন'। অর্থাৎ লোকের হৃদয় নিশ্চয়াত্মক হইয়া উঠিলে (কিসে ভাল তাহা ঠিক করিয়া বুঝিলে) এবং লোক সমষ্টির সেই শুভ সাধনের নিমিত্ত আদেশ বা আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইলে, সুবুদ্ধি হইতে কলহ-নিবারণ দেবের আবির্ভাব হইবে। অতএব সকল ভারতবাসীর হৃদয়ই সম্ভল-গ্রাম, সমস্ত ভারত সমাজই বিষ্ণুযশা, সকল ব্যক্তিই সুমতি স্থানীয়; এবং ভারতবাসীর পরস্পর বিবাদ বা গৃহবিচ্ছেদ নিবারণ করাই দশম অবতারের কার্য্য। কল্কিদেব যে অসি ধারণ করিবেন সেটী জ্ঞান বিজ্ঞানময় অসি—অজ্ঞাননাশক এবং সম্মিলন-সাধক। তিনি যে অশ্বে আরোহণ করিবেন তাহা জগৎ বা ভারতবর্ষ স্বরূপ মহাঅশ্ব।

যদি দশম অবতার সম্বন্ধীয় শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ হয়, তাহা হইলে কোন সময়ে য়িহুদী জাতীয়দিগের অবতার (মেসাইয়া) লইয়া ঐ জাতীয় লোকের যে প্রকার ভ্রম হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, আমাদেরও ভাবী অবতার কল্কি সম্বন্ধে প্রাকৃত লোকদিগের মধ্যে সেই প্রকার একটী ভ্রম জন্মিয়াছে, বলা যাইতে পারে। য়িহুদীরা তাহাদিগের ভাবী অবতারকে যুদ্ধবীররূপেই ভাবিত, এখানেও কল্কিকে সেইরূপ যুদ্ধবীর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। কিন্তু কল্কিদেব আয়স-

---

* বিষ্ণুযশা বিষ্ণু অর্থে ব্যাপক, যশস্ শব্দের অর্থ আজ্ঞা বা সভা; অতএব বিষ্ণুযশা=ব্যাপক-আজ্ঞা।

সুমতি—সুন্দর বুদ্ধি।

† কল্কি—কলি অর্থে কলহ বা পাপ, কলি হইতে কণ্ প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ কল্ক শব্দ; কল্কের অর্থাৎ পাপের বা কলহের নাশ করেন এই অর্থে ই প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ কল্কি=কলহ বা পাপ নাশক। কল্কি পুরাণেই কথিত আছে "কল্কিংকল্ক বিনাশার্থং আবিভূর্ত বিদুর্বুধাঃ।"

কৃপাণহস্ত সামান্য অশ্বারোহী পুরুষ না হইয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানময় অসিধারী, অন্তর্বিচ্ছেদ-বিনাশকারী, সম্মিলনসাধক, ভারতাধিষ্ঠিত পুরুষোত্তম হওয়াই সম্ভবপর।

কর্ত্তব্যনির্ণয়—অতথ্য পরিহার।

ভারতবর্ষের অবস্থা হীন হইয়াছে। আজি কালি ইংরাজেরা বিধি-পূর্ব্বক, অবিধি পূর্ব্বক, সর্ব্ব প্রকারেই ভারতবাসীর নিন্দা করিতেছেন। ভারতবাসী নিজেও জানিতেছেন যে, তিনি কলহে-মগ্ন, অসূয়া-পরবশ, মিলনে-অশক্ত, বিদ্যাহীন, ধনহীন এবং স্বল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু দোষ মাত্রই ধর্ম্মহানি হইতে জন্মে। অতএব শাস্ত্রে কলিযুগে যে ধর্ম্মহানির উল্লেখ আছে, তাহাতেই সমষ্টিভাবে এবং ব্যষ্টিভাবে সকল দোষের উল্লেখ হইয়াছে, বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ ভারতবাসীর শাস্ত্রই ভারতবাসীকে সর্ব্বাপেক্ষায় অধিক তিরস্কার করিয়াছেন এবং স্নেহময় পিতার ন্যায় ঐ তিরস্কারের সহিত, তিরস্কারের অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায়ও নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। কলি হইতে দোষ হইয়াছে, কলি ক্ষয়েই দোষের পরিহার হইতে পারে।

মানুষের সকল দোষই ধর্ম্মহানি মূলক। কিন্তু ভারতবাসী পৃথিবীর অপর সকল লোকের অপেক্ষা অধিকতর ধর্ম্মচিন্তা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, এবং ধর্ম্মভীরুতা প্রবণ। একথা সুদ্ধ আমরাই বলি না, সকল দেশের সকল লোকেই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। অতএব ভাবিয়া দেখিলে একটী বিষম সমস্যাই উপস্থিত হইয়াছে, বলিতে হয়। এক পক্ষে, ভারতবাসীর সকল দোষের মূল ধর্ম্মহানি; পক্ষান্তরে, ভারতবাসীর মন অপর সকল জাতির অপেক্ষায় সমধিক ধর্ম্মানুরক্ত; তবে ভারতবাসীর দোষ কোথা হইতে আইসে? কোন সময়ে এই প্রশ্নের যে উত্তর পাইয়াছিলাম এবং যাহা এখনও মনে লাগিয়া আছে, এ প্রবন্ধে তাহারই ব্যাখ্যা করিব।

সংক্ষেপতঃ বলিয়া রাখি যে, ভারতবাসী ধর্ম্মশীল বলিয়াই এখনও পৃথিবীতে থাকিতে পারিয়াছেন, অন্যান্য প্রাচীনজাতিদিগের ন্যায় একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যান নাই। কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ ভঙ্গ হইয়া আছে, এই জন্য তাঁহার উন্নতি নাই, অধঃপতন হইতেছে।

কতিপয় বর্ষ গত হইল ৺ কাশীধামে একটী মহাত্মাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাকে লোকে অত্যাশ্রমী মহাশয় বলিয়া অভিহিত করিত। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, এবং আরবি ফারসিও জানিতেন এবং ভারতবর্ষের সকল তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়া ছদ্মবেশে পাদচারে ভারতবর্ষের বহিঃস্থিত অনেকানেক দেশ দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার এক জন সেবক বা শিষ্যের স্থানে আমি তাঁহার কতকগুলি মতবাদ শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিতেন—এখন ধর্ম্মের প্রকৃত মূর্ত্তি অর্থাৎ উহার শাস্ত্রোক্ত পূর্ণাবয়ব প্রায়ই ভারতবাসীর মানস চক্ষে সমুদিত হয় না। ভারতবাসী এখন যে ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান, চিন্তাপর, অনুষ্ঠানশীল এবং ব্যাকুল, তাহা ধর্ম্মের সর্ব্বাবয়ব নহে—মুখ্যাবয়বও নহে। এই জন্য ভারতবাসীর দ্বারা ধর্ম্মের যথাযথ পূজা হইতেছে না। ধ্যানেই ত্রুটি হয় বলিয়া অনুষ্ঠানও দুষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্যই ভারতবাসী নানা দোষে জড়িত হইয়া বিপন্ন হইতেছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে এখন ভারতবাসীর যে যে দোষ তাহার উদাহরণ, যথা——

(১) পারলৌকিক স্বার্থপরতা। ভারতবাসী শাস্ত্রীয় শিক্ষার গুণে স্বার্থত্যাগে এবং পরার্থপরতায় যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন, পৃথিবীর অপর কোন জাতি তেমন কৃতকার্য্য হয়েন নাই। গৃহস্থাশ্রমের সম্মিলিত পারিবারিক ব্যবস্থা হইতে চতুর্থাশ্রমের পূর্ণ সংন্যাস পর্য্যন্ত সকল আশ্রম ধর্ম্মই ভারতবাসীর পরার্থপরতার পরিচায়ক। এমন কি, কেবল আপনার নিমিত্ত ভাত রাঁধিয়া খাওয়াও ভারতবাসীর পক্ষে কিল্বিষ ভোজন বলিয়া নিন্দিত। এমন কথা কি আর কোন দেশের কোন শাস্ত্রে বলিতে পারিয়াছে? প্রত্যুত অন্যের ধর্ষণ ভারতবাসীর স্বভাবের বিপরীত। অন্যের দুঃখ

মোচনে ভারতবাসীর প্রবৃত্তি নৈসর্গিক। ভারতবাসীর দরিদ্রতা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার দানশক্তিও পৃথিবীতে অতুল্য। কিন্তু ইহলৌকিক সকল বিষয়ে এরূপ পরার্থপর হইয়াও ভারতবাসী পারলৌকিক বিষয়ে নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছেন। অন্যান্য ধর্ম্মের শিক্ষা এই যে, যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করিবে, সে নিজেই সেই ধর্ম্মাচরণের ফলভোগ করিবে, অর্থাৎ স্বর্গাদি প্রাপ্ত হইবে। ঐ সকল ধর্ম্মে মনুষ্যের আত্মা সৃষ্ট বস্তু বলিয়া বর্ণিত এবং উহা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন। সুতরাং ঐহিক সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধে, ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের যে প্রকার ব্যবহার, পারলৌকিক বিষয় সম্বন্ধেও যে তদনুরূপ বোধ জন্মিয়া থাকিবে, তাহা অসঙ্গত নয়। কিন্তু আর্য্য দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষাদান অন্য প্রকার। আমাদিগের দর্শনশাস্ত্রগুলির মতবাদে অবান্তর ভেদ যাহাই থাকুক, আত্মার অনাদিত্ব, অনশ্বরত্ব এবং বিভুত্ব বা সর্ব্বব্যাপকত্ব সকলেরই স্বীকৃত বলিলে চলে। সুতরাং কোন এক ব্যক্তির অনুষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ বা অধর্ম্মাচরণ যে অপর কাহাকেও স্পর্শ করে না, এরূপ হইতেই পারে না। আত্মার বিভুত্ব স্বীকার করিলে, এক জনের সুকৃত দুষ্কৃত যে, সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে অপর সকলেই সংলগ্ন হয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। আর্য্যদার্শনিকদিগের এই প্রকৃত এবং অত্যুদার মতবাদ কোন সময়ে ভারতবর্ষের অত্যুচ্চ জ্ঞানিপুরুষদিগের মধ্যে প্রচলৎ ছিল। তখন একজীববাদ এবং একের মুক্তিতেই সকলের মুক্তি, সুতরাং সকলের মুক্তির পথ না হইলে কোন একজনেরও মুক্তি হইতে পারে না, এই বিশ্বাসও দৃঢ়তর ছিল। কিন্তু ক্রমে ঐ মতবাদ লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে এবং জ্ঞান-যোগী পুরুষেরাও ইদানীং যে যাহার আপনাপন আত্মার নিঃশ্রেয়সঃ সাধনে যত্নবান হইয়া পারলৌকিক স্বার্থপরতা দোষে দূষিত হইতেছেন। এখনকার ধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থেরা অপরের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবগ্রহণ পূর্ব্বক হরিনাম করিতেছেন, এখনকার ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, এবং পরমহংসেরা কেহ জপ, কেহ ধ্যান, কেহ বা যোগ করিয়া আপনাপন ঊর্দ্ধগতির চেষ্টা পাইতেছেন এবং

এখনকার দাতৃগণও দানাদি দ্বারা পুণ্য ক্রয় করিয়া স্ব স্ব পরকালের সম্বল করিতেছেন!

যাহাদের মধ্যে উচ্চতম এক-জীব-বাদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সেই ভারত বাসীর মন এখন এরূপ সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাতে উল্লিখিতরূপ পারলৌকিক স্বার্থপরতার প্রবেশ জন্মিয়া গিয়াছে। উত্তরায়ণী বৌদ্ধেরা প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মা পৃথকরূপে মুক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে বলিয়াই মানে। কিন্তু উহাদিগেরও মধ্যে ডালাই-লামার সম্বন্ধে কথিত হয় যে, তিনি বহু পূর্ব্বকালে মুক্তি প্রাপ্তির সম্পূর্ণরূপে অধিকারী হইয়াও কেবল স্বধর্ম্মাবলম্বী-দিগের শিক্ষা, উন্নতি ও মুক্তির জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন—সকলের মুক্তি প্রাপ্তি না হইলে তিনি আপনার মুক্তি প্রার্থনা করেন না। এই বিষয়ে সুরক্ষিত বৌদ্ধমতবাদ যে, কিয়ৎপরিমাণে বিকৃতাবস্থ হিন্দু ব্যবহারের অপেক্ষা উচ্চতর ভাবের প্রকাশ করিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান মলিন এবং ধর্ম্মবুদ্ধি সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই জন্য অপরের কৃত পুণ্য পাপে বা অপরের ভুঞ্জিত সুখ দুঃখে, আমাদিগের ঔদাসীন্য জন্মিয়া যাইতেছে। ঐ ঔদাসীন্যই পাপ। সেই জন্য আর্য্যধর্ম্ম ক্রমশঃ নিম্নতর সোপানে অবরোহণ করিতেছে, দেশমধ্যে সহানুভূতি দিন দিন স্বল্পতর হইতেছে, এবং সম্মিলন-শক্তি ক্রমশঃই ন্যূন হইয়া যাইতেছে।

অত্যাশ্রমী মহাশয় বলিতেন যে, ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন আশ্রম-ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক মনুষ্য আপনার শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন মাত্র। কিন্তু শিক্ষাগ্রহণ করিলেই ত সমুদায় কার্য্য শেষ হইতে পারে না। এই জন্য স্বসমাজের ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত চতুর্থাশ্রমের পরবর্ত্তী একটী আশ্রমা-ন্তরের প্রয়োজন আছে। লোকের শিক্ষা প্রদান ও সমাজের হিতসাধন সেই আশ্রমের করণীয়। এই জন্য সকলে তাঁহাকে অত্যাশ্রমী বা সর্ব্বাশ্রম অতীত পুরুষ বলিত। তিনি বলিতেন,

কোন এক জনের মুক্তি বা নিঃশ্রেয়সঃ সাধন স্বতন্ত্রভাবে হইতে পারে না। মুক্তি পদার্থটী সকলের যুগপৎ লভ্য বস্তু; কারণ, আত্মা এক, বহু নয়। পরিগৃহীত শরীরের ধর্ম্ম-ভেদেই আত্মার ধর্ম্মের পৃথকত্ব বোধ হয়। তিনি বলিতেন, ভারতবাসী ঐহিক ব্যাপার সম্বন্ধে যেমন পরার্থপর হইয়া মুক্তির পথে আসিয়াছেন, পারলৌকিক বিষয়েও সেইরূপ পরার্থপর হউন; কি ইহলৌকিক, কি পারলৌকিক, সকল ব্যাপারে সকলের মঙ্গলেই আপনার মঙ্গল ইহা জানুন; আত্মার বিভুত্ব যেমন বিচার কালে স্বীকার করিয়াছেন, কার্য্য কালেও সেই বিভুত্ব স্মরণ করিয়া কার্য্য করুন; এবং অন্যের পাপে আপনার পাপ, অন্যের কষ্টে আপনার কষ্ট ইহা অনুভব করিতে অভ্যস্ত হউন। তাহা হইলে ধর্ম্ম প্রাচীন কালের ন্যায় পূর্ণরূপে মূর্ত্তিমান হইবেন এবং প্রাচীনকালের তেজস্বিতা এবং প্রাচীনকালের উদারতাও জন্মিবে।

(২). অভেদে ভেদবুদ্ধি। দর্শন শাস্ত্র সমূহের টীকাকারদিগের মধ্যে যে বিভিন্ন মতবাদ আছে. তাহার মধ্যে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদ প্রধানরূপে পরিদৃষ্ট হয়। এক পক্ষ বলেন জ্ঞান এবং ক্রিয়ার যুগপৎ অবস্থানের আবশ্যকতা আছে। ভগবান রামানুজ স্বামী প্রভৃতি এই মতানুগামী। ইহাঁদিগকে সমসমুচ্চয় বাদী বলে। অপর দলের নেতা ভগবান শঙ্করস্বামী। ইহাঁরা বলেন যে, জ্ঞানের আবির্ভাবে কর্ম্মের লোপ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং উভয়ের একত্রাবস্থান অথবা সমসমুচ্চয় হইতে পারে না। ইহাঁদিগকে ক্রম-সমুচ্চয়বাদী বলা যায়। যেখানে দুইটী মতবাদ স্থায়ীভাবে প্রচলিত হয়, সেখানে উভয়েই কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সত্যের বিদ্যমানতা থাকে। এস্থলেও তাহাই হইয়াছে। জ্ঞানের সারাৎ-সার কথা, আত্মার বিভুত্ব। যাঁহার সেই জ্ঞান উপস্থিত হইল, তাঁহার নিজের পক্ষে আর কোন কর্ম্মই থাকিতে পারে না। তাঁহার কাম্য কর্ম্ম ফুরাইল। কিন্তু যত দিন সকলের হৃদয়ে তাদৃশ জ্ঞানের স্ফুরণ না হইতেছে, তাবৎকাল তাঁহার কর্ম্মের শেষ হইতে পারে না। অন্য

হৃদয়ে আপনার জ্ঞানস্ফূর্ত্তি সম্পাদন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ একটি কাজ পরম জ্ঞানীর পক্ষেও বাকী থাকিয়া যায়। ফলেও দেখা যায়, ক্রমসমুচ্চয়-বাদীরাও গ্রন্থ প্রণয়নে, শিষ্যের শিক্ষায় এবং শাস্ত্রীয় বিচারে, কখনই অবহেলা করেন নাই। অতএব সমুচ্চয়াসমুচ্চয় উভয় বাদের মীমাংসা করিয়া লওয়াই প্রকৃত পথ। কারণ আত্মার বিভুত্ব-জ্ঞান-মূলক সকলের যুগপৎ মুক্তিসাধন স্বীকৃত হইলে, তাহার জন্য যে কর্ম্ম, তাহা উভয়বাদীর সম্মত। প্রত্যুত ইহাই নিষ্কাম কর্ম্ম বা নৈষ্কর্ম্ম, ইহাই বুদ্ধি-যোগ এবং সন্ন্যাসযোগ।

যেমন কর্ম্মে এবং জ্ঞানে বিরোধ বাধাইয়া লোকে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, সেই প্রকার লোকে ভক্তির সহিতও জ্ঞানের বিবাদ বাধাইয়া একটা সমূহ অনিষ্টের হেতু জন্মাইয়াছে। জ্ঞান এবং ভক্তি ইহারা পিতা এবং মাতার স্থানীয়। উহাদিগের পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ নাই। ভক্তি না হইলে কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, কার্য্য না হইলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, শিক্ষা না হইলে জ্ঞান জন্মে না, এবং জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না। অতএব কেহ কর্ম্ম যোগী কেহ ভক্তি যোগী এবং কেহ জ্ঞান-যোগী এই যে সাময়িক পার্থক্য হইতে স্থায়ী পার্থক্য হইয়াছে, তাহাতে আর্য্যধর্ম্মের সমূহ ব্যাঘাত জন্মিতেছে।

(৩) ধর্ম্মের ব্যাপকত্ব লোপ। আর এক রূপেও ধর্ম্মের অঙ্গহানি হইয়াছে। এখন লোকে ধর্ম্মের ব্যাপকত্ব লোপ করিতেছে। আমরা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি পুনর্ব্বার রাত্রিকালে শয্যাশায়ী হইতে যাইবার সময় পর্য্যন্ত, যে যে কার্য্য করি, সকল কার্য্যই ঈশ্বর স্মরণ পূর্ব্বক আরব্ধ করিতে উপদিষ্ট। কোথাও যাইব, কিছু করিব, কিছু খাইব, একখানি সামান্য চিঠি লিখিব, কিছুই বিনা ঈশ্বর স্মরণে করিবার কথা নাই। বস্তুতঃ ধর্ম্ম-চিন্তাই ভারতবাসীর সকল ব্যাপারে সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকিবে, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং সেই জন্যই ঈশ্বর স্মরণের তাদৃশ প্রবর্ত্তনা। কিন্তু এখন ধর্ম্মের ঐ সর্ব্বব্যাপিত্ব

লুপ্তপ্রায় হইতেছে। "বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করা ত তপস্যা নয়" "চাকুরি করা ত তীর্থবাস নয়," "ধর্ম্ম করিবার বয়স ত এখনও হয় নাই"— এইরূপ কথা সকল কিছুকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। আজি কালি আবার "ক্লেশ স্বীকার" "দ্বন্দসহিষ্ণুতা" "তপশ্চর্য্যা"—প্রভৃতি কথাগুলি যে ভাবের ব্যঞ্জক তাহা উপধর্ম্মমূলক বলিয়া ঘৃণিত হইতেছে। ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত সাপ্তাহিক বারাদিও ক্রমে ক্রমে নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম সমস্ত জীবন ব্যাপক না হইয়া একটী কার্য্য-বিশেষ হইয়া উঠিতেছে। ভারতবাসীর পূর্ব্ব শিক্ষা এরূপ ছিল না। ভারতবাসী জীবিত কালের সকল কার্য্যেই ধর্ম্মভাব রক্ষা করিয়া চলিতে শিক্ষিত হইতেছিলেন। *

প্রাতরারভ্য সায়ান্তং সায়াহ্লাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতস্তদেব তবপূজনং॥

হে জগন্মাতঃ! প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে পুনর্ব্বার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, আমি যাহা যাহা করি সকলই তোমার পূজা হউক।

এই অত্যুচ্চ পবিত্রভাবের বিলোপ হইয়া অমুক বারে বা অমুক সময়ে ধর্ম্মকার্য্য করিতে হয়, অপর সময়ে অপর কার্য্য করিতে হয়, এই অতথ্যজ্ঞান ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। বস্তুতঃ ধর্ম্ম ভাবকে জীবনের সকল কার্য্যকলাপে অনুস্যূত করাই আর্য্যশাস্ত্রের অভিপ্রেত। সেই অভিপ্রেত সাধন করিয়া চলিবার চেষ্টা করিলে ভারতবাসীর জীবন আবার সতেজ, সুন্দর এবং মধুময় হইয়া উঠিবে, আপনার শিক্ষা এবং

---

* ভারতবর্ষের বাহিরে কেবল দুই সময়ে দুই স্থানে এইরূপ ভাব কিয়ৎ পরিমাণে প্রকট হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এক মহম্মদ ও প্রাথমিক কালিফদিগের সময়ে আরব দেশে, আর ইংলণ্ডে পিউরিটান-দিগের অভ্যুদয় কালে।

তদ্দ্বারা অপরের হিতসাধনা ইহা ভিন্ন আর কোন চেষ্টা থাকিবে না, জীবিতকালের ঈষন্মাত্রাও নিষ্কর্ম্মে বা অকর্ম্মে নিরর্থক নষ্ট হইবে না এবং আমোদ প্রমোদও ধর্ম্মানুমোদিত, অবস্থার উপযোগী, বিশুদ্ধ এবং স্ফূর্ত্তি-প্রদ হইবে।

কর্ত্তব্যনির্ণয়—সূত্র নির্দ্ধারণ।

বুদ্ধি দুই প্রকারে কার্য্যকারিণী হয়। উহার এক প্রকার কার্য্যের নাম সংকলন, অপর প্রকারের নাম বিকলন। সংকলনের দ্বারা ব্যষ্টী-ভূত পদার্থ সকলের সমষ্টি সাধনপূর্ব্বক প্রয়োজনোপযোগী পদার্থের সংঘটন হয়, আর বিকলনের দ্বারা সমষ্টীভূত বস্তুর বিচার হইয়া তাহার উপাদান সমস্তের আবিষ্কার হয়। বুদ্ধিশক্তির এই দুই প্রকার কার্য্য যদিও যুগপৎ ভাবেই চলে, তথাপি উভয়েই সকল সময়ে সমানরূপে বলবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। সমাজের অবস্থাবিশেষে যখন দ্রব্য এবং ভাব সংঘটনের বিশেষ প্রয়োজন, তখন সংকলন শক্তি তেজস্বিনী দেখায়; এবং সমাজে ভাবান্তর উপস্থিত হইলে, যখন সংঘটিত ভাব এবং বস্তুর সম্বন্ধে চিন্তার আধিক্য হইয়া উঠে, তখন বিকলন শক্তি তেজস্বিনীরূপে বিস্ফুরিত হইতে দেখা যায়। ভারতবর্ষে যখন শাস্ত্রাদির প্রণয়ন, ব্যবস্থার নিরূপণ, দেবমূর্ত্তির কল্পন, এবং মহাকাব্য বিরচন হইয়াছিল, তখন সমাজ-নেতৃবর্গের সংকলনশক্তিমত্তা প্রকট হইয়াছিল। অনন্তর, যখন ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শনাদির প্রাদুর্ভাব হইল, তখন বিকলনশক্তিমত্তা অতি প্রবলরূপেই দেখা দিয়াছিল। বুদ্ধির উভয় শক্তিই সকল সময়ে কার্য্যকারী থাকে, তবে একটী বা অপরটী সময়-ভেদে অধিক বা অল্প পরিমাণে প্রবলরূপ দৃষ্ট হয়। সংকলন শক্তির

কার্য্য—সংঘটন, সুতরাং নির্ম্মাণ কার্য্যের বাহুল্যে ঐ শক্তির প্রাবল্য লক্ষিত হয়; বিকলনশক্তির কার্য্য—বিচার, সুতরাং উহার প্রাবল্য চিন্তার এবং পরীক্ষণের বাহুল্যে অনুভূত হইয়া থাকে।

সমাজের এই বিভিন্ন ভাব পুনঃ পুনঃ প্রকট হয়। একবার সংকলনের কার্য্য হইয়া পরে বিকলনের কার্য্য হইয়া গেলে, আবার সংকলনের কার্য্য চলে, এবং তাহার পর পুনর্ব্বার বিকলন হয়—এইরূপ পর পর হইতে থাকে। ভারতবর্ষে বৈদিক মন্ত্র এবং অনুষ্ঠানাদি প্রস্তুত হইয়া সামাজিক আচার ব্যবহারাদি সম্বদ্ধ হইয়া উঠিলে, দর্শন শাস্ত্র সকল জন্মে, সেই সকল দর্শনের এবং বৌদ্ধের বিচার দ্বারা বিভাজন কার্য্যের পর, আবার পুরাণ-সংহিতাদির সৃষ্টি হইয়া সমাজের দৃঢ়তর বন্ধন হয়। অনন্তর মুসলমানের আগমনে আবার নূতন ভাবাদির সমাগম হইলে, সংকলনের কাল আইসে। নানক, কবীর, দাদু প্রভৃতি পন্থী-বাদীরা এবং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ হিন্দু এবং মুসলমানের ভাব সম্মিলিত করিয়া আপনাপন মতবাদ স্থাপনের চেষ্টা করেন।

পৃথিবীর সকল সমাজেই এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে সংকলন এবং বিকলন শক্তির কার্য্যকারিতা অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এই পর্য্যায়ক্রমকে শ্রদ্ধা এবং সংশয়ের কাল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, এবং তাহা করিয়া সংশয়াত্মিকতার ভূয়সী প্রশংসা এবং শ্রদ্ধান্বিততার সমূহ নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহাদের মধ্যে তেমন কোন ভেদ নাই যাহার জন্য একটীর নিন্দা এবং অপরটীর প্রশংসা হইতে পারে।

এখন ভারত-সমাজে সংকলন শক্তিই বিশিষ্টরূপে বলবতী হওয়া আবশ্যক বোধ হয়। আর্য্য দার্শনিকদিগের সময়ে যে তীক্ষ্ণদৃষ্টিক বিচার চলিয়া গিয়াছে তাহাতে সকল বস্তুর, সকল ভাবের, এবং সকল ব্যাপারের উপাদানভূত মৌলিক পদার্থের আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে; ভিন্ন দেশীয় এবং ভিন্ন জাতীয় জনগণের সমাগমেও কিছু কিছু নূতন উপাদান

আসিয়াছে; এবং নানা কারণ সহকারে দেশের অনেকটা অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। অতএব পূর্ব্ব হইতে যাহা আছে, এবং পরে যাহা আসিয়াছে, তৎসমুদায়কে বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া বিনিবেশ করিবার জন্য সংকলন-শক্তি-মূলক-কার্য্য-সূত্র নির্দ্ধারণের প্রয়োজন। এখন কর্ম্মের আধিক্য হইলেই সজীবতার প্রমাণ হয়।

কর্ম্মেরই প্রয়োজন বলিয়া আমি কোন সময়ে একটী সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। শ্লোকটী এই—

চরাচর মিদং সর্ব্বং যৎসৃষ্টং কর্ম্মণা ময়া।
তস্মাৎ কর্ম্ম ভজেন্নিত্যং ভক্তিজ্ঞানসমন্বিতং॥

আমি কর্ম্মের দ্বারাই চরাচর সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব ভক্তি এবং জ্ঞানযুক্ত হইয়া নিত্যই কর্ম্মের সেবা করিবে।

শ্লোকটীতে ভক্তি, জ্ঞান এবং কর্ম্মের সম্যক্ সম্মিলনের আদেশ আছে এবং কর্ম্মেরই প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। অতএব শ্লোকটীর উপ-দেশ বর্ত্তমান কালের সম্পূর্ণরূপেই উপযোগী। কর্ম্ম করাই আমাদিগের পক্ষে বিধেয়। কিন্তু কর্ম্ম বলিলে কি বুঝিতে হইবে?

আমাদিগের শাস্ত্রসমূহের প্রধান প্রধান টীকাকার এবং ভাষ্যকার প্রভৃতি সকলেই সন্ন্যাসী বা পরমহংস ছিলেন। যখন কোন কর্ম্মের উদাহরণ দিতে হইয়াছে, উহাঁরা তখনই অগ্নিষ্টোম, জ্যোতিষ্টোম, অশ্ব-মেধাদি যজ্ঞীয় ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া কর্ম্মের উদাহরণ দিয়াছেন। সাধারণ গৃহস্থ লোকের করণীয় অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যুদ্ধ, কৃষি বাণিজ্যসেবাদি কর্ম্মের উল্লেখও করেন নাই। এই জন্য আমাদের মধ্যে কর্ম্ম শব্দের মুখ্যার্থ লুপ্তপ্রায় হইয়া উহার গৌণার্থ যে যজ্ঞাদি ব্যাপার তাহাই প্রচলিত হইয়াছে, এবং বিষয় কর্ম্মের সহিতও ধর্ম্ম ব্যবহারসম্পর্ক-শূন্যের ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কর্ম্মের প্রকৃত অর্থই উক্ত হইয়াছে, যথা—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততং।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

যাঁহা হইতে জীব সমস্ত উৎপন্ন, যাঁহাকর্ত্তৃক এই সমুদায় জগৎ বিস্তৃত হইয়াছে, মনুষ্য আপনাপন কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহার পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে।

অতএব জীব আপনার প্রয়োজনীয় সাধারণ কার্য্য পূজাবুদ্ধিতে নির্ব্বাহ করিলেই জগৎকর্ত্তার অর্চ্চনা করে এমন বলা যায়। কর্ম্ম শব্দের এই প্রকৃত এবং উদার অর্থ লইয়া এবং যে কর্ম্ম করি, তাহাই ঈশ্বরের পূজা হউক, মনে মনে এই ভাব স্থিরতর রাখিয়া আমাদিগের পক্ষে যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহার স্থূল স্থূল কয়েকটী সূত্র সঙ্কলন করা যাইতে পারে। যথা—

১। পারিবারিক। সমস্ত পারিবারিক বিধি একটী মূল সূত্রের অন্তর্ভূত করা যায়। সে সূত্রটী এই, যাহাতে বাটীর সন্তানদিগের সর্ব্বতোভাবে উৎকর্ষ হয়, কায়, মন, বাক্য, ব্যবহারে তাহাই করণীয়। তাদৃশ কার্য্যই পারিবারিক ধর্ম্মে ঈশ্বরের পূজা।

২। সামাজিক। সামাজিক কার্য্য সূত্রও একটী হইতে পারে— যাহাতে অন্যের প্রতি তোমার নিজের সহানুভূতি সম্বর্দ্ধিত হয়, কায়, মন, বাক্য, এবং ব্যবহারে এরূপ অভ্যাসই সামাজিক ধর্ম্মে ঈশ্বরের পূজা। কিন্তু এই সাধারণ মূল সূত্র হইতে কয়েকটী বিশেষ সূত্রেরও নির্দ্দেশ হইতে পারে।

(ক) প্রতিবাসী। প্রতিবাসীর প্রতি স্থলভেদে গৌরব, সাম্য এবং দয়া প্রকাশ করিতে হয়। প্রতিবাসীদিগের সুখে সুখানুভব এবং দুঃখে দুঃখানুভব করিতে হয়। প্রতিবাসীদিগের সাহায্যদানে সর্ব্বদা উন্মুখ থাকিতে হয় এবং প্রতিবাসীর স্থানে সাহায্যপ্রাপ্তিতেও সঙ্কুচিত হইতে নাই। প্রতিবাসীর সহিত বাক্যালাপ এবং ব্যবহারে অহঙ্কার এবং মাৎসর্য্য এই দুইটী দোষ বিশিষ্টরূপেই পরিহার করিতে হয়। প্রতিবাসীর কোন কাজ করিয়া দিবার সময় তাহা নিজের কাজ অপেক্ষাও গুরুতর মনে করিয়া নির্ব্বাহ করিতে হয়।

(খ) স্বদেশীয়। স্বদেশীয় লোকের প্রতি সর্ব্বদা সমাদর প্রদর্শন করিতে হয়। বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালী অথবা ভারতবর্ষের অপর কোন প্রদেশবাসী বিশিষ্টরূপেই প্রেমের পাত্র। আমরা এক পুণ্যভূমিতে জাত এবং পালিত, এবং আমাদের অন্তঃকরণের গঠন পরস্পর অভিন্ন, এই ভাবটী মনে জাগরুক রাখিতে হয়। ভারতবর্ষের অধিক লোকেই হিন্দিভাষায় কথোপকথন করিতে সমর্থ। অতএব সুদ্ধ ভারতবাসীর বৈঠকে ইংরাজীর ব্যবহার না করিয়া হিন্দিতে কথোপকথন করাই ভাল। বাঙ্গালী বাঙ্গালীতে ত ইংরাজী না চলাই উচিত। পত্রাদি লিখিতেও ইংরাজীর ব্যবহার পরিত্যক্ত হওয়া বিধেয়। প্রতিবাসী বা স্বদেশী যদি মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ অথবা অপর কিছু হয়েন, তাহাতেও ব্যবহারাদির ব্যতিক্রম হইতে পারে না। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখ অন্ত্যজাদি আছে বলিয়া প্রতিবাসীদিগের মধ্যে পরস্পর ব্যবহারেত কোন ভেদ করা যায় না। মুসলমান্ খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম প্রভৃতির সহিতও সেইরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভারত সমাজে বর্ণভেদ প্রথা থাকায় পরস্পর সহানুভূতি বাড়িলেই অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অতি স্বল্পায়াসে সমাজান্তর্গত করিবার পথ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) ভিন্নদেশীয়। ভিন্নদেশীয়দিগের প্রতি সাহায্য-দানে এবং দয়া প্রদর্শনে ত্রুটি করিতে নাই।

(ঘ) রাজা। রাজার কাজ বাড়াইতে নাই। যেমন সুপালিত এবং সুব্যবস্থিত পরিবারের মধ্যে কর্ত্তাকেই সকল বিষয়ের জন্য বিরক্ত করিতে হয় না, বাটীর প্রৌঢ়, যুবক, গৃহিণী, বধূ এবং কন্যাগণ, দাস দাসী প্রভৃতি সকলে বিবেচনা এবং ধীরতা পূর্ব্বক আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লয়—আমাদিগেরও রাজার প্রতি সেইরূপ সম্ভ্রমশীল হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করা উচিত। রাজাকে যত অল্প দেখিতে এবং করিতে হয়, ততই ভাল। তাহাতে শুদ্ধ সহানুভূতি নয়, প্রকৃত রাজভক্তিও প্রদর্শিত হয়। দেশীয়দিগের মধ্যে যাহারা বিজাতীয় রীত্যাদির

পক্ষপাতী হইয়া অথবা অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের মোহে মুগ্ধ হইয়া সাধারণতঃ দেশীয় জনগণের প্রকৃতি, রীতি ও অবস্থার বিপরীত কার্য্যের জন্য রাজ ব্যবস্থার প্রার্থনা করে, তাহারা অনেক সময়েই রাজাকে নানা-প্রকার অসুবিধায় ফেলে। কেহ কেহ মনে করেন যে, এদেশে রাজা আপন ইচ্ছাতেই সকল কাজে হাত দিতে যান। কিন্তু সকল কার্য্যেই রাজার হস্তক্ষেপ প্রজার অভিমত নহে, ইহা দেশীয় সকলে এক বাক্যে জানাইলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐ সকল কার্য্যে রাজার পূর্ব্বেও আগ্রহ ছিলনা এখনও নাই।

(ঙ) রাজ-পুরুষ। আমাদের রাজ-পুরুষ দুই প্রকারের—তিন প্রকারের বলিলেও হয়। এক, বিজাতীয় ইংরাজ রাজ পুরুষ। অপর, স্বদেশীয় প্রাপ্তপদ রাজ-পুরুষ। তৃতীয়, অপ্রাপ্তপদ রাজার সজাতীয় লোক।

(চ) বিজাতীয় রাজ পুরুষদিগের প্রতি আমাদের ব্যবহার সর্ব্ব-তোভাবে নম্র এবং নির্ভীক হওয়া আবশ্যক। নির্ভীকতা রক্ষার একমাত্র উপায় অতি সাবধানতাপূর্ব্বক সত্যের সম্যক্ পালন। উহাঁদিগের তুষ্টি সাধনের জন্য বিন্দু মাত্রও মিথ্যার প্রয়োগ করিবে না এবং নির্ভীকতা প্রদর্শনার্থেও বিন্দুমাত্র নম্রতার ক্রটি করিবে না। সমুদায় কথা এবং কার্য্য বিনম্র এবং সত্যপূত হইবে। ইংরাজ রাজ-পুরুষের সহিত কখন আলগা হইয়া কথা কহিতে নাই। উহাঁরা ভিন্ন সমাজের লোক। সেই ভিন্ন সমাজের সহিতই উহাঁদিগের বিশেষ সহানুভূতি। আমাদের সহৃদয় গবর্ণমেণ্ট যেন তাহা বুঝিয়াই কখন কখন ইংরাজী শিক্ষিত দু দশ জনকে দেশীয়দিগের প্রতিনিধি স্বরূপ লইয়া পরামর্শাবধারণ করিতে যান। ওরূপে আহূত হইলে প্রত্যেক সুজাত ভারত সন্তানের উচিত যে, রাজ পুরুষদিগের অভিমতি বুঝিয়া তাঁহাদের সন্তোষার্থ অথবা তিনি স্বয়ং যে পাশ্চাত্য প্রণালীর বিশেষ পক্ষপাতী তাহা দেখাইবার জন্য কিম্বা আপনাদের মধ্যে একজন যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিপরীত যুক্তির অবলম্বন

করিয়া কয়েকটি ইংরাজী গত বলিবার জন্য, যেন স্বদেশীয় জনগণের প্রকৃত শুভানুষ্ঠানের প্রতিকূল পরামর্শ না দেন।

(ছ) দেশীয় রাজ-পুরুষদিগের মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা যে, লোকে তাঁহাদিগের প্রতিও ইংরাজ রাজ-পুরুষদিগের সদৃশ মান সম্ভ্রম প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের এই অভিলাষ-পূরণ করাই ভাল। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে একটী বিশেষ কর্ত্তব্যও আছে—তাঁহাদিগকে সর্ব্বদাই এমন সাহায্য দান করিতে হয়, যাহাতে তাঁহারা আপনাপন কার্য্যে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন।

(জ) রাজার জাতীয় লোক, যথা ইউরোপীয় বণিক, প্লাণ্টর, কলওয়ালা, দোকানদার, পাদ্রি, সম্পাদক প্রভৃতি। কোম্পানি বাহাদুরের অধিকার লোপ হওয়া অবধি, এই সকল ইংরাজের সংখ্যা এবং ক্ষমতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। দেশীয় লোকের অপেক্ষা ইহাঁদিগের কথার গৌরব অনেক বাড়িয়াছে। এই জন্য ইহাঁদিগের প্রতিও কিয়ৎ পরিমাণে রাজপুরুষবৎ ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত। অর্থাৎ নম্রভাব অবলম্বন পূর্ব্বক নির্ভীক এবং সতর্ক হইয়া চলাই বিধেয়। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। পাইওনিয়র কিম্বা ইংলিস্ম্যান কিম্বা হেষ্টি কিম্বা ব্রানসন্ অথবা কেস্উইকের ন্যায় কোন সম্পাদক, পাদ্রি বা রাজজাতীয় পুরুষ, ভারতবাসীর নিন্দা করিলে, ইংরাজের জাতি বা ধর্ম্ম ধরিয়া প্রতিনিন্দা না করিয়া উহাঁদের গালি দান যে সত্য হয় নাই, মিথ্যা হইয়াছে, তাহাই প্রমাণ সহকারে দেখাইয়া দিয়া আর কিছু না বলাই বিধেয়। নিন্দাতে ধর্ম্মের রক্ষা হয় না, কিন্তু ধর্ম্মরক্ষা করিয়া সকল কার্য্যে ঈশ্বরের পূজা করিব, ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এইরূপে সর্ব্বদা সত্যের পালন, সর্ব্বদা সতর্ক থাকা, এবং সর্ব্বদা যথাযোগ্য স্থলে সহানুভূতি প্রদান বিষয়ে উন্মুখ থাকিলেই আমাদের কার্য্যকলাপে সত্যের, জ্ঞানের, এবং আনন্দের অধিষ্ঠান থাকিয়া উহা সফলতা প্রাপ্ত হইবে।

৩। বহিরাশ্রমিক। সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া যাঁহারা গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়াছেন, অথবা তাদৃশ শিক্ষার প্রভাবে কথনই গৃহস্থাশ্রম

অবলম্বন করেন নাই, তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রধান গৃহস্থাশ্রমের বহিঃস্থিত বলিয়া বহিরাশ্রমিক বলা যায়। তাঁহাদিগকে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহার্থে সমাজেরই উপর নির্ভর করিতে হয়। অতএব সমাজের হিতের নিমিত্ত আপনাদিগের সুশিক্ষা নির্ব্বাহ ও তদনন্তর সাধুশীলতা ও সংযমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন অথবা জ্ঞানের বিস্তার চেষ্টা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, এবং তাহাই এক্ষণে সন্ন্যাসাশ্রমের মুখ্যধর্ম্ম বা ঈশ্বর পূজা।

কর্ত্তব্যনির্ণয়—সূত্রের ব্যাখ্যা।

কাহার কাহার মতে সমাজই ধর্ম্মের মূল। সমাজ হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি। সমাজ ছাড়িয়া দেখিলে, সমস্ত প্রকৃতিকার্য্যের মধ্যে কোথাও ধর্ম্মভাব নাই। প্রকৃতিতে, কি জড়ে কি চেতনে, ধর্ম্মও নাই অধর্ম্মও নাই—প্রকৃতি, ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভাব-পরিশূন্য। নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকেরই এই মত।

আমাদিগের শাস্ত্রের মত ভিন্নরূপ। পশুদিগের এবং মনুষ্যদিগের সংঘ জন্মিলে, ধর্ম্মের ভাবটী প্রকটিত হয় মাত্র; কিন্তু সমজ বা সমাজ ঐ জ্ঞানের মূল হইতে পারে না। শাস্ত্র বলেন, অভাব পদার্থ হইতে কোন ভাব পদার্থ জন্মে না। ধর্ম্ম একটী ভাব পদার্থ। যদি উহা জীব-ধর্ম্মের অন্তর্ভূত রূপে না থাকিত, তাহা হইলে শুদ্ধ জীবের সঙ্ঘমাত্রে (অর্থাৎ সমজ বা সমাজের সংঘটন মাত্রে) উহা জন্মিতে পারিত না। দ্রব্যের অণুগুলি পরস্পর দূরবর্ত্তী থাকিলে, উহাদিগের মধ্যে আকর্ষণ শক্তির কার্য্য দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহা বলিয়া যেমন প্রতি অণুতে আকর্ষণশক্তি নাই বলিতে পারা যায় না, এস্থলেও ঠিক তদ্রূপ হয়। জীবের সঙ্ঘ না হইলে উহাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম জ্ঞানের কোন লক্ষণ দেখা যায় না বটে, কিন্তু যখন সঙ্ঘ হইলেই ঐ জ্ঞানের কার্য্য দৃষ্ট হয়, তখন ঐ জ্ঞান অনুদ্ভূতাবস্থায় জীবধর্ম্মের মধ্যেই আছে, ইহা বলিতে হইবে। এই জন্য শাস্ত্রে ব্রহ্মই ধর্ম্মের মূল বলিয়া

উক্ত। "ঊর্দ্ধমূল মবাকশাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতনঃ"। এই সনাতন অশ্বত্থের মূল ঊর্দ্ধে, শাখা নিম্নে।

বিজ্ঞান, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান আধিভৌতিক ব্যাপার সকল একই শক্তির কার্য্য। বিজ্ঞান ইহাও বলিতে উন্মুখ হইয়াছেন যে, আধি-ভৌতিক এবং আধি-জৈবনিক কার্য্যকলাপও একই অভিন্ন শক্তির কার্য্য হইতে পারে। বিজ্ঞান, কালে ইহাও বলিতে পারেন যে, আধ্যাত্মিক ক্রিয়া সমস্তও কোন স্বতন্ত্র মূল হইতে হয় না, সেই একই মূলশক্তি হইতে সমুদ্ভূত। সে পর্য্যন্ত হইলে, সামাজিক নিয়মাদি বা ধর্ম্ম সূত্রও যে, ঐ মূলশক্তির কার্য্য বলিয়া অবধারিত হইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী। অতএব আমাদের শাস্ত্রে যে সিদ্ধান্ত আছে, তাহাই যে, বৈজ্ঞানিক চরম সিদ্ধান্তের সহিত একীভূত হইবে, ইহাই সম্ভবপর—অর্থাৎ আকর্ষণাদি ভৌতিক বা বাহ্যশক্তির মূলেও যাহা, ধর্ম্মজ্ঞানের মূলেও তাহাই বলিয়া পরিজ্ঞাত হইবে।

"ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়াভূতং চরাচরং"।

(গীতায় ভগবান বলিতেছেন) এই চরাচর ভূত সৃষ্টিতে এমন কিছুই নাই যাহা আমা হইতে নয়।

বিজ্ঞানের অতদূর উন্নতি হইতে অনেক বিলম্ব আছে। কিন্তু তাহা না হওয়া পর্য্যন্ত ধর্ম্মকে সমাজের উৎপত্তির হেতু যদি কেহ না বলিতে চান, তথাপি ধর্ম্মই যে সমাজের স্থিতি এবং বৃদ্ধির একমাত্র কারণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র মতভেদ নাই। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া যেমন কোন বাহ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না, তেমনি সামাজিক কোন কার্য্যই ধর্ম্মসূত্রকে ছাড়িয়া পরিচালিত হইতে পারে না। ধর্ম্মই সামাজিক সকল শক্তি এবং নিয়মের আত্মা।

ভারতসমাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। ইহার বলবর্দ্ধনের একমাত্র উপায় ধর্ম্মের বৃদ্ধি। অপর কোন উপায়ের দ্বারাই প্রকৃত প্রস্তাবে অথবা স্থায়ীভাবে ভারত-সমাজের শুভ সাধন হইতে পারে না। যে যে

কার্য্য দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অথবা পরম্পরা সম্বন্ধে, পরার্থপরতা প্রবল হইবে, সম্মিলনের ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে, আত্মসংযম বর্দ্ধিত হইবে, এবং পাশবভাবের ন্যূনতা হইবে, তাহাতেই সমাজের বলবৃদ্ধি হইবে। যিনিই যাহা বলুন, নিজ সমাজ মধ্যে সহানুভূতি বিস্তারের ব্যাঘাতক, মনের সঙ্কীর্ণতা সাধক, এবং বিলাস-বাসনার উত্তেজক, কোন অনুষ্ঠানই ধর্ম্ম্য-কার্য্য হইতে পারে না।

আজি কালি ধর্ম্মের সহিত সুখের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই লোকের মুখে শুনা যায়। এখন বাঙ্গালা বহিগুলিতে "মনের সুখ" "আত্মপ্রসাদ" প্রভৃতি শব্দের কিছু অধিক পরিমাণেই প্রচলন হইয়া উঠিয়াছে। উহা একটী দুর্লক্ষণ বলিয়াই মনে করি। কারণ উহাতে ধর্ম্মের অপরাপর প্রধানতম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি ন্যূন হইয়া উহার অনিশ্চিত সহচর সুখের দিকেই দৃষ্টির আধিক্য প্রকাশ করে এবং আত্মপ্রসাদ লাভও যে অত্যন্ত আয়াসসাধ্য ও কষ্টকর ব্যাপার তাহা ঐ সকল জল্পনাদ্বারা প্রকট না হইতে পাওয়ায় প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণের ব্যাঘাত হয়। ধর্ম্ম কথাটী বলিতে সহজ, কিন্তু উহা তেমন সহজ বস্তু বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই——

ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গমপথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

সে পথ শানিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, পণ্ডিতেরা ইহাই বলিয়াছেন। সুখের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ তেমন ঘনিষ্ঠনয়। তাহাও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্য দুতৈবপ্রেয়ঃ।
তেউভে নানার্থে পুরুষং সিনীত।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধুভবতি।
হীয়তে হর্থাদ্ য উ প্রেয়োবৃণীতে ॥

শ্রেয়স্কর এবং প্রীতিকর এই দুইটি বোধের দ্বারা মনুষ্য নানা প্রয়োজনে বদ্ধ হয়। তাহার মধ্যে যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃ গ্রহণ করে সে সাধু হয়, যে প্রেয়কে বরণ করে তাহার প্রয়োজন সিদ্ধি হয় না।

অতএব প্রীতি-প্রদ সুখ, মঙ্গলকর ধর্ম্মের চিরসহচর না হইয়া বস্তুতঃ তাহা হইতে দূরগত বস্তু। ধর্ম্ম করিলেই সুখ হয়, যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা ধর্ম্ম ব্যবহারের প্রবর্ত্তনার জন্য অলীক প্ররোচনা প্রদান করেনমাত্র। কষ্ট এবং চিন্তা এবং সংযম এবং পরিশ্রম এবং অবধানতা, প্রায় ধর্ম্মকার্য্যের নিত্য সহচর রূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা ধর্ম্মকার্য্যের শুভফল, তাহা প্রায়ই দূরে ফলে এবং কখন কখন জন্মান্তরের প্রতীক্ষাতেও থাকে। প্রকৃষ্ট সুখের লক্ষণ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামে ঽমৃতোপমং।
তৎ সুখং সাত্বিকং প্রোক্তং আত্মবুদ্ধি প্রসাদজং॥

অভ্যাস বশতঃই যাহা রমণীয়, যাহা দুঃখের শেষ করিয়া যায়, যাহা অগ্রে বিষের ন্যায় বোধ হয় এবং পরিণামে অমৃতের তুল্য হয়, তাহাকেই আত্মপ্রসাদ-জনক সাত্বিক সুখ বলে।

অতএব আত্মপ্রসাদটী ও হাতে হাতে পাইবার বস্তু নয়। সুতরাং সুখ প্রাপ্তির জন্য ধর্ম্ম করিতে হয় বলিয়া যে, ভ্রমসঙ্কুল বিপথপ্রাপক মতটী এক্ষণে দেখাদিয়াছে, সেটীর অস্তিত্ব লোপ হওয়াই ভাল। ঐমতটি যে বিচার-মূলক তাহার ব্যাসবাক্য এইরূপ হইতে পারে, যথা—"এমন কাজ করিব, আর ওরূপ কাজ করিব না কেন?—এমন কাজে ধর্ম্ম আর ওরূপ কাজে অধর্ম্ম হয়। ধর্ম্ম করিব কেন, আর অধর্ম্ম না করিব কেন?"—এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর কিছুই খুঁজিয়া না পাইয়া হেতুবাদাশ্রয়ীরা বলেন, 'ধর্ম্মে সুখ তাই ধর্ম্ম করিবে, আর অধর্ম্মে অসুখ, তাই অধর্ম্ম করিবে না।' কিন্তু ঐ উত্তর সদুত্তর নয়, কারণ উহা প্রত্যভিজ্ঞা-বিরুদ্ধ। ধর্ম্মের সহিত সুখের যে সম্পর্ক তাহা দূর সম্পর্ক; কখন কখন বহু অনুসন্ধানেও তাহা দেখা যায় না। অতএব ধর্ম্মে সুখ, তাই ধর্ম্ম করিবে, আর অধর্ম্মে দুঃখ, তাই অধর্ম্ম করিবে না, একথা না বলিয়া বলিতে হইবে যে, ধর্ম্ম হইতেই রক্ষা হয়, তাই ধর্ম্ম করিবে; আর অধর্ম্ম হইতে বিনাশ হয়,

তাই অধর্ম্ম করিবে না। ধর্ম্ম—ধারণ করে বা রক্ষা করে, হাতে হাতে সুখ দেয় না। গীতায় সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ শ্রীভগবান এই কথাইবলিয়াছেন—

মচ্চিত্তঃ সর্ব্ব দুর্গাণি মৎ প্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথচেত্ত্ব মহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥

আমার প্রতিচিত্ত স্থাপন করিলে আমার প্রসাদে সকল বিপদ উত্তীর্ণ হইবে, যদি অহঙ্কার করিয়া আমার কথা না শুন, তবে বিনষ্ট হইবে।

অতএব ধর্ম্মাধর্ম্মসুখ দুঃখের কথা নয়; থাকিবার বা না থাকিবার কথা। এখন ভারত-সমাজেরও বাঁচিবার মরিবার কথা দাঁড়াইয়াছে, ইহার সুখের বা দুঃখের কথা অতি দূরগত হইয়াছে। সেই জন্য যে একমাত্র শক্তি সর্ব্বশক্তির মূল, যে শক্তি রক্ষণ কার্য্যে সমর্থ, যাহার সহায়তায় সকল বিঘ্ন বিপত্তি দূর হয়, তাহারই শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক।

ধর্ম্মে এবং সুখে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বাধাইয়া দিবার অপর একটা হেতুও আছে। ইংরাজেরা খুব ভাল বাড়ীতে থাকেন, খুব ভাল গাড়ী চড়েন, খুব ভাল খান, ভাল পরেন, অথচ তাঁহারা খুব প্রতাপশালী, বিদ্বান, বিচক্ষণ এবং দেশে রাজা। এই সকল দেখিয়া লোকের বোধ হইয়া যায় যে, ভোগ-বিলাসের সহিত ধর্ম্মের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হয়, ইংরাজেরা কি সত্য সত্যই তেমন বিলাসী? স্বদেশে উহাঁরা কি ভাবে থাকেন, তাহাত আমরা কিছুই জানিনা, এখানেও উহাঁদিগের বাহ্য আড়ম্বর মাত্র দেখিতে পাই। শুনিয়াছি, অধিকাংশ ইংরাজই যথেষ্ট মিতব্যয়ী। উহাঁরা মনে করেন যে, এদেশের লোকেরা জাঁক জমকের বড়ই গৌরব করে, হয়ত সেই জন্যই দেশীয়দিগের সন্তোষের অথবা ভয় ভক্তি উদ্রেকের উদ্দেশে অতটা বাহ্যাড়ম্বর করিয়া থাকেন। হয়ত, প্রভুতা এবং ধনাধিকার বশতঃ উহাঁদের হৃদয়েও বিলাস বাসনারূপ কীটের প্রবেশ হইয়া গিয়াছে, পরিণামে কি ফল হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? বস্তুতঃ যখন ইংরাজ তাঁহার বর্ত্তমান প্রতাপশালিতায় প্রথম পদার্পণ করেন, তখন তাঁহার কিছু মাত্র বিলাসিতা

ছিল না; তখন তিনি নাচ, তামাসা, গান, বাদ্য, নাটকাভিনয় প্রভৃতি সকল আমোদ প্রমোদের একেবারে পরিহার করিয়াছিলেন। অতএব বলা যাইতে পারে যে, সেই সময়ের ধর্ম্ম বলেই এখনও ইংরাজ বলীয়ান আছেন—বিলাসিতার জন্য তিনি বলীয়ান নহেন।

ধর্ম্মাধর্ম্মের সহিত যে সুখ দুঃখের তেমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ নাই, তাহা আরও এক প্রকারে বুঝিতে পারা যায়। যদি সুখ-বোধই ধর্ম্মের প্রকৃত লক্ষণ হইত, তবে ধর্ম্মের বৃদ্ধির সহিত সুখবোধটীরও বৃদ্ধি হইত; আর যদি দুঃখ বোধই অধর্ম্মের অব্যভিচারী লক্ষণ হইত, তবে অধর্ম্মের বৃদ্ধির সহিত দুঃখ বোধেরও বৃদ্ধি হইত। কিন্তু তাহা হয় না। ধর্ম্মের ব্যবহার অভ্যস্ত হইয়া উঠিলে, চরিত্রের উন্নতি হয় বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-কার্য্যের সুখানুভব ন্যূন হইয়া যায়; পাপের অভ্যাসেও চরিত্রের অপকর্ষ হয়, কিন্তু পাপকার্য্য জনিত দুঃখের বোধও কম হইয়া থাকে। প্রত্যুত, ধর্ম্মকার্য্যে সুখের বোধ অল্প হওয়া, চরিত্রের উৎকর্ষ লক্ষণ; এবং পাপ-কার্য্যে দুঃখানুভব অল্প হওয়া, চরিত্রের অপকর্ষের লক্ষণ বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং সুখ দুঃখকে ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণরূপে নির্দ্দেশ করা একটী মহৎভ্রম।

এই ভ্রমাত্মক মতবাদ হইতে ইউরোপে আর একটা মতবাদ সমুত্থিত হইয়াছে। সেটাকে বঙ্গভাষায় 'হিত-বাদ' বলা হইয়াছে। এই মতে ব্যক্তিগত সুখ দুঃখকে ধর্ম্মাধর্ম্মের লক্ষণরূপে নির্দ্দিষ্ট না করিয়া ধর্ম্মা-ধর্ম্মকে বহুসংখ্যক-লোকগত সুখ দুঃখের লক্ষণাত্মক বলা হয়। যাহাতে অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ সুখ হয়, তাহাই ধর্ম্ম; আর যাহাতে অধিক-সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ দুঃখ তাহাই অধর্ম্ম। ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের মতবাদ অপেক্ষা, এই হিতবাদটী অনেকাংশেই উৎকৃষ্ট। কিন্তু ইহাকেও সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য সমীচীন নহে, যে, ঐ লক্ষণের অর্থবিভিন্নরূপে এবং প্রয়োগের পথ নানাপ্রকারে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। "অধিক পরিমাণ সুখ" বলিলে কি

সুখের কালাধিক্য বুঝিব, না সুখের গভীরতাধিক্য বুঝিব? আর "অধিক-সংখ্যক লোক" বলিতে কেমন লোক বুঝিব? বস্তুতঃ হিতবাদ মতটী প্রজাতন্ত্র রাজ্যগুলিতে সাধারণ লোকদিগের রুচিকর হয় বলিয়াই ইউরোপে উহার নামডাক এত বাড়িয়াছে। উহার প্রকৃত প্রয়োগ বড়ই দুরূহ। কিসে যে লোকর প্রকৃত হিত হয়, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। প্রয়োগকালে হিতবাদীরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে আপনাপন মনঃকল্পিত জিনিসকেই লোকের হিতকর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তর্কস্থলে হিতবাদের এই অর্থ করিতে পারা যায় যে, ধার্ম্মিক এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিরা লোকের উপকার হইবে ভাবিয়া যে কার্য্যে উপদেশ দেন, তাহাই ধর্ম্মকার্য্য।

বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্য মদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়ে নাভ্যনুজ্ঞাতো যোধর্ম্মস্তন্নিবোধতঃ॥

প্রত্যুত তাদৃশ উপদেশ, প্রচলিত শাস্ত্রীয় বিধির সহিত অভিন্নভাবেই চলিয়া থাকে। শাস্ত্রীয় বিধির যথাযথ ব্যাখ্যা হইলেই ঐ সকল বিধি যে সমাজ রক্ষণ কার্য্যের উপযোগী তাহা স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। এই জন্য বিধির প্রতিপালনই ধর্ম্ম (বিধিপ্রতিপালনোহি ধর্ম্মঃ) এবং ধর্ম্মের ফল রক্ষা—ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া আছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতো।
জ্ঞাত্মাশাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্মকর্ত্তু মিহার্হসি॥

ধর্ম্ম কাহারও নিজের মনগড়া হয় না এবং সুখবোধও ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না।

ফল কথা, সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসেই দেখা যায় যে, যে সময়ে যে জাতির হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের প্রাবল্য হইয়াছে, অর্থাৎ যে সময়ে যে জাতি স্বকীয় শাস্ত্র বিধি পালনে একাগ্রচিত্ত হইয়াছে, সেই সময়ে সেই জাতির ভোগসুখাভিলাষ ন্যূন হইয়াছে, আত্মসংযম দৃঢ় হইয়াছে, এবং সেই সময়েই সেই জাতির বল সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে—এবং যথাকালে সেই জাতিই

বিপদজাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, এবং বিদ্যাবত্তায় এবং ধনবত্তায় এবং গৌরবসৌরভে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ সকল জাতির ইতিহাসই সাক্ষ্য দেয় যে, লক্ষ্মী এবং সরস্বতী এবং কীর্ত্তি ইহাঁরা তিন জনেই ভগবান ধর্ম্মের চির-সঙ্গিনী।

কর্ত্তব্যনির্ণয়—সূত্রের প্রয়োগ।

ভারত সমাজে বিশেষ ভয়ের কারণ দুইটী উপস্থিত হইয়াছে। এক, বিদ্যাহীনতা; অপর, ধনহীনতা। ধর্ম্মসূত্র গ্রহণপূর্ব্বক কোন্ কোন্ কার্য্য দ্বারা ঐ ভয়ের নিবারণ হইতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার প্রয়োজন।

বিদ্যাহীনতা। ইংরাজের অধিকারে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে বলিয়াই লোকের সংস্কার। কিন্তু ঐ সংস্কারটী সম্যক ভ্রম-শূন্য বলিয়া বোধহয় না। শিক্ষা দুই প্রকারের। এক, প্রাথমিক শিক্ষা; অপর, উচ্চশিক্ষা। তন্মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃত কথা এই যে, এ দেশে বহু পূর্ব্বকাল হইতে যে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলৎ ছিল, উহা এখন তাহা হইতে পাদমাত্র অগ্রসর হয় নাই। পূর্ব্বে যে শ্রেণীর লোকেরা পাঠশালায় ছেলে পাঠাইত এখনও সেই শ্রেণীর লোকেরাই পাঠায়, তন্নিম্নতর শ্রেণীর লোকেরা এখনও ছেলে পাঠায় না। ইংরাজদিগের স্বদেশে প্রাথমিক শিক্ষাটী নিতান্তই নূতন ব্যাপার। ইংরাজেরা আপনাদিগকে সকল বিষয়েই সর্ব্বাপেক্ষায় উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করেন। অতএব তাঁহাদের দেশে যাহা ছিল না, তাহা পূর্ব্ব হইতেই এদেশে আছে, এ কথা উহাঁদের মনে স্থান পায় না। এই জন্যই উহাঁরা আপনাদিগকে এখানকার প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবর্ত্তক, অন্ততঃ তাহার বিস্তার-কর্ত্তা বলিয়া

মনে করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু দেশের দারিদ্র বর্দ্ধনের সহিত কি প্রাথমিক, কি উচ্চ, কোন শিক্ষারই বৃদ্ধি হয় না, প্রত্যুত সঙ্কোচই হইয়া থাকে এবং তাহাই হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষা ত বিস্তারে বাড়ে নাই, গভীরতায় কিছু ন্যূন হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। কি নীতি অর্থাৎ গুরুজনে ও দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, কি মানসাঙ্ক, কি হস্তাক্ষর, কিছুতেই এখনকার পাঠশালার ছাত্রেরা পূর্ব্বকার পাঠশালার ছাত্র-দিগের সহিত তুলনীয় নহে। এদেশের বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। ওরূপ শিক্ষার হ্রাস বৃদ্ধিতে বর্ত্তমান কালে ভারত-সমাজের বিশিষ্ট হিতাহিত কিছুই হইতে পারে না। যখন ইউরোপীয়দিগের কোন প্রাথমিক শিক্ষা ছিল না, তখন হইতেই উহাঁরা প্রবল হইয়াছেন, আর ব্রহ্মদেশীয়দিগের মধ্যে আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই লিখিতে এবং পড়িতে পারে, তাহাতে ব্রহ্মদেশ, কি ধনে, কি ধর্ম্মে, কি গৌরবে, কিছুতেই বড় হয় নাই।

এখনকার ইংরাজী উচ্চশিক্ষা দেশীয় উচ্চশিক্ষার অনেকটা স্থান অধিকার করিয়াছে। যেমন ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা হইতেছে, তেমনি সংস্কৃত এবং আরবি ফারসি কম হইয়া গিয়াছে। স্কুল কলেজ বাড়িয়াছে, কিন্তু টোল, চতুষ্পাঠী, আখড়া, মাদ্রাসা কমিয়াছে। তবে যে সকল শ্রেণীর মধ্যে পূর্ব্বে উচ্চ শিক্ষা ছিল না তাহাদের মধ্যেও ইংরাজী শিক্ষা কতকটা প্রবেশ করিয়াছে। তাহা করিলেও শুনিতে পাই যে, এখনও সমস্ত বাঙ্গালা প্রদেশে ইংরাজী স্পৃষ্ট লোকের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজারের কম। এখানে যে ইংরাজী বিদ্যার প্রচার হইয়াছে, তাহাও পূর্ণাবয়ব নহে। ইংলণ্ডের প্রাথমিক পাঠশালার ছাত্রেরা যে সকল বিষয় শিক্ষা করে, এখানকার স্কুল কলেজের উচ্চশ্রেণীগুলিতেও সে সকল বিষয় তেমন শিক্ষিত হয় না। বিজ্ঞানই ইউরোপীয় বিদ্যার সারাৎসার। এখানে সেই বিজ্ঞান বিদ্যার আলোচনা নাই বলিলেই হয়। এখানে বিজ্ঞানের গল্প শুনা হয় মাত্র। বিজ্ঞান অফল শাস্ত্র নয়। উহা সত্য সত্যই শিক্ষিত হইলে,

এতদিনে তাহার সমূহ ফল দৃষ্ট হইত। দেশে কলকারখানা বাড়িত এবং বিজ্ঞান-শিক্ষিতেরা প্রাচীন শাস্ত্রীয় মতবাদের এবং আচারের প্রতি সজ্ঞান-ভক্তিসম্পন্ন হইতে পারিতেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন আর্য্য-শাস্ত্রে ভৌতিক শক্তির প্রসার এবং মনুষ্যের সাধন চেষ্টার প্রভাব এবং অখণ্ড দণ্ডায়মান কালের নিরবধিত্ব এরূপে স্বীকৃত হইয়াছে যে অপরাপর দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞানের সহিত আর্য্য-শাস্ত্রের বিন্দু মাত্র বিরোধ নাই। প্রত্যুত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত অনেকানেক তথ্যের আভাস আর্য্যশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং বিজ্ঞান আরও অনেক দূর অগ্রগামী হইতে পারিলে তবে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত তথ্যের নিকট পৌঁছিতে পারিবেন"।

অতএব আমরা এ পর্য্যন্ত যে প্রাথমিক বা উচ্চশিক্ষা পাইতেছি তাহার দ্বারা কোন প্রকৃত শুভ ফল লাভ হয় নাই বলিলেই হয়। দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর প্রভৃতি সম্পত্তির লোপ, ক্ষতি এবং অকার্য্যে প্রয়োগ হইয়া, দেশীয় উচ্চশিক্ষার পতন হইয়াছে। দেশের শিক্ষকবর্গ তেজোহীন এবং ভিক্ষোপজীবী হইয়াছেন। উহাঁদিগের পুনঃ সংস্থাপনের জন্য এবং উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করাই এক্ষণকার একটী প্রধান কর্ত্তব্য। ভারত-সমাজ রক্ষার উপযোগী অপর কোন কার্য্যই ইহার অপেক্ষা গুরুতর বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রে মঠাদি প্রতিষ্ঠার যে ভূয়সী প্রশংসা আছে, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই।

উপাধ্যায়স্য যোবৃত্তিং দত্ত্বাধ্যাপয়তি দ্বিজান্।
কিন্নদত্তংভবেৎ তেন ধর্ম্মকামার্থমিচ্ছতা ॥

যে ধর্ম্ম কাম এবং অর্থ সাধনেচ্ছুক ব্যক্তি উপাধ্যায়কে বৃত্তি দান পূর্ব্বক দ্বিজগণকে অধ্যাপিত করেন, তিনি কি না দিলেন।

ইউরোপীয় বিজ্ঞান বিদ্যা শিক্ষা করাও আমাদের অপর একটী রক্ষণোপায়। সমাজ রক্ষার উদ্দেশে সাধিত হইলে, উহা একটী প্রকৃত ধর্ম্ম্যকার্য্যই হইবে। শাস্ত্রে বিধি আছে—

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যা মাদদীতাবরাদপি।

*　*　*　*

বিবিধানিচ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ।

অবর লোক হইতেও শ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়া শুভকরী বিদ্যার গ্রহণ করিবে। * * সকল স্থান হইতেই বিবিধ শিল্পবিদ্যার সমানয়ন করিবে।

দেশে শিল্প এবং বিজ্ঞানের সমানয়ন দুই প্রকারে হইতে পারে। এক, স্বদেশের মধ্যে কতকগুলি কলকারখানার প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহাতে বেতনভোগী শিল্প-বিজ্ঞানবিৎ ইউরোপীয় লোক নিযুক্ত করিয়া সেই সকল লোকের দ্বারা দেশীয়দিগের শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার উপায় করিয়া দেওয়া। অপর, কতকগুলি দেশীয় লোককে ইউরোপে প্রেরণ করিয়া বিজ্ঞান এবং শিল্প শিক্ষা হইলে তাহাদিগকে প্রত্যানয়ন করা। এই দুই উপায়ের মধ্যে জাপানীয়রা স্বদেশে দ্বিতীয় পথটী লইয়াছে, চিনীয়রা কিয়ৎপরিমাণে প্রথম পথটীরই অবলম্বন করিয়াছে। আমাদের উভয়-পথই যুগপৎ অবলম্বন করা বিধেয় বলিয়া বোধ হয়। তবে ইউরোপে লোক পাঠাইতে হইলে নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছাত্রদিগকে না পাঠাইয়া যাহাদের পাঠ সমাপন হইয়া চরিত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং যাহারা দেশে প্রত্যাগত হইয়া শিক্ষাদান কার্য্য সুনির্ব্বাহ করিতে পারিবে, বাছিয়া বাছিয়া এইরূপ লোকই পাঠান উচিত। আমোদ, প্রমোদ, বাহাদুরী, সভাস্থাপন ও বক্তৃতাদি করিবার জন্য বিলাত-যাত্রা সম্বন্ধে শাস্ত্র ও দেশাচার উভয়ই বিরুদ্ধ। শিল্প বিদ্যাদি সমানয়নের জন্য বিলাত-যাত্রা সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিসম্পন্ন লোকের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ কোন প্রকার প্রকৃত সৎকার্য্যের ব্যাঘাতক নহেন। বিলাত-ফেরত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বজাতীয় সমাজে থাকিবার জন্য ভক্তি-ভাবে আগ্রহ ও দীনতা প্রকাশ করেন, তাঁহারা যে সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়েন না তাহা বোম্বাই অঞ্চলের অনেক স্থলে এবং বাঙ্গালা প্রদেশেও

দু এক স্থানে ইতিমধ্যেই দৃষ্ট হইয়াছে। শিল্পাদি বিষয়েও শিক্ষাদান ব্রাহ্মণের কার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সর্ব্বেষাং ব্রাহ্মণোবিদ্যাদ্ বৃত্ত্যুপায়ান্ যথাবিধি।
প্রব্রুয়াদিতরেভ্যশ্চ স্বয়ঞ্চৈব তথাভবেৎ॥

ব্রাহ্মণ সকলেরই বৃত্তির উপায় জানিবেন এবং শিখাইবেন। স্বয়ং ব্রাহ্মণাচার থাকিবেন।

অতএব যাহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ-গুণসম্পন্ন অর্থাৎ যাহারা অপেক্ষাকৃত অস্বার্থপর, সংযতেন্দ্রিয় এবং আত্মগৌরব-বিশিষ্ট, সুতরাং আত্মসমাজ ত্যাগে অনিচ্ছু এমন লোকদিগকেই পাঠাইতে হইবে। সেরূপ লোক না জুটিলে বিদেশীয় কারুকরদিগকে এখানে আনাই প্রশস্ত পথ। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নূতন নূতন শিল্প ঐ রূপেই আসিয়াছিল। ইরান, স্তাম্বুল প্রভৃতি স্থান হইতে সেই সেই দেশীয় কারিকরেরা আসিয়া গালিচা, বিদ্রি, বন্দুকাদির শিল্প এ দেশে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে।

দেশীয় যে সকল অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পাদি এখনও নানা স্থানে সজীব আছে তাহার শিক্ষা এবং রক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন করাই উচিত।

বিদ্যাহীনতা নিবারণ সম্বন্ধে আরও একটী কথা বক্তব্য। এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঠাকুরেরা, শাস্ত্রের ফল এবং সিদ্ধান্তের প্রতি অল্প দৃষ্টি করিয়া বিচার-মল্লতার প্রশ্রয় দিয়া থাকেন। ইহাতে তথ্য-জ্ঞানের প্রতি ক্রমশঃ অমনোযোগ হইয়া পড়ে, এবং সত্যোপলব্ধির ক্ষমতাই ন্যূন হইয়া যায়। বিদ্যাবত্তা এবং বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষাও তথ্যোপলব্ধি উচ্চতর শক্তি। উহাই বুদ্ধিমত্তার প্রকৃত পরিপাক। শাস্ত্রও বলিয়াছেন—

সত্যরূপং পরং ব্রহ্ম সত্যং হি পরমং তপঃ।
সত্যমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সত্যাৎ পরতরো নহি॥

পরব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, সত্যই পরম তপস্যা, সকল ক্রিয়াই সত্যমূলক, সত্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই।

বিজ্ঞানের অনুশীলনে তথ্যোপলব্ধি তেজস্বিনী হয়। এই জন্য সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রাদি শিক্ষার সহিত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের সম্মিলন সাধন হওয়া অত্যাবশ্যক। সে সম্মিলন যে সাধিত হইতে পারে, তাহা বারাণসী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার বালাণ্টাইন্ সাহেব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাহেব যে অভিপ্রায়েই ঐ সম্মিলনের জন্য সচেষ্ট হউন, আর্য্যধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের বাস্তবিক বিরোধ নাই। সুতরাং তিনি ছাত্রবর্গকে যে পথে চালাইবার যত্ন করিয়াছিলেন, সে পথে আমাদেরই অভীষ্ট প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

আর এক বিষয়েও আমাদিগকে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইবে। অপর সকল দেশে তত্তদ্দেশীয় রাজকর্ম্মচারীদিগের হইতেই ক্রমশঃই জনসমাজে রাজনৈতিকজ্ঞান বিস্তৃত হয়। আমাদের দেশের রাজকর্ম্মচারীরা বিদেশীয় এবং তাঁহারা কার্য্যাবসানে এদেশে থাকেন না। এই জন্য দেশের অবস্থা এবং রাজ কার্য্য বিষয়ক জ্ঞান লাভ আমাদিগের পক্ষে দুর্ল্লভ হইয়াছে। তজ্জন্য রাজনৈতিক সভা সকলের অনুষ্ঠান অত্যাবশ্যক। ঐ সকল সভায় রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা রাজনীতির আলোচনাতেই বিশেষ ফল দর্শিবে। কোন্ বিষয়ে কিরূপ ব্যবস্থা হইলে ভাল হয় তাহা অবধারণের পূর্ব্বেই এখন তুমুল আন্দোলনের ঢেউ উঠিতে থাকে। দেশের নানা স্থানে সভা স্থাপিত হইয়া রাজনীতি বিষয়ে পড়া শুনা এবং বিচার ও অনুসন্ধান হইতে থাকিলে বুদ্ধিমান ও বিশিষ্ট লোকমাত্রেরই রাজনৈতিক বিষয়জ্ঞতা ও দূরদর্শিতা সম্বর্দ্ধিত হইবে এবং কোন প্রস্তাব উপস্থিত হইলে সে সকল লোক আর ইংরাজী গতে ভুলিবেন না এবং হুজুকে মাতিবেন না—আপনাদের তথ্য জ্ঞানের উপরে চলিতে পারিবেন।

অতএব বিদ্যা হীনতার্ পরিহারার্থে সমাজের করণীয় (১) দেশীয় শাস্ত্র শিল্পাদির প্রগাঢ় চর্চ্চা (২) ইউরোপীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের অনুশীলন (৩) শাস্ত্রালোচনার সহিত বিজ্ঞানের সম্মিলন এবং (৪) রাজনীতি বিষয়ক আলোচনার সভা স্থাপন।

ধনহীনতা। ধনহীনতা পরিহার করিবার উপায় তিনটী। এক, ব্যয়ের লাঘব, দ্বিতীয় ক্ষতির নিবারণ, তৃতীয় আয়ের বৃদ্ধি সাধন। আমাদের দেশের লোকেরা স্বভাবতঃ বিলাসী নহেন। ইঁহারা ইহলৌকিক ভোগ সুখে তেমন মগ্ন হইতে পারেন না। পুরুষানুক্রমিক শিক্ষা, পারলৌকিক সুখের দিকে ইঁহাদিগকে মতি দিয়াছে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিতে গিয়া ইঁহারা ক্রমশঃ বিলাসী এবং ব্যয়শীল হইয়া পড়িতেছেন। আবার ইউরোপীয়েরা এত প্রকারে নূতন নূতন অর্থাপচয়ের পথ এবং রাজপুরুষে ভক্তি প্রদর্শনের পথ দেখাইয়া দিতেছেন যে, সেই সকল পথ দিয়া দেশীয়দিগের ধন ভাণ্ডার হইতে অজস্রধারে অর্থের নির্গম হইয়া যাইতেছে।

ভারতবাসী সাধারণতঃ বিলাসী নহেন, কিন্তু সাধারণতঃই দানশীল। পূর্ব্বে দানশীলতা নিবন্ধন দেশের কোন হানি হইত না। দেশের ধন দেশেই থাকিত। কিন্তু এখন ঐ দানশীলতার মুখ ক্রমশঃ ফিরিয়া যাইতেছে। পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধে, দেবপূজায়, এবং কন্যাপুত্রাদির বিবাহে, যে দান হইত তাহাতে দেশের টাকা দেশেই থাকিত। এখন ঐরূপ দানেরও কিয়দংশ দেশের বাহির হইয়া যাইতেছে। একটী দৃষ্টান্ত দিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। এখন ইউরোপীয় দোকানদারেরা সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেন "৺ দুর্গাপূজাপর্ব্বোপলক্ষে প্রস্তুত ইয়র্ক সাইয়রের হাম্ (শূকর মাংস) বিক্রয়ার্থ মজুদ আছে মূল্য সেরকরা—টাকা।" পর্ব্ব, উৎসব এবং ক্রিয়াদির উপলক্ষেও ইউরোপীয়দিগের নিমন্ত্রণ না করিলে নয়! ইউরোপীয় অতিথিবর্গ স্বজাতিবৎসল। তাঁহারা এতদ্দেশীয় কোন দ্রব্য দেখিয়া অথবা উপভোগ করিয়া তৃপ্ত প্রকাশ করেন না। তাঁহারা দ্রব্য সরঞ্জাম বিলাতী এবং খাদ্যসামগ্রী খাস্ ইউরোপীয় দোকানদারের প্রস্তুত না দেখিলে প্রায়ই ঘৃণা প্রকাশ করেন। দেশীয় নিমন্ত্রণকারীরা কি করিবেন, আপনাদের ঘর, বাটী, আসবাব, গাড়ী, ঘোড়া এবং উপভোগ্য সমস্ত দ্রব্য ইউরোপীয় রুচির যোগ্য করিয়া রাখিতে বাধ্য হয়েন। এবং

ক্রমশঃ আপনারাও বিকৃত রুচি প্রাপ্ত হইতে থাকেন। তাই ঈশ্বরী পূজার উপলক্ষে ইংলণ্ডের ইয়র্ক সাইয়র প্রদেশে ভারতবাসীর টাকায় শূকর মাংস প্রস্তুত হয়।

দেশীয় জনগণকে এরূপ ক্ষুদ্রতা এবং চিত্ত-দৌর্ব্বল্য ছাড়িতে হইবে। তাঁহারা যদি স্বদেশীয় জনগণের প্রতি সহানুভূতি বিস্তারের যত্ন করেন' তাহা হইলেই ইউরোপীয় অনুকরণ ছাড়িতে পারিবেন এবং তাহা পারিলে ইংরাজজাতির চক্ষেও গৌরবান্বিত হইবেন। বীর প্রকৃতিক ইংরাজ স্বভাবতঃ খোসামোদ ভাল বাসিতে পারেন না। এবং ধনিগণ তাঁহাদের মন রাখিবার জন্য যেরূপে নিজ দেশের, পূর্ব্বপুরুষদিগের, এবং শাস্ত্রের অবমাননা করিয়া চলেন তাহা দেখিয়া তাঁহাদের প্রতি মনে মনে তাচ্ছিল্যই করিয়া থাকেন। ভারতবাসীকে প্রতি হুজুকেই না মাতিতে দেখিলে ইংরাজ ভারতবাসীর অধিকতর গৌরব করিবেন। কোন উচ্চ পদস্থ ইংরাজ সময় বিশেষে বলিয়াছিলেন"—মহারাজা আমাদিগকে খানা এবং নাচ দিবার জন্য আজি——র স্থানে—হাজার টাকা ধার করিয়াছেন। পাগলেরা কেন এরূপে অর্থব্যয় করিয়া নষ্ট হয়।"

অতএব নিজের ভোগ সুখের ইচ্ছা (যদি কিছু থাকে) তাহা ন্যূন করা এবং ইউরোপীয়দিগের মনরক্ষা বা খোসামোদের নিমিত্ত যে ধন ব্যয় হয়, তাহার লাঘব করা অত্যন্ত আবশ্যক। তাহা হইলে পূর্ব্বকালে যেমন পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্ঠা এবং মঠ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ জলাশয় সংস্কারাদি ও চতুষ্পাঠী স্থাপন হইত, এখনও তাহা হইয়া দেশের প্রকৃত উপকার হইবে। পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্ঠা যে অত্যুচ্চ পুণ্য কার্য্য তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। দেবমন্দির, কূপ, জলাশয়াদির সংস্কার সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,

পুনঃ সংস্কারকর্ত্তাতু লভতে মৌলিকং ফলং।

অতএব সংস্কার কর্ত্তাও প্রতিষ্ঠাতার ন্যায় ফল লাভ করিতে পারেন।

ফলতঃ পূর্ব্বকালের প্রতিষ্ঠিত দীর্ঘিকা পুষ্করিণ্যাদি প্রায়ই যথাযোগ্য স্থান সকলে বিদ্যমান আছে। সেগুলি পঙ্কিল বা ভরাট হইয়া যাওয়াতে অনেক প্রকারে লোকের স্বাস্থ্য-হানি হইতেছে। এই জন্য নূতন পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা বদ্ধ, পচা ও পুরাতনের সংস্কারই এখন অধিকতর প্রয়োজনীয়। এইরূপে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের সংস্থান এবং দূষিত ভূম্যাদি-ভাগের উদ্ধার একই কার্য্যের দ্বারা হইয়া গেলে এদেশে একমাত্র সদাচার রক্ষা দ্বারা চিরকাল যেরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা হইয়া আসিয়াছে তাহাই চলিতে পারিবে। সেজন্য অন্য প্রকার ব্যাপকতর চেষ্টার আবশ্যক হইবে না।

এখন মূলধনের বিশিষ্ট বিনিয়োগ ব্যতিরেকে ধনবৃদ্ধির কোন উপায়ই হইতে পারে না। এই জন্যও ধনের অনর্থ ব্যয় করিতে নাই। শাস্ত্র বলেন—"নাকার্য্যে-ধন মুৎসৃজেৎ।"

দেশীয় শিল্পনাশ হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনক্ষয় হইতেছে। দেশীয় শিল্প কতকটা রক্ষা করিতে পারিলে দেশের ধন ক্ষতি নিবারণ হয়। দেশীয় শিল্পীরা সমাজের আশ্রিত বলিয়া আমাদেরঅবশ্য পোষ্যের মধ্যে গণনীয়। দেশীয় শিল্পজাত দেখিতে কিছু অপকৃষ্ট বা অপেক্ষাকৃত দুর্ম্মূল্য হইলেও আমাদের কিছু ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকার করিয়া তাহাই ক্রয় করা উচিত। বিদেশ প্রসূত বিলাস-দ্রব্য একেবারেই কেনা উচিত নয়। কতক আবশ্যকীয় দ্রব্য (যথা শিশি, বোতল, দিয়াশলাই, পেন্সিল, ঘড়ি প্রভৃতি) এদেশে প্রস্তুত হয় না। যত দিন ঐগুলি এদেশে প্রস্তুত না হয় ততদিনই বিদেশজাত ঐরূপ দ্রব্য ক্রয় করা যাইতে পারে। কিন্তু যাহাতে ঐ সকল জিনিস এদেশে প্রস্তুত হয় সে জন্য চেষ্টা করা উচিত এবং এদেশে প্রস্তুত হইলে আর সেই সকল জিনিস বিদেশ হইতে লওয়া উচিত নয়। একটু অনুসন্ধান করিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, এদেশে কোথাও না কোথাও প্রায় সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস এখনই পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, পুস্তকাদি, যাহা হইতে নূতন কিছু শিখিতে পারা যায়, তাহা সকল অবস্থাতেই বিদেশ হইতে লওয়া উচিত।

আর এক প্রকারেও ব্যয় লাঘবের এবং ক্ষতি নিবারণের পথ আছে। এখন মোকদ্দমা মামলায় বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই ধন এবং ধর্ম্মের ক্ষতি হইতেছে। অতএব সকল কথাতেই রাজ দ্বারে নালিশবন্দ হইবার যে অশুভকরী প্রবৃত্তি প্রবলা হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তির সম্যক দমন করা উচিত। দেশীয় বুদ্ধিমান, বিদ্বান এবং চরিত্রবান লোকদিগকে মধ্যস্থস্বরূপে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের বিবাদ আপনারাই ঘরে ঘরে নিষ্পত্তি করিয়া লইতে আরম্ভ করিতে হইবে। তাহা হইলে উৎসন্ন যাইবার একটী অতি বিস্তৃত পথই বন্ধ হইবে।

দেখিতে দেখিতে দেশের অন্তর্বাণিজ্যও ইউরোপীয় বণিকবর্গের হস্তগত হইয়া যাইতেছে। সামুদ্রিক বাণিজ্য হইতে আমরা অনেক কালাবধি অপসৃত হইয়া আছি। উহা দাক্ষিণাত্য ভাগে অতি অল্প মাত্রাতেই এখনও আছে। কিন্তু এখন আমাদের দেশের নদীগুলিতেও বিদেশীয়দিগের বাষ্পীয় তরীর যোগে আমদানি রপ্তানি চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতে দেশীয় মহাজনদিগের লভ্যাংশও বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। অতএব কোন সম্প্রদায়ের লোকেই আর এখন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন না। যদি সকলে পরস্পর সম্মিলিত হইয়া বৃত্তিরক্ষার নিমিত্ত সচেষ্ট হইতে পারেন তবেই সমাজের বল রক্ষা হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম্ম সাধন হয়।

দেশের ধন বৃদ্ধির জন্য প্রথমতঃ দুই তিন জন করিয়া ধনশালী ব্যক্তি সম্মিলিত হউন। ইউরোপ হইতে কল এবং কারিগর আনয়ন করুন, এবং কারবারের নামে অংশ (শেয়ার) খুলিয়া সাধারণের স্থানে অর্থ সংগ্রহ-পূর্ব্বক অতি সাবধানে সত্যনিষ্ঠ এবং বাঙ্নিষ্ঠ হইয়া কারবার আরম্ভ করুন—প্রতি কারবারের মধ্যে যেন দুই এক জন মাড়বারি, বা সাহু, বা শ্রেষ্ঠী, অথবা তিলি, তাম্বুলি, বণিক্ প্রভৃতি বৈশ্যধর্ম্ম পালনে নিপুণ লোক থাকেন। ভারতবর্ষে সকল কারবারই অত্যুত্তম রূপে চলিতে পারে। এখানে সকল কারুকার্য্যের উপাদান প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া

যায়। এখানে শ্রমজীবীর বেতনও অল্প। এখানে অধ্যবসায় এবং কার্য্যকরী-শিল্পবিদ্যা সম্মিলিত হইলেই যথেষ্ট ধনাগম হইতে পারে। দেশীয় ধনশালিবর্গ এবং তাঁহাদের সহকারী হইয়া মধ্যবিত্ত লোকেরা এখনও এই বিষয়ে আগ্রহান্বিত হউন। নচেৎ এদেশে ইউরোপীয়রাই সকল কারবারে হাত দিবেন এবং আমাদের ভাবী উন্নতির আশা একেবারে তিরোহিত হইবে—আমরা মজুরদার হইয়াই থাকিব। ইংলণ্ডে শ্রমজীবীরা ধর্ম্মঘটে জয় লাভ করিয়া আপনাদিগের বেতন ক্রমশঃই বৃদ্ধি করিয়া লইতেছে। তথায় শ্রমজীবীর বেতন আরও বাড়িবে। তাহাতে মূলধনির লাভ আরও কমিবে। সুতরাং ইংলণ্ডের ধনিরা স্বদেশের বাহিরে আসিয়া কারবার বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইবেন, এবং ভারতবর্ষের ন্যায় তাঁহাদের সুবিধার স্থান আর কোথাও পাইবেন না। অতএব এখন হইতেই দেশীয়দিগের মধ্যে সম্মিলনে এবং কারবারে প্রবৃত্তি জন্মিবার প্রয়োজন হইয়াছে। নচেৎ রক্ষা নাই। শাস্ত্রে যৌথকারবারের বিধি আছে—

সমবায়েন বণিজং লাভার্থং কর্ম্মকুর্ব্বতাং।
লাভালাভৌ যথা দ্রব্যং যথা বা সম্বিদাকৃতং॥

বণিকেরা লাভের নিমিত্ত পরস্পর মিলিত হইয়া ব্যবসায় করিবেন, যিনি যেমন মূলধন দিবেন, অথবা যেরূপ নিয়ম নিরূপিত হইবে, তদনুসারে ফলভাগী হইবেন।

অতএব ধনহীনতা পরিহারের উপায় (১) বিলাসিতার পরিহার। (২) অকার্য্যে অর্থব্যয় পরিহার (৩) বৈদেশিক দ্রব্যাদির ক্রয় লাঘব (৪) দেশীয় সালিসের দ্বারা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি (৫) যৌথ-কারবারের দ্বারা শিল্পের এবং বাণিজ্যের উন্নতি।

বিদ্যা ও ধনহীনতা বিষয়ে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ভারতবাসীর (১) আয়ুর খর্ব্বতা ও (২) সমাজ সংস্কারের আন্দোলন সম্বন্ধে কর্ত্তব্যাবধারণ চেষ্টা করা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আয়ুর খর্ব্বতা। ভারতবাসীর আয়ু খর্ব্ব হইয়া যাইতেছে। দারিদ্র বৃদ্ধি তাহার মুখ্য কারণ। যদি ধনহীনতার নিবারণ হয় তাহা হইলে আবার আয়ুষ কাল বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। ইংলণ্ড নিবাসী ইংরাজদিগের পরমায়ু গড়ে প্রায় তিন বৎসর বাড়িয়াছে।

ভারতবাসীর পরমায়ু খর্ব্ব হইবার অপরাপর যে সকল কারণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে আচার ভ্রষ্টতাই প্রধান। তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, আমাদিগের পক্ষে স্বদেশীয় শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা করিয়া চলাই শ্রেয়ঃ। ঐ আচারই এদেশের যোগ্য। উহার রক্ষায় আয়ুর বৃদ্ধি, উহার ত্যাগে আয়ুক্ষয় হয়। শাস্ত্রীয় আচার বলিলে লোকে ব্রত উপবাসাদিই মনে করেন। কিন্তু যোগাভ্যাসের জন্তই কঠোর ব্রত উপবাসাদির উপদেশ। অর্থসাধনের পক্ষে শরীর-ক্ষয়কর ব্রতাদি নিষিদ্ধ।

"সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থান্ অক্ষিণ্বন্ যোগত স্তনুং।"

গৃহাশ্রমী যোগ দ্বারা শরীর ক্ষিণ্ণ না করিয়াই অর্থের সাধন করিবে।

শাস্ত্রানুসারী হইয়া পবিত্র আহার, এবং পানীয় গ্রহণ, বিহিত আবাস এবং পরিমিত ব্যায়াম চর্চ্চা করিলে শরীর সুস্থ, সবল, এবং দৃঢ় হয় এবং সন্তানও সুস্থ-শরীরী এবং দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারে। এই জন্তই শাস্ত্র বলেন,—

আচারাল্লভতেহ্যায়ুঃ আচারাদীপ্সিতা প্রজা।

আচার হইতে আয়ুর বৃদ্ধি হয়, এবং অভীষ্টরূপ সন্তান জন্মে।

সমাজ সংস্কার। ভারত সমাজের সংস্কার করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া একটা তুমুল গোল উঠিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় সংস্কারের চেষ্টা উচিত কি না, কেমন সূত্র ধরিয়া কোন্ উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কার কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে হয়, সে সকল বিষয়ে দৃক্‌পাত নাই, অথচ সংস্কারের জল্পনা সর্ব্বত্রে। সংস্কারকের দল অসংখ্য। অতএব মুল সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত কি হয়, তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

সমাজ প্রচলিত কোন ব্যবস্থা, ব্যবহার অথবা অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্ত করিয়া নূতন ব্যবস্থা, ব্যবহার অথবা অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তনকে সমাজের সংস্কার বলে। ঐরূপ সংস্কার কার্য্য যে ভারতবর্ষে অনেকবার হইয়াছে, তাহা স্মৃতি-সংহিতা এবং পুরাণাদি হইতে জানিতে পারা যায়। কিন্তু সেই সকল সংস্কার অন্ধ-অনুকরণমূলক হইয়াছিল বলিয়া বোধহয় না। একটী স্থলে কোন্ কারণে এবং কি প্রণালীতে সংস্কার কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টরূপেই অভিব্যক্ত হইয়া আছে। স্মার্ত্ত শিরোমণির উদ্ধৃত কয়েকটী পৌরাণিক বচনের শেষভাগে লিখিত হইয়াছে—

এতানি লোক গুপ্ত্যর্থং কলে রাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ॥
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবত্তবেৎ॥

লোকের রক্ষার নিমিত্তে, কলির প্রথমে, পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থানুসারে, মহাত্মগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোল্লিখিত কার্য্য সকলের নিবারণ হইয়াছিল। সাধুদিগের প্রতিষ্ঠিত নিয়মও বেদতুল্য প্রমাণিত হয়।

অতএব উল্লিখিতরূপে অর্থাৎ সমাজের রক্ষার নিমিত্তে, নিবৃত্তিমার্গে, যে সমাজ-প্রণালীর সংস্কার চেষ্টা তাহা অশাস্ত্রীয় নহে। তবে চেষ্টাটী (১) সমাজের রক্ষার নিমিত্ত অতএব রক্ষা কার্য্যের অনুকূল যে ধর্ম্ম তাহার অনুগত হওয়া আবশ্যক এবং (২) মহাত্মগণের অর্থাৎ অনেক প্রধান ব্যক্তির অনুমোদিত সুতরাং কোন একব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত নয়; এবং (৩) পণ্ডিতদিগের পরামর্শানুসারে সুতরাং তাঁহাদিগের সম্মতি ক্রমে হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলেই ঐ সংস্কারের ব্যবস্থা বেদের সদৃশ মান্য হইবে।

কিন্তু এখন সমাজ সংস্কারের যে চেষ্টা হয়, তাহাতে (১) প্রবৃত্তিমার্গে বিদেশীয় রীতির অনুকরণেচ্ছাই বলবতী থাকে; তাহাতে (২) ব্যক্তি বিশেষের বাহাদুরীর প্রখ্যাপন হয়; এবং (৩) দেশীয় পণ্ডিতবর্গের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনই তাহার একটী মুখ্য অঙ্গ। তদ্ভিন্ন, বৈদেশিক রাজার

সাহায্য প্রাপ্তির জন্য নব্য সংস্কারকদিগকে অতিশয় লালায়িত হইতেই দেখা যায়—সুতরাং আত্মসমাজের সংরক্ষণ ঐ সকল সংস্কারের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় না।

কিন্তু স্বদেশীয় বিদ্যার বাহুল্য, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের চর্চ্চা এবং প্রচার, কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা, যৌথকারবারের বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও বাণিজ্যের বিস্তার, সালিসি প্রণালীর সম্বর্দ্ধন, সদাচার পালন—এইরূপ বিষয় গুলিতে চেষ্টার দ্বারা সমাজের যে সংস্কার সাধিত হইতে পারে, তাহাতে দেশীয় কোন বিচক্ষণ ব্যক্তিরই অনভিমতি হইতে পারে না, তাহাতে রাজ-সাহায্যেরও প্রয়োজন হয় না, তাহাতে ধর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়া সমাজের রক্ষা সাধন হয়।

উপসংহার।

ভারতবর্ষে অতি উৎকৃষ্ট নীতিশাস্ত্র এবং ব্যবস্থাশাস্ত্র আছে, কিন্তু সমাজতত্ত্ব বলিয়া যে কোন স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে, তাহা আমার জানা নাই। সমাজতত্ত্ব ইউরোপের একটী নূতন শাস্ত্র। উহা ইতিহাস-মূলক বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকে, এবং কিয়ৎ পরিমাণে ইতিহাস-মূলকও বটে। কিন্তু ইউরোপীয়দিগের সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থগুলি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে দেখা যায় যে, ঐ শাস্ত্রে এখনও কল্পনার প্রভাব বলবান। এখনও উহাতে লেখকের যদৃচ্ছা-সম্ভূত মতামতগুলিই সমধিক পরিমাণে লিপিবদ্ধ। যাহা সার্ব্বভৌমিক সমাজ-সূত্র বলিয়া নির্ণীত, তাহাও সর্ব্বস্থলে দেশ বিশেষেরও সমাজ-সূত্র নয়।

এই জন্য ইউরোপীয়দিগের সমাজ-তত্ত্ব হইতে ভারতবর্ষের সামাজিক পরিণতি বিশিষ্টরূপে নির্ণয় করিবার সুগম পথ পাওয়া যায় না। ওখানকার কোন গ্রন্থে ভারতবর্ষের অবস্থার অনুরূপ অবস্থাপন্ন কোন

দেশের কোন কথাই নাই। যাঁহারা শুদ্ধ আপনাদিগের মনঃকল্পিত সমাজের বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারাও কেহ পরাধীন দেশের অবস্থা সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। যদি কোন গ্রন্থকার প্রসঙ্গতঃ বিদেশ বিজয়ের কোন উল্লেখ করেন, তাহাতে ঐ কার্য্য যে অতি দূষ্য এবং বিজেতা এবং বিজিত উভয়ের অপকর্ষজনক, এই মাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন। প্রত্যুত বৈদেশিকের সংস্রবে সমাজের কি প্রকার পরিবর্ত্ত হইতে পারে, ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃগণ যেন বিশেষ যত্ন পূর্ব্বকই সে বিষয়ে কোন কথা কহেন না। নব্য ইউরোপের বেকন নামক অতি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, তাঁহার মনঃকল্পিত আদর্শ সমাজে, বৈদেশিকদিগের প্রবেশ পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, এবং তৎসমাজস্থ কতিপয় মহামহো-পাধ্যায়ের পক্ষে যদিও বিদেশ ভ্রমণ শুভকর বলিয়াছেন, তথাপি তাঁহা-দের সম্বন্ধেও বিদেশ ভ্রমণ অতি ছদ্মবেশে এবং গুপ্তভাবে করণীয়, এই কথা বারবার বলিয়াছেন।

ফলতঃ বৈদেশিকের অধিকার, সমাজের হানিকর এবং বৈদেশিকের অধিকারে সমাজের জীবনচ্যুতি হয়, ইহাই ইউরোপীয় গ্রন্থকর্ত্তৃবর্গের অভিমতি। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস, এই দেশের বর্ত্তমান বৈদেশিক অধিকারকে তেমন সর্ব্বতোভাবে বিষবৎ দুষ্ট বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করে না; প্রত্যুত সমস্ত মহাদেশে অবিচ্ছিন্ন শান্তির রক্ষা এবং একচ্ছত্রে ক্রমশঃ দৃঢ়তর সম্মিলন, এই দুইটী চিরাভিলষিত বস্তু, ভারত-সমাজ ইংরাজ হইতে প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া এখানে ইংরাজ অধিকারের স্থায়িত্বই প্রার্থনীয় বলে, অথচ ইউরোপীয় সমাজ-তত্ত্ববিৎদিগের কথাকে একান্ত মিথ্যা না করিয়া বৈদেশিক অধিকারের যে সমূহ দোষ আছে, তাহাও দেখাইয়া দিয়া ভারতবাসীকে চক্ষুষ্মান্, অবহিত, এবং আত্মদোষ সংশোধনে যত্নবান হইতে বলে।

বস্তুতঃ ভারত সমাজের ভাবী অবস্থার অনুমান করিবার জন্য মুখ্যতঃ ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্ত এবং ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা লইয়াই বিচার

করিতে হয়; অপরাপর দেশের ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বাভিহিত গ্রন্থাদি হইতে প্রসঙ্গ ক্রমে কিছু কিছু সাহায্য পাওয়া যায় মাত্র। ঐ ইতিহাসাদি হইতে ভারতীয় সমাজতত্ত্বের সূত্র গ্রহণ করা অথবা এই সমাজের পরিণতির নিয়মাবধারণ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

ভারতবাসীর সমাজ-তত্ত্ব অপর একটী কারণেও ইউরোপীয়দিগের সমাজ-তত্ত্ব হইতে ভিন্নরূপে বিচার্য্য।

সমপ্রকৃতিক কোন একটী মাত্র বস্তুতে পরিণতির সংঘটন হয় না। বিভিন্ন বস্তুর সমবায় হইতেই পরিণতির প্রবৃত্তি হয়। এ নিয়মটী জাগতিক সকল কার্য্যের পক্ষেই খাটে। বাহ্য-ব্যাপারেও যেমন একাধিক দ্রব্যের সমবায়েই দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি হয়, তেমনি আভ্যন্তরীণ কার্য্যেও একাধিক ভাবের সমবায়ে ভাবান্তর আইসে। সামাজিক পরিণতিও এই নিয়মের অধীন। প্রতি সমাজের মধ্যেই বিভিন্নাবস্থ এবং বিভিন্ন প্রকৃতিক লোক সকল বিদ্যমান থাকে। তাহাদিগের পরস্পর সংযোগে সমাজের অভ্যন্তরে বিবিধরূপ পরিববর্ত্ত সাধিত হয়। কিন্তু তাদৃশ পরিবর্ত্ত-স্রোতঃ চিরকাল সমান বেগে চলেনা। সম্মিলনের বৃদ্ধি হইয়া সমাজের অভ্যন্তরে বহু পরিমাণেই সাম্যাবস্থা অবস্থাপিত হইয়া যায়। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানেরা, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এবং বিবিধ দ্বীপাবলী নিবাসী বর্ব্বরেরা আপনাদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমাজগুলির গঠন করিয়া বহু কালাবধি সমভাবেই রহিয়া গিয়াছিল। যদি ইউরোপীয়েরা তাহাদিগের বিনাশ সাধন না করিতেন, তাহা হইলে তাহারা চিরকাল সেই এক ভাবেই থাকিতে পারিত, এরূপ মনে করা যাইতে পারে।

তাদৃশ সাম্যাবস্থ সমাজ কিয়ৎ পরিমাণে একটী সম-প্রকৃতিক বস্তুর ন্যায় হইয়া থাকে এবং তাহাতে বিশিষ্টরূপ পরিবর্ত্ত চলে না। কিন্তু যদি ঐ সাম্যাবস্থ সমাজের মধ্যে কোন নূতন লোকের অথবা নূতন ভাবের সমাগম হয়, তবে সেই ভিন্ন উপাদানের সংযোগে আবার

পরিণতির বেগবত্তা জন্মে এবং পুনর্ব্বার সাম্যাবস্থার প্রাপ্তি পর্য্য পরিবর্ত্ত-স্রোত চলিতে থাকে।

সাম্যাবস্থার এবং পরিবর্ত্তের এই পর্য্যায়-ক্রম ভারত ভূমিতে অতি বহু পূর্ব্বকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ভারত সমাজের উপাদান মূলতঃই অতি-বিভিন্ন-প্রকৃতিক; তদ্ভিন্ন, এদেশের ধনবত্তার বিপুল খ্যাতি বহুকালাবধি বৈদেশিকদিগকে বাণিজ্য ব্যবসায়ে অথবা বিজিগীষায় এতদ্দেশে আনয়ন করিয়াছে। এই জন্য ভারত-সমাজের পরিণতি-কার্য্য বহু পূর্ব্ব হইতেই আরব্ধ হইয়াছে এবং কখন স্থগিত-গতি হইতে পারে নাই। অন্যান্য প্রাচীন জাতীয়েরা কেহ বা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেহ বা বহু কালাবধি কোন নূতন উপাদানের সমাগম অভাবে অপেক্ষাকৃত নিশ্চল ভাবেই আছে। তাহাদের তুলনায় ভারত-সমাজের পরিণতি-সূত্র যে সাতিশয় দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু ঐ সূত্র সুদীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া যে, উহার সহিত নব্য ইউরোপীয়দিগের পরিণতি সূত্রকে জুঁখিয়া কোন্‌টী বড়, কোন্‌টী ছোট, অবধারিত করিতে পারা যায়, তাহা নহে। যদি সকল সমাজের পরিণতি একই প্রণালী ক্রমে নির্ব্বাহিত হইত, তাহা হইলেই ঐ প্রকার জোঁখা দেওয়া চলিতে পারিত, এবং তাহা হইলেই কোন্ সমাজ অগ্রবর্ত্তী এবং কেবা পশ্চাদ্বর্ত্তী, তাহা বলা যাইতে পারিত। কিন্তু সকল মনুষ্য সমাজের পরিণতি ব্যাপার একই পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে পারে না। যেমন বাহ্য-ব্যাপারে দেখা যায়, দ্রব্যের উপাদানের ভিন্নতা নিবন্ধন সমুৎপাদিত মিশ্রপদার্থের ভিন্নতা জন্মে, সেইরূপ সামাজিক উপাদানের ভিন্নতা হইতেও সামাজিক পরিণতির প্রকার-ভেদ হয়। ভারত-সমাজের প্রধানতম উপাদান কল্পনা-প্রবণ বিবিধ অনার্য্য জাতি এবং কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-বোধে পটুতম আর্য্যগণ। ইউরোপীয় সমাজের উপাদান রোমীয়দিগের শাসনগুণে একীকৃত সুসাহসিক কেল্টীয় লোক

এবং সাতিশয় স্বাতন্ত্রিক এবং স্বৈর স্বভাব টিউটানীয় বর্ব্বরগণ। এইরূপ অতি বিভিন্ন প্রকৃতিক উপাদানের সমবায়ে সংঘটিত সমাজদ্বয়ে মূলতঃই ভেদ থাকায়, উভয়ের পরিণতি একই প্রকার হইতে পারে নাই। শুদ্ধ উপাদানের ভিন্নতাও নহে—ভারত এবং ইউরোপীয় সমাজে তাহাদের স্ব স্ব উপাদানের বিনিবেশও ভিন্নরূপ হইয়াছিল। ইউরোপীয় সমাজের নিম্নস্তরে রোমের প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা, উপরি স্তরে রোম বিজেতৃদিগের বর্ব্বরতা; ভারত-সমাজের নিম্ন স্তরে অনার্য্যদিগের বর্ব্বরভাব, উপরি স্তরে আর্য্য-সভ্যতার সমাবেশ। এরূপ স্তর-বিন্যাসের ভেদ হইতেও পরিণতি-সূত্রের ভেদ অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে।

এই সকল কারণে ভারতবর্ষের সহিত অন্য কোন প্রাচীন অথবা নব্য জাতীয়ের সর্ব্বাঙ্গীন উপমান উপমেয় সম্বন্ধ নিরূপিত হইতে পারে না। এবং সেই জন্য ইউরোপীয় সমাজের সূত্র-ধরিয়া ভারত-সমাজের পরিণতির বিচার করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাই করা হয় বলিয়া, সমূহ ভ্রম জন্মিয়া যাইতেছে। এমন কি, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভারত-সমাজের পরিণতি ব্যাপার এখনও ইউরোপের পশ্চাদ্বর্ত্তী, অর্থাৎ ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা ইউরোপের বহু বিগত শতাব্দীর অনুরূপ। অপর কেহ বলেন, ভারতবাসীদিগের মধ্যে এখনও জাতীয়ভাব পর্য্যন্ত জন্মে নাই।

ইউরোপীয় সমাজের ভিত্তিস্বরূপ রোম সাম্রাজ্যের উপরিস্তরে বর্ব্বর জাতীয়দিগের অবস্থান; ভারতবর্ষে বর্ব্বরদশাপন্ন বিবিধ জাতীয় লোকের উপরিভাগে আর্য্যজাতির নিবেশ। সংক্ষেপতঃ ইউরোপে রজোগুণাত্মক লোকের প্রাধান্য, ভারতবর্ষে সত্ত্বগুণাবলম্বীর প্রাধান্য। কিন্তু তজ্জন্য ভারতবর্ষের পরিণতি ব্যাপারে পশ্চাদ্বর্ত্তিতা সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ ভারত-সমাজের পরিণতি ভিন্ন পথে বহু দূর অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করাই উচিত হয়। ইউরোপের মধ্যে এখনও যোদ্ধৃদশা জাজ্জ্বল্যমান, সকল ইউরোপীয় লোকই সিপাহী সাজিয়া উঠিয়াছে, রাজস্বের অর্দ্ধাংশ

সৈনিক এবং সমরপোত এবং সংহারাস্ত্র নির্ম্মাণে ব্যয়িত হইতেছে। ভারত-সমাজের ঐ ভাব যদি কখন হইয়া থাকে, তবে যখন একটী স্বতন্ত্র যোদ্ধৃজাতির সৃষ্টি হইয়াছিল, উহা তখন হইতেই গিয়াছে—ইউরোপের সকল লোকই ভোগ-সুখ লালসায় প্রপীড়িত রহিয়াছে, ভারত-সমাজের ঐ অবস্থা চতুরাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়া অবধি আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই—ইউরোপের সাধারণ লোকে এখনও সাতিশয় নিষ্ঠুর-স্বভাব এবং অকারণ প্রাণিবধে উদ্যতহস্ত, ভারত-সমাজে যখন অহিংসাই পরমধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, সেই অবধি ঐরূপ স্বৈরাচার গিয়াছে; ইউরোপ অপর সমুদায় ভূ-ভাগকে আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইতেছেন, পরের ছেলের মুখের গ্রাস নিজের ছেলেকে খাওয়াইতেছেন, ভারতবর্ষে যদি কখন ঐ ভাব দেখা দিয়াছিল এমত হয়, তাহা বহুকাল হইতে তিরোহিত হইয়াছে। ভারতবাসী অন্যের অন্নে ভাগ বসাইতে চাহেন না। এ সমাজের সহিত এমন সকল বিষয়ে ইউরোপীয় সমাজের তুলনা হইতে পারে না। তবে ইউরোপের কল-কারখানা বাড়িয়াছে এবং ইউরোপ বিজ্ঞান বিদ্যায় এক প্রকার উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীনতা বা পূর্ণতাই উৎকর্ষের প্রকৃত লক্ষণ। সমাজের সর্ব্ব প্রধান কর্ত্তব্যে, অর্থাৎ সমধিক সংখ্যক লোকের সুপালনে, ভারত-সমাজ পৃথিবীর অপর কোন সমাজের অপেক্ষায় ন্যূন ছিল না—এখনও ইউরোপ অপেক্ষায় ন্যূন হয় নাই।

ইউরোপীয় সমাজের সহিত ভারত-সমাজের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা ভারতবাসীর জাতীয় ভাবটী পরিস্ফুট হয় নাই মনে করেন, তাঁহারা ঐ ভাবের তথ্যটী ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়া বোধ হয় না। জাতীয় ভাবটী মনুষ্য হৃদয়ের খুব উচ্চভাব বটে, কিন্তু উহা সর্ব্বোচ্চ-ভাব নয়। জাতীয় ভাব একটী মিশ্র-পদার্থ। ইহাতে ভাল এবং মন্দ, প্রশস্ততা এবং অপ্রশস্ততা দুই-ই আছে। কোন ভাবের সহিত তুলনায়, ইহা অতি উদার ভাব; আবার কোন ভাবের সহিত তুলনায়, ইহা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণভাব। প্রাচীন গ্রীক্ এবং রোমীয় পণ্ডিতেরা ইহার

উৎকর্ষের বিশেষ গৌরব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের যত বড় বড় লোক সকলেরই হৃদয় এই ভাবে পূর্ণ ছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্টরূপে স্বদেশানুরাগী এবং স্বজাতি-বৎসল, তাঁহারাই নরকুলে দেবতা। নব্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও অনেকটা ঐরূপ। উহাঁরাও স্বদেশ এবং স্বজাতি-বাৎসল্যের যথেষ্ট গৌরব করেন—কিন্তু প্রাচীন গ্রীক্ এবং রোমীয়েরা যতদূর করিতেন, ততটা করেন বলিয়া বোধহয় না। এক জন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন—স্বদেশানুরাগের মূল অভিমান; ইহার শাখা প্রশাখা এবং পত্র-বিটপাদি বাহ্য আড়ম্বর; ইহার কাণ্ড পর-জাতির প্রতি বিদ্বেষ; ইহার ফল পুষ্পাদি যেমন স্বদেশের সমৃদ্ধি, তেমনি পরদেশের পীড়ন; ইহা একটী দোষে গুণে জড়িত উপধর্ম্ম মাত্র।

ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতেরা জাতীয় ভাবটীকে উপধর্ম্ম বলিয়া নিন্দাও করেন নাই, আর উহাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়াও ব্যাখ্যাত করেন নাই। তাঁহারা এক পক্ষে স্বদেশকেই পৃথিবীর মধ্যে এক মাত্র কর্ম্মক্ষেত্র, ধর্ম্মক্ষেত্র এবং পুণ্যক্ষেত্র বলিয়াছেন, স্বদেশেই সমুদায় পবিত্র তীর্থের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, স্বদেশেরই আপাদমস্তক মহাদেবী সতীর দেহদ্বারা বিনির্ম্মিত এমত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, আবার স্বজাতীয় আর্য্যগণকেই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী, বিশুদ্ধ আচার-সম্পন্ন এবং সাক্ষাৎ বিধাতৃশরীর প্রসূত বলিয়াছেন, আর ভারতবর্ষের বহির্ভাগকে অপকৃষ্ট দেশ এবং তদধিবাসীদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া গালি দিয়াছেন——পক্ষান্তরে, তাঁহারাই সর্ব্বত্র সাম্য এবং একত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। জাতীয় ভাব সম্বন্ধে আমাদিগের বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র সকলের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে, ঐ ভাবটী অতি উৎকৃষ্ট, কিন্তু উহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ভাব আছে ——উহা মনুষ্যের হৃদয়োন্নতিসোপানে একটী উচ্চ স্থান, কিন্তু উহাই উচ্চতম বা চরম স্থান নয়।

জাতীয় ভাবটী হৃদয়োন্নতি-সোপানের একটী প্রশস্ত ধাপ। (১)

নিজের প্রতি অনুরাগ, (২) নিজ পরিবারের প্রতি অনুরাগ, (৩) বন্ধু বান্ধব স্বজনের প্রতি অনুরাগ, (৪) স্বগ্রামবাসীর প্রতি অনুরাগ, (৫) নিজ প্রদেশবাসীর প্রতি অনুরাগ, এই পাঁচটী ধাপ ক্রমে ক্রমে ছাড়িয়া উঠিয়া তবে, (৬) স্বজাতি-বাৎসল্য বা স্বদেশানুরাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্থূল কথায় প্রাচীন গ্রীক্ এবং রোমীয়দিগের অধিকার এই পর্য্যন্ত। আবার পর্য্যায়ক্রমে ইহার উপরে (৭) স্বজাতি হইতে অনধিক ভিন্ন অপর জাতীয় লোকের প্রতি অনুরাগ। অগষ্ট কোম্‌টির মতানুযায়ীদিগের প্রকৃত অধিকার এই পর্য্যন্ত। (৮) মানবমাত্রের প্রতি অনুরাগ। সরলমনা যিশুর এবং মহাত্মা মহম্মদের দৃষ্টির এই সীমা। (৯) জীবমাত্রের প্রতি অনুরাগ। বৌদ্ধদিগের এই সীমা। (১০) সজীব নির্জীব সমস্ত প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ, ইহাই আর্য্য ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ আসন—আর্য্যেরা তাহারও উপরে, সেই অবাঙ্‌মনসোগোচরে, আত্ম নিমজ্জন করিতে চাহেন।

ভারতবাসীর হৃদয়ে ঐ উচ্চতম ভাবের স্থান হইয়াছে বলিয়াই তাহার নিম্নতর যে জাতীয় ভাব, সেটী আবৃতপ্রায় হইয়া আছে। সম্প্রতি সেই আবরণের মোচন হইতেছে। যেমন ব্রতানুষ্ঠান-পরায়ণ সাধুশীল ব্যক্তিদিগকে ক্ষুৎপিপাসাপীড়িত হইয়া ব্রতাবসরে শরীর রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্য্যে অভিরত হইতে হয়, অথবা তপস্যার কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইলে, তাহার নিবারক অন্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তেমনি এক্ষণে উচ্চতম সর্ব্বজনীন প্রীতিকে হৃদয়-নিহিত করিয়া ভারতবাসী স্বদেশীয়দিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি বৃদ্ধির নিমিত্তই চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। ভারতবাসী এখন স্বজাতীয় কোন নেতৃ-পুরুষোত্তমের প্রতীক্ষায় বিশুদ্ধ এবং শুচি হইতেছেন, ধর্ম্মসূত্রের অবলম্বনে নিজের শাস্ত্র সহায়ে আপনার রক্ষা বিধানে প্রবৃত্ত হইতেছেন, যে কুশিক্ষালব্ধ স্বাতন্ত্রিকতা তাঁহাকে স্বজাতীয়ের মুখাপেক্ষতা পরিহার করাইতেছিল, তাহার মায়াজাল কাটিয়া উঠিতেছেন, এবং আত্ম সমাজকেই

ধর্ম্মসূত্র আবিষ্কারের একমাত্র নিদানভূত জানিয়া তাহার প্রতি পিতার ন্যায়, মাতার ন্যায় এবং ভ্রাতার ন্যায় প্রগাঢ়ভক্তি, প্রেম এবং সহানুভূতি সম্পন্ন হইতেছেন। ভারতবাসী যে, এই স্বজাতি-বাৎসল্যের অভ্যুদয় হইতে আপনার বিদ্যাবৃদ্ধিকর, ধন বৃদ্ধিকর এবং আয়ুর্ব্বৃদ্ধিকর কার্য্য সকলে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহার লক্ষণ ক্রমশঃই দৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিছু কাল ঐ সকল কার্য্য সত্যাবলম্বনে, সতেজে, সুবিস্তৃত হইয়া সুপ্রণালীক্রমে চলিলেই উপস্থিত বিঘ্নবিপত্তি সমুদায় কাটিয়া যাইবে, এবং সর্ব্বজনীন প্রীতি পুনর্ব্বার ভারতবাসীর হৃদয়ে অধিকতর বিকসিত হইবে। তখন সর্ব্বেশ্বরবাদ এবং একাত্মবাদরূপ সুমহৎ জ্ঞান এবং প্রীতির প্রোজ্জ্বলতর আলোক স্ফুরিত হইয়া দিগন্তব্যাপী হইবে। ভারতবাসী "জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায়" বলিতেছেন। তিনি সে মহাবাক্য কখনই ভুলিবেন না—পর জাতি-বিদ্বেষ এবং পরজাতি-পীড়ন তাঁহার স্বজাতি বাৎসল্যের অঙ্গীভূত হইবে না। প্রত্যুত পৃথিবীর অপর সকল জাতি তাঁহার নিকটে জ্ঞান এবং প্রীতির ঐ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি তিনি অপর একটী মন্ত্রেরও উচ্চারণ করিবেন—

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।

সমাপ্ত।